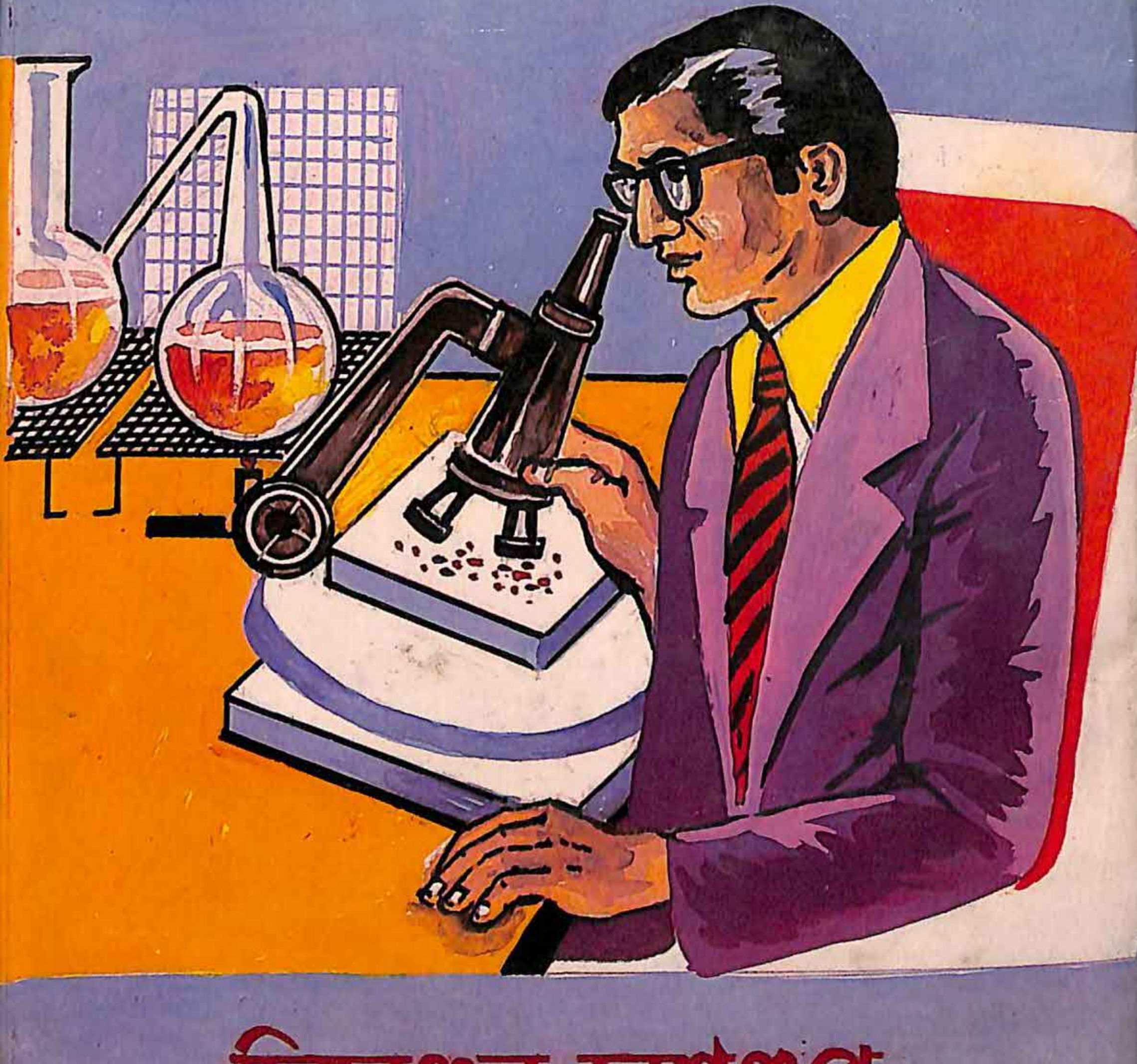
বিজ্ঞানের

গল্প সংকলন



চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

বিজ্ঞানের গল্প সংকলন

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

॥ পরিবেশক ॥

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট :: কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅশোক কুমার সরকার
সুসাহিত্য ভবন
১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর ঃ
প্রেসকো
শ্রীআশিস কুমার সরকার
১৩৪-বি, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

শিল্পী ঃ মাণিক সরকার

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩০ শে শ্রাবণ (জন্মাষ্টমী, ১৩৯৪)

মূল্য ঃ **কুড়ি টাকা মাত্র**

উপহার

● সম্পাদকের কৈফিয়ত ●

আভিধানিক ব্যাখ্যানে 'সংস্কৃতি' বলতে বুঝি শিক্ষা বা চর্চার মাধ্যমে লব্ধ উৎকর্ষ। ঐ অনুশীলনের প্রাথমিক স্তরে সঙ্গীত বা কাব্যের জগতে মানুষের প্রবেশ কিন্তু আকস্মিক। চিরাগত শব্দ যদি হয় পরমলোকের অভিজ্ঞান, সঙ্গীত সে ভুবনের প্রবেশদ্বার। আর সেই আনন্দভূমের অন্দরমহলে সাহিত্য এসে সন্নিবদ্ধ হয়েছে আপন খেয়ালে। উন্নমনের সাধনায় সন্ধিৎসু মানুষ বিশেষ জ্ঞান আহরণে নিজেকে অভিনিবিষ্ট রেখে পরীক্ষা, প্রমাণ, যুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নির্ণীত শৃঙ্খলিত সঞ্চয়কে 'বিজ্ঞান' অভিধায় ভূষিত করেছে। সাহিত্য এখানেও স্বাভাবিক সঞ্চরণে প্রাদুর্ভূত। আমরা নাম দিতে পারি 'বৈজ্ঞানিক সাহিত্য'।

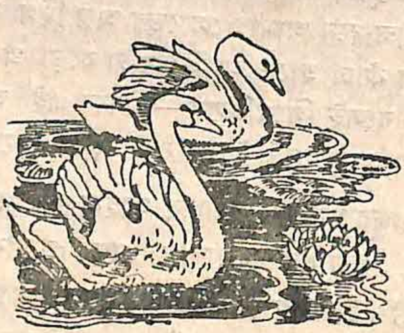
রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের সংযুক্তি-প্রস্তাবে সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়কে লিখেছেন—'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই।' রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়ত, তিনি বিজ্ঞানের সাধক না হয়েও কর্তব্যবোধে বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি দুটো স্মরণীয় কথা বলেছেন—'বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞানের রস-আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না।' পরের কথা—'তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম—জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।'

প্রকাশক বন্ধুবর অনিল সরকার মহোদয়কে ধন্যবাদ—তিনি ছোটদের জন্যে শতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বর্তমান উদ্যোগটিও শ্রীসরকারের প্রশংসনীয় পরিবেশনার নবতম উপচার। শারদীয় উপঢৌকন হিসাবে বিজ্ঞান-ভিত্তিক বা

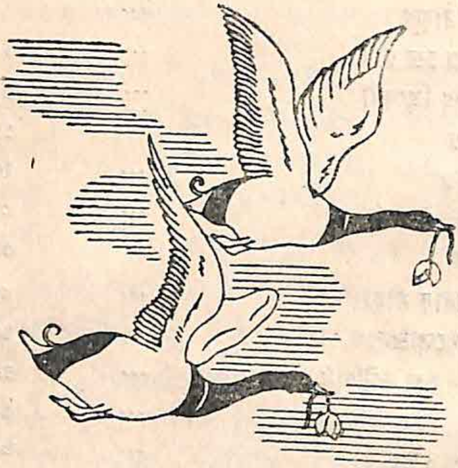
বিজ্ঞান-কল্প বিষয়ক বিচিত্র কথিকা আর কাহিনী এখানে সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত বক্তব্য অনুসরণেই—নতুন কোনও কৈফিয়তের অবকাশ না রেখে।

অজ্ঞাত বিষয় জানতে আগ্রহী জীবমাত্রেই। কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের সাংস্কৃতিক প্রত্যবেক্ষণ শুধু অজ্ঞানতার অপনয়ন নয়, অজ্ঞেয় বিষয়ের যথার্থ অন্বেষণ। ছোটদের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি। আবার রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আসি—'শিশুর প্রতি মায়ের ঔৎসুক্য আছে। কিন্তু ডাক্তারের মতো তার বিদ্যা নেই। বিদ্যাটি সে ধার করে নিতে পারে, কিন্তু ঔৎসুক্য ধার করা চলে না।' বাংলা-সাহিত্যে পরিচিত বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখকবৃন্দের রচনাকে এখানে গ্রথিত করা হয়েছে এই ঔৎসুক্যের কথা ভেবেই। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে গত শতাব্দী ও বর্তমানকালের প্রতিষ্ঠিত ও আগুয়ান রসস্রষ্টাদের রচনা এখানে গ্রন্থিত হয়েছে। নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর কল্পিত সম্ভাবনার বর্ণনায় উদ্ভাসিত এই বিজ্ঞান-চিত্রগুলি কৌতূহলী কিশোর-কিশোরীদের কাছে শুধু আকর্ষণীয় নয়, তাদের কল্পনা-বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠবে এমন আশা রেখেই মুখবন্ধ শেষ করছি। বলাই বাহুল্য বড়দের উদ্দেশেই এই পূর্বাভাষ, ছোটদের ঔৎসুক্য সৃষ্টির দায়িত্ব তাঁরাই পালন করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত



সূচীপত্র





জগদীশচন্দ্র বসু

॥ *বৈজ্ঞানিক রহস্য* ॥

কয়েক বৎসর পূর্বে এক অত্যাশ্চর্য ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে এবং এ বিষয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় অনেক লেখালেখি চলিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার ইংরাজী সংবাদপত্রে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয়—

সিমলা হাওয়া আপিস ২৭শে সেপ্টেম্বর। "বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।"

২৯শে তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল—হাওয়া আপিস আলিপুর। "তুই দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মণ্ড-হারবারে এই মর্মে নিশান উত্থিত করা হইয়াছে।"

৩০ তারিখে যে খবর প্রকাশিত হইল তাহা অতি ভীতিজনক—

"আধঘণ্টার মধ্যে চাপমান যন্ত্র তুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে। আগামীকল্য ১০ ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে; এরূপ তুফান বহু বৎসরের মধ্যে হয় নাই।"

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই।

আগামীকল্য কি হইবে তাহার জন্য সকলে ভীতচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১লা অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

সমস্ত দিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

তার পর দিন হাওয়া আপিস খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।"

ঝড় কোন্ দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্-দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল ; কিন্তু তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর সর্বপ্রধান ইংরাজী কাগজ লিখিলেন—এত দিনে বুঝা গেল যে, বিজ্ঞান সর্বৈব মিথ্যা।

অন্য কাগজে লেখা হইল, যদি তাহাই হয় তবে গরিব ট্যাক্স-দাতাদিগকে পীড়ণ করিয়া হাওয়া আপিসের ন্যায় অকর্মণ্য আপিস রাখিয়া লাভ কি?

তখন বিবিধ সংবাদপত্র তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—উঠাইয়া দাও।

গবর্নমেণ্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্প দিন পূর্বে হাওয়া আপিসের জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার আনানো হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙা শিশি বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর হাওয়া আপিসের বড়ো সাহেবকে অন্য কি কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে?

গবর্নমেণ্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমরা ইচ্ছা করি ভেষজবিদ্যার এক নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বায়ুর চাপের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যসম্বন্ধ-বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।"

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ লিখিয়া পাঠাইলেন—"উত্তম কথা, বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে পারে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে কলিকাতাবাসীরা আপাততঃ বহুবিধ চাপের নীচে আছে ঃ

১ম বায়ু	প্রতি বর্গইঞ্চি	১৫	পাউণ্ড
২য় ম্যালেরিয়া	....	২০	....
৩য় পেটেণ্ট ঔষধ	....	৩০	....
৪র্থ ইউনিভার্সিটি	....	৫০	....
৫ম ইন্‌কম ট্যাক্স	....	৮০	....
৬ষ্ঠ মিউনিসিপাল ট্যাক্স	....	১	টন

বায়ুর ২।১ ইঞ্চি চাপের ইতর বৃদ্ধি 'বোঝার উপর শাকের আঁটি' স্বরূপ হইবে। সুতরাং কলিকাতায় এই নূতন অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে বিশেষ যে উপকার হইবে এরূপ বোধ হয় না।

তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।"

ইহার পর গবর্নমেণ্ট নিরুত্তর হইলেন। হাওয়া আপিস এবারকার মতো অব্যাহতি পাইল।

কিন্তু যে সমস্যা লইয়া এত গোল হইল তাহা পূরণ হইল না।

একবার কোনো বৈজ্ঞানিক বিলাতের 'নেচার' কাগজে লিখিয়াছিলেন বটে ; তাঁহার থিয়োরি এই যে, কোনো অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে আবর্তমান বায়ুরাশি ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে।

এসব অনুমান মাত্র। এখনও এ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। অক্সফোর্ডে যে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসনের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে এক অতি বিখ্যাত জার্মান অধ্যাপক 'পলাতক তুফান' সম্বন্ধে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধারম্ভে অধ্যাপক বলিলেন, তুফান বায়ুমণ্ডলের আবর্তমাত্র। সর্বাগ্রে দেখা যাউক, কিরূপে বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী যখন ফুটন্ত ধাতুপিণ্ডরূপে সূর্য হইতে ছুটিয়া আসিল তখন বায়ু উৎপত্তি হয় নাই। কি করিয়া অম্লজান, দ্ব্যম্লজান ও উদ্‌যানের উৎপত্তি হইল তাহা সৃষ্টির এক গভীর প্রহেলিকা! যবক্ষারজানের উৎপত্তি আরও বিস্ময়কর। ধরিয়া লওয়া যাউক, কোনো প্রকারে বায়ুরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। গুরুতর সমস্যা এই যে, কি কারণে বায়ু শূন্যে মিলাইয়া যায় না। ইহার মূল কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে পদার্থের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি কিংবা কম। যাহা গুরু তাহার উপরেই টান বেশি এবং তাহা

সেই পরিমাণে আবদ্ধ। হালকা জিনিসের উপর টান কম, তাহা অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত। এই কারণে তৈল ও জল মিশ্রিত করিলে লঘু তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। উদ্‌জান হালকা গ্যাস বলিয়া অনেক পরিমাণে উন্মুক্ত এবং উপরে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টান একেবারে এড়াইতে পারে না। আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সত্য বর্ণিত হইল তাহা যে পৃথিবীর সবস্থানে প্রযোজ্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; কারণ ইণ্ডিয়া নামক দেশে যদিও পুরুষজাতি গুরু তথাপি তাহারা উন্মুক্ত, আর লঘু স্ত্রীজাতিই সে দেশে আবদ্ধ!

সে যাহা হউক, পদার্থমাত্রেই মাধ্যাকর্ষণবলে ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকে। পদার্থের মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র কথা। মানুষ মরিয়া যখন ভূত হয় তখন তাহার উপর পৃথিবীর আর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। কেহ কেহ বলেন, মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই; কারণ ভূতদিগকেও থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির আজ্ঞানুসারে চলাফেরা করিতে হয়। পদার্থও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—পদার্থ সম্বন্ধে পঞ্চত্ব কথা প্রয়োগ করা ভুল; কারণ রেডিয়ামের গুতা খাইয়া পদার্থ ত্রিত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আল্‌ফা, বিটা ও গামা এই তিন ভূতে পরিণত হয়। এইরূপে পদার্থের অস্তিত্ব যখন লোপ হয় তখন অপদার্থ শূন্যে মিলিয়া যায়। কিন্তু যতদিন পার্থিব পদার্থ জীবিত থাকে ততদিন পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারে না।

যদিও অধ্যাপক মহাশয়, পদার্থ কেন পলায়ন করে না, এ সম্বন্ধে অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিলেন, তথাপি তুফান কেন পলায়ন করিল, এ সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে একজন মাত্র জানে—সে আমি। পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

গত বৎসর আমার বিষম জ্বর হইয়াছিল। প্রায় মাসেক কাল শয্যাগত ছিলাম। ডাক্তার বলিলেন—সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে লঙ্কাদ্বীপ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি একান্ত বিরল হইয়াছিল। একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দ্বীপ কাহাকে বলে?" আমার কন্যা ভূগোল-তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ

করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল "এই দ্বীপ"—ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরল-কেশ মসৃণ মস্তকে দুই এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তারপর বলিল, "তোমার ব্যাগে এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' দিয়াছি; জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দুই একটি দ্বীপের চিহ্নও থাকিবে না।" 'কুন্তল-কেশরী'র আবিষ্কার এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। সার্কাস দেখাইবার জন্য বিলাত হইতে এ দেশে এক ইংরেজ আসিয়াছিল। সেই সার্কাসে কৃষ্ণ কেশর-ভূষিত সিংহই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য দৃশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজে আসিবার সময় আণুবীক্ষণিক কীটের দংশনে সমস্ত কেশরগুলি খসিয়া যায় এবং এ দেশে পৌঁছিবার পর সিংহ এবং লোমহীন কুকুরের বিশেষ পার্থক্য রহিল না। নিরুপায় হইয়া সার্কাসের অধ্যক্ষ এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইল এবং পদধূলি লইয়া জোড়হস্তে বর প্রার্থনা করিল। একে ম্লেচ্ছ, তাহাতে সাহেব! ভক্তের বিনয় ব্যবহারে সন্ন্যাসী একেবারে মুগ্ধ হইলেন এবং বরস্বরূপ স্বপ্নলব্ধ অব-ধৌতিক তৈল দান করিলেন। পরে উক্ত তৈল 'কুন্তল-কেশরী' নামে জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছে। তৈল্য প্রলেপে এক সপ্তাহের মধ্যেই সিংহের লুপ্ত কেশর গজাইয়া উঠিল। কেশহীন মানব এবং তস্য ভার্যার পক্ষে উক্ত তৈলের শক্তি অমোঘ। লোক-হিতার্থেই এই শুভ-সংবাদ দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমন কি, অতি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় এই অদ্ভুত আবিষ্কার বিঘোষিত হইয়া থাকে।

২৮শে তারিখে আমি চুসান জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দুই দিন ভালোরূপেই গেল। ১লা তারিখ প্রত্যুষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইল। সমুদ্রের জল পর্যন্ত সীসার রঙের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন, "যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহু দূরে—এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারিদিক মুহূর্তের

মধ্যে অন্ধকার হইল এবং দূর হইতে এক-এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তারপর মুহূর্তমধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে। কোথা হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল।

বায়ুর গর্জনের সহিত সমুদ্র স্বীয় মহাগর্জনের সুর মিলাইয়া সংহার মূর্তি ধারণ করিল। এক মহা ঊর্মি জাহাজের উপর পতিত হইল এবং মাস্তুল, লাইফ-বোট ভাঙিয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে জীবনের স্মৃতি যেরূপ জাগিয়া উঠে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য এই, আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে উপহাস করিয়াছিল, এই সময়ে তাহা পর্যন্ত স্মরণ হইল—

"বাবা, এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' তোমার ব্যাগে দিয়াছি।"

হঠাৎ এক কথায় আর এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে, এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে তৈলের শিশি খুলিয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল।

উপরে উঠিয়া দেখি, সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা ঊর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া 'কুন্তল-কেশরী' বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া শিশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম ; মুহূর্তমধ্যে তৈল সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়া ছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই এবং এই কারণেই সেই ঘোর বাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণীর যে এই সামান্য এক বোতল তৈলের সাহায্যে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে ?



"মাষ্টার মাঝে মাঝে হাসির কথা বলে, কিন্তু হাসে না।

পুপুদিদি বললে, আমাদের মাষ্টারমশায়কে নিয়ে যদি গল্পের পালা বাঁধতে হয় কিরকম করে বাঁধ।

তা হলে দশ লক্ষ বছর বাদ দিই।

তার মানে, আজগুবি গল্প বানাতে, অথচ আজকের দিনের বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীর শঙ্কা থাকত না।

কোনো সাহিত্যওয়ালা কখনো সাক্ষীর ভয় করে না। আসল কথা, আমার গল্পটা ফুটে উঠতে যুগান্তরের দরকার করবে। কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলি—পৃথিবী-সৃষ্টির গোড়াকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটা মোটা ভারী ভারী জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বে-আব্রুতা ছিল বহু যুগ ধরে। অবশেষে নরম মাটি পৃথিবীকে শ্যামল আস্তরণে ঢাকা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার যেন লজ্জা রক্ষা করলে। তখন জীবজন্তু আসরে নামল স্তূপাকার হাড়মাংসের বোঝাই নিয়ে; মোটা মোটা বর্ম পরে তারা দুশো পাঁচশো মোন অসভ্য লেজ টেনে টেনে

বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংসবাহীর দল সৃষ্টিকর্তার পছন্দসই হল না। আবার চলল বহু যুগ ধরে নিষ্ঠুর পরীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। লেজের বাহুল্য গেল ঘুচে, হাড়মাংস হল পরিমিত,কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল ত্বকে। না রইল শিঙ, না রইল ক্ষুর, না রইল নখের জোর, চার পা এসে ঠেকল দুটিমাত্র পায়ে। বোঝা গেল, বিধাতা তাঁর হাতিয়ার চালাচ্ছেন সৃষ্টির যুগটাকে ক্রমশ সূক্ষ্ম করে আনবার জন্যে। স্থূলে সূক্ষ্মে জড়িয়ে আছে মানুষ। মনের সঙ্গে মাংসের চলেছে ঠেলাঠেলি, মারামারি। বিধাতা পুনশ্চ মাথা নাড়ছেন, উঁহু, হল না। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এটাও টিঁকবে না; এ আপনিই আপনাকে নিকেশ করে দেবে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে। মাংস পড়বে ঝরে, মন উঠবে একেশ্বর হয়ে। সেই বিশুদ্ধ মনের যুগে তোমার মাস্টার-মশায় বসেছেন শরীররিক্ত ক্লাসে। মনে করে দেখো, তাঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে মেলাতে থাকা মনের উপর মন বিছিয়ে, বাইরের বাধা নেই বললেই হয়।

স্থূল বুদ্ধির বাধাও নেই ?

সেটা না থাকলে বুদ্ধি মাত্রই হয়ে পড়ে বেকার। ভালো-মন্দ বোকা-বুদ্ধিমানের ভেদ আছেই। চরিত্র আছে নানা রকমের। ভাবের বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আছে। এখন তিনিই ভালো মাস্টার যিনি সেই অনেকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, শিক্ষা এখন অন্তরে অন্তরে।

দাদামশায়, ইস্কুলটা কোথায় আছে সেটা ঠিক মনে আনতে পারছি নে।

পৃথিবীতে তিনটে বাসা আছে—এক সমুদ্রতলে, আর-এক ভূতলে, আর আছে আকাশে যেখানে সূক্ষ্ম হাওয়া আর সূক্ষ্মতর আলো। এইখানটা আজ আছে খালি আগামী যুগের জন্যে।

তাহলে তোমার ক্লাস চলেছে সেই হাওয়ায় সেই আলোয়। কিন্তু, ছাত্রদের চেহারাটা কিরকম।

বুঝিয়ে বলা শক্ত, তাদের আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আকারের আধার নেই।

তা হলে বোধ হচ্ছে নানা রঙের আলোয় তারা গড়া।

সেইটেই সম্ভব। তোমাদের বিজ্ঞান-মাস্টার তো সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বজগতে সূক্ষ্ম আলোর কণাই বহুরূপী হয়ে স্থূল রূপের ভান করছে। সেদিন আলো আপন আদিম সূক্ষ্মরূপেই প্রকাশ পাবে। ক্লাসে

তোমরা সবাই আলো করে বসবে। সেদিন ওটিন-স্নো-ওয়ালারা একেবারে দেউলে হয়ে গেছে।

দেউলে কেন, আলো হয়ে গেছে।

দেউলে হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া।

আমি কোন্ রঙের আলো হব, দাদামশায়।

সোনার রঙের।

আর তুমি ?

আমি একেবারে বিশুদ্ধ রেডিয়ম।

সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো ? ইলেক্‌ট্রন নিয়ে হবে না কি কাড়াকাড়ি।

ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ অফ লাইট্‌স্-এর দরকার হবে বোধ হচ্ছে। ইলেক্‌ট্রন নিয়ে টানাটানির গুজব এখনি শুনতে পাচ্ছি।

ভালই তো দাদামশায়। বীররসের কবিতা তোমার ভাষায় উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণিত হবে। ঐ যাঃ, ভাষা থাকবে তো ?

শব্দের ভাষা নিছক ভাবের ভাষায় গিয়ে পৌঁছবে, ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হবে না।

আচ্ছা, গান ?

গান হবে রঙের সংগত। বড়ো সহজ হবে না। তান যখন ঠিকরে পড়তে থাকবে, ঝলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তখনকার তানসেনরা দিগন্তে অরোরা বোরিয়ালিস বানিয়ে দেবে।

আর, তোমার গদ্যকাব্য কী হবে বলো তো।

তাতে লোহার ইলেক্‌ট্রনও মিশবে, আবার সোনারও।

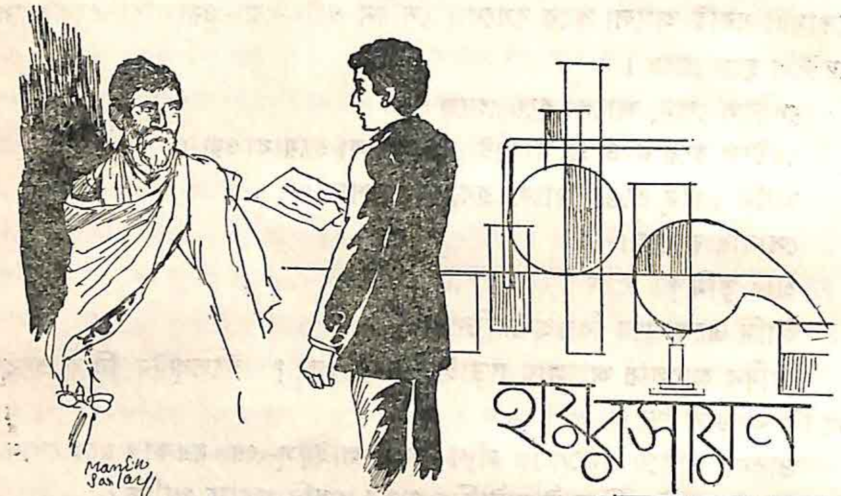
সেদিনকার দিদিমা পছন্দ করবে না।

আমার ভরসা আছে সেদিনকার আধুনিক নাতনিরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

তা হলে সেই আলোর যুগে তোমার নাতনি হয়েই জন্মাব। এবারকার মতো দেহধারিণীর 'পরে ধৈর্য রক্ষা কোরো। এখন চললুম সিনেমায়।

কিসের পালা।

বৈদেহীর বনবাস।"



হায় রসায়ন

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে সেসনের প্রথমে আমি পুনর্বার সেই পুরাতন অনিদ্রা-রোগে আক্রান্ত হইলাম এবং ক্রমাগত তিনমাস ভুগিলাম। শান্তিদায়িনী নিদ্রা আমার চক্ষুকে পরিত্যাগ করিল এবং রাত্রির পর রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় শয্যার এপাশ ওপাশ করিয়া আমি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। দূরে গির্জার ঘণ্টা বাজিত—আমি গণিতাম। কার্লাইল এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের মত দার্শনিকরাও অনিদ্রারোগে ভুগিয়াছেন, একথা মনে করিয়া আমি সান্ত্বনা পাইলাম না, এবং তাহাতে আমার যন্ত্রণাও কমিল না।……অক্টোবর মাসে পূজার ছুটির সময় আমি দেওঘরে হাওয়া বদলাইতে গেলাম।……

এখানে একটি করুণরস মিশ্রিত কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেওঘরের সর্বত্র 'ভেলার' গাছ। একদিন আমি ঐ গাছের একটি ফল চিবাইয়া খাইলাম। উদ্ভিদ-তত্ত্ব অনুসারে ভেলা আমের জাতীয়, সুতরাং আমি উহাকে অনিষ্টকর মনে করি নাই। তখনই আমার কিছু হইল না। পরদিন আমার মুখ খুব ফুলিয়া গেল, এমন কি চোখ পর্যন্ত ঢাকা পড়িল। বন্ধুরা বিষম শঙ্কিত হইলেন। স্থানীয় চিকিৎসক আমাকে বেলেডোনা ঔষধের প্রলেপ দিলেন। তাহাতেই আমি ভাল হইলাম। এক পর্যায়ের উদ্ভিদের মধ্যে অনেক সময় নির্দোষ ও অনিষ্টকর দুই রকমই থাকে, সে কথা আমার স্মরণ থাকা উচিৎ ছিল।

যথা—আলু, বেগুন, লঙ্কা, বেলেডোনা প্রভৃতি একই উদ্ভিদ পর্যায়ের অন্তর্গত।

পূজার ছুটির পর আমি ফিরিলাম। ইহার এক বৎসর পূর্বে আমি ৯১নং অপার সার্কুলার রোডের বাড়ি ভাড়া করিয়াছিলাম। পরবর্তী ২৫ বৎসর উহাই আমার বাসস্থান ছিল। এইখানেই বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ আরম্ভ করিবার কিছুদিন পর হইতেই বিজ্ঞান বিভাগে বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য দেখিয়া আমার মন বিচলিত হয় এবং রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক পুস্তক লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কিছুদূর পর্যন্ত বইখানি লিখিয়া আমি উহা হইতে বিরত হইলাম। আমার মনে হইল প্রাকৃতিক বিষয় অধ্যয়নই বালক-বালিকাদের চিত্ত বেশি আকর্ষণ করিবে এবং প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ এই আলোচনার বিপুল ক্ষেত্র। জীবজন্তুর গল্প, তাহাদের জীবনযাপন-প্রণালী, স্বভাব, বিশেষত্ব, এই সমস্ত বালক বালিকাদের মন মুগ্ধ করে। * * * বাংলাদেশ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। বৃক্ষলতা এখানে প্রাচুর্যের গৌরবে ভরপুর। ইংলণ্ডে প্রকৃতি কঠোর, রুক্ষ, তুহিনাচ্ছন্ন, কিন্তু বাংলা দেশে শীতকালেও প্রকৃতি তাহার ঐশ্বর্যের মহিমায় বিকশিত হয়।

শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ার বৃক্ষলতার জীবন্ত নমুনা সংগ্রহ করা কি কঠিন ব্যাপার! ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কনজারভেটরী বা রক্ষণাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। ইহার প্রকাশ একবার 'কিউ গার্ডেনে' গেলেই দেখা যায়। আর বাংলা দেশে প্রকৃতি মুক্তহস্ত হইয়া তাহার অজস্র দান চারিদিকে বিতরণ করে। * * * বাংলার নদীসমূহ বিচিত্র প্রকারের মৎস্যে পরিপূর্ণ এবং বনে-জঙ্গলে বিচিত্র রকমের জীবজন্তুর বাস। এক কথায় সমস্ত বাংলা দেশটাই একটা বীক্ষণাগার বিশেষ। তরুণ-বয়স্কদিগকে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার একটা প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাদের অন্তর্নিহিত পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উদ্বোধিত করা এবং বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর জীবন ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতে এই উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সিদ্ধ হয়। বাহ্য আকার-প্রকারে কুকুর হইতে বিড়ালের পার্থক্য কি? আর একটু তলাইয়া এই দুই প্রাণীর নখ, দাঁত প্রভৃতির পরীক্ষা করা যাক। আরও ভিতরে নামিয়া তাহাদের স্বভাব ও অভ্যাস, মুখভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, থাবা প্রভৃতি পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

যথা রন্ধনশালায় দুধের সর, মাছভাজা প্রভৃতি রাখিয়া পোষা বিড়ালকেও কি বিশ্বাস করা যায়? এইদিকে আরও অনেক আলোচনা করা যাইতে পারে। বিড়াল ও কুকুর পর্যায়ের যে সব মাংসাশী প্রাণী বনে থাকে তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি, কোন্ কোন্ অঞ্চলে তাহাদের বাস ইত্যাদি। মোটকথা জীবজন্তুর কাহিনী তরুণ-বয়স্কদের চিত্ত সহজেই অধিকার করে এবং সচিত্র প্রাণী বিজ্ঞানের বহি তাহাদের নিকট গল্পের চেয়েও মনোরম।

এইসবকথা ভাবিয়া বাংলাভাষায় প্রাণি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি একখানি প্রাথমিক গ্রন্থ লিখি। বি. এস-সি পড়িবার সময় আমি এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা কাজে লাগিল, কিন্তু এবিষয়ে আরও আমাকে পড়িতে হইল। প্রাণি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি বহু প্রামাণিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলাম এবং জীবজন্তুদের কার্যকলাপ ও অস্থিসংস্থান পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রায়ই পশুশালা এবং জাদুঘরে যাইতাম। আমার বন্ধু নীলরতন সরকার এবং প্রাণকৃষ্ণ আচার্য তখন নতুন ডাক্তারি পাস করিয়াছেন। তাহাদের সাহায্যে আমি কয়েকটি প্রাণীর দেহব্যবচ্ছেদও করিলাম। আমার স্মরণ আছে একদিন প্রাতর্ভ্রমণের সময় আমি একটি 'ভাম' (Indian Palm Civet) রাস্তার ধারে দেখিতে পাইলাম। বোধহয় শহরের প্রান্তভাগে কোন বাড়িতে নিশীথ অভিযান করিতে গিয়া নিহত হইয়াছিল। আমি এই 'নমুনাটি' সংগ্রহ করিয়া বিজয় গৌরবে বাড়ী লইয়া গেলাম এবং তৎক্ষণাৎ আমার পূর্বোক্ত ডাক্তার বন্ধুদ্বয়কে উহা ব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম। আমরা একটি 'নেচার ক্লাব' খুলিলাম। ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ব্যতীত রামব্রহ্ম সান্যাল (আলিপুর পশুশালার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট), প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার ঐ ক্লাবের সদস্য ছিলেন। আমরা নিয়মিতভাবে মাসে একবার করিয়া সভা করিতাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়ীতে গিয়া আমি কয়েকটা গোখুরা সাপ ধরাইলাম এবং তাহাদের বিষ-দাঁত পরীক্ষা করিলাম। সেবারের Thana Tophidia-এর সাহায্যে সর্পদংশনের রহস্য সম্বন্ধেও আলোচনা করিলাম।

এই সময় (১৮৯১-৯২) আর একটি বিষয় গুরুতর ভাবে আমার চিত্ত অধিকার করিল। আমাদের দেশের যুবকেরা কলেজ হইতে বাহির হইয়াই কোন আরামপ্রদ সরকারী চাকরি, তদভাবে ইউরোপীয়

সওদাগরদের অফিসে কেরানীগিরি খোঁজে। আইন, ডাক্তারি প্রভৃতি বৃত্তিতেও খুব ভিড় জমিতে আরম্ভ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পাস করিয়া বাহির হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারাও অসহায়ভাবে চাকরি খুঁজিত।

গত শতাব্দীর ৯০-এর কোঠায় যাহারা রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. পড়িত (এম. এস-সি. ডিগ্রী তখনও হয় নাই) তাহারা সঙ্গে সঙ্গে আইন পড়িত। আমি প্রায়ই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম রসায়নের সঙ্গে আইনের সম্বন্ধ কি? অধিকাংশ স্থলে উত্তর পাওয়া যাইত যে, 'আর্ট কোর্সে' বহু বই মুখস্থ করিতে হয়। কিন্তু রসায়ন শাস্ত্রে কম বই পড়িতে হয়। লেবরেটরীর কষ্টকর কার্যেও তাহাদের আপত্তি নাই। অবশ্য কেহ কেহ রসায়নশাস্ত্র ভালবাসিত বলিয়াই উহা পড়িত। এ সম্বন্ধে আমি একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। একজন বি.এল. উপাধিধারী ছাত্র রসায়নে এম. এ. পড়িত, আদালতে সে কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে আদালত ছাড়িয়া কলেজে আসিল কেন? ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল "আমি এম. এ. পাস করিলে নামের শেষে এম. এ., বি. এল. উপাধি যোগ করিতে পারিব এবং তাহার ফলে আমার মুন্সেফী চাকরি পাইবার যোগ্যতা বাড়িবে।" আমি বেদনাহত চিত্তে বলিয়া ফেলিলাম—'হায়, রসায়ন শাস্ত্র, কি উদ্দেশ্যে তোমাকে ব্যবহার করা হইতেছে!'





প্রকৃতির মূর্ত্তি

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রঙ-কাণা মানুষ দুইটার বেশী রঙ দেখিতে পায় না ; সাধারণতঃ তাহাদের নিকট লাল রঙের অস্তিত্ব বা উপলব্ধি নাই। সেই দুইটা মাত্র রঙ মিশাইয়া যত রকম রঙ হইতে পারে, রঙ-কাণার পক্ষে বর্ণের বৈচিত্র্য সেই পর্য্যন্ত। পীত ও অরুণ বর্ণ তাহাদের চোখে সমান ; ঘোরাল লোহিতকে তাহারা সবুজ দেখে ; এবং আমাদের চোখে যাহা নীলাভ হরিৎ, তাহাদের চোখে তাহা শাদা। বলা বাহুল্য, আমরা যত রকম বর্ণ-বৈচিত্র্য উপভোগ করি, তাহারা তাহাতে বঞ্চিত ; আমাদের মত বিবিধ সৌন্দর্য্যভোগে তাহারা অধিকারী নহে। বোধ করি, আমরা যাহা নির্ম্মল অকলঙ্ক শুক্লবর্ণ দেখি, তাহা তাহারা রঞ্জিত দেখে। নিত্য সংসারযাত্রায় তাহাদের বিশেষ অসুবিধা না ঘটিতে পারে, কিন্তু সময়ে সময়ে বড় গোলে পড়িতে হয়। প্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ ডালটন্ সাহেবের সম্বন্ধে গল্প আছে, তিনি একদিন বৃদ্ধাবস্থায় লাল কোর্ত্তা গায়ে দিয়া সহরের রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন।

* * * প্রসারে, পরিমাণে, সূক্ষ্মতায় তোমার ইন্দ্রিয় আর আমার ইন্দ্রিয় ঠিক সমান নহে। সুতরাং প্রকৃতির মূর্ত্তি তোমার নিকট যেমন, আমার নিকট ঠিক তেমন নহে। আবার যাহাদের ইন্দ্রিয়ের দুই একটার অভাব বা অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহাদের নিকট প্রকৃতির মূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানুষ ছাড়িয়া ইতর জীবে নামিলে আরও বৈষম্য দেখা যায়।

পাখীর দৃষ্টি আমাদের চেয়ে তীক্ষ্ণ, কুকুরের ঘ্রাণ আমাদের চেয়ে তীক্ষ্ণ ; সুতরাং তাহাদের কাছে প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি স্থলবিশেষে অধিক ফুটিয়া আছে। আমরা দুইটা চোখে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি ; আবার এমন জীব বিরল নহে, যাহাদের বত্রিশ গণ্ডা চোখ। অনেক কীটের নিকট পৌরাণিক সহস্রলোচন হারি মানেন। আমরা কাণে শুনি আর চোখে দেখি ; এমন জীবের কথা শুনা যায়, যাহারা চামড়ায় দেখে আর চুলে শোনে। আমাদের জগতের সহিত এই বিকট জীবগণের জগতের তুলনা করিতে কেহ সাহসী হইবেন, বোধ করি না।

ইহার পর প্রকৃতির মূর্ত্তি কিরূপ, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক না হইতে পারে।

* * * অধ্যাপক ক্লিফোর্ড পাঠাবস্থায় একটি ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিয়াছিলেন। গল্পটি এখানে উল্লেখযোগ্য। কোনও মহাসমুদ্রে গভীর জলভাগে একজাতীয় প্রাণী সমাজ বাঁধিয়া ঘরকন্না করিত। সেই মহাসমুদ্রের উপরিভাগে যে আর একটা জলহীন বৃহত্তর জগৎ বিদ্যমান আছে, যেখানে মনুষ্য পশু পক্ষী বাস করে, উহাদের কেহই তাহার অস্তিত্ব জানিত না। তাহারা সুখ ও শান্তির সহিত আপনাদের জলময় জগতে বাস করিত। চির অন্ধকারে বাস করিয়া তাহারা দিবারাত্রির প্রভেদ জানিত না। একদিন দৈবগত্যা এক ব্যক্তি গভীর জলতল ছাড়িয়া উপরে ভাসিয়া উঠে, এবং উপরে দীপ্ত সূর্য্যালোকভাসিত নূতন জগতের পরিচয় পায়। স্বস্থানে গিয়া সে বন্ধুবর্গকে কহিল, আমাদের জগৎ ছাড়া আর একটা নূতন জগৎ আছে, সেখানে সবই আলো, আর সেখানে একটা প্রকাণ্ড প্রদীপ জ্বলিতেছে। অনেকে তাহার মত অবিসংবাদে গ্রহণ করিল। কালক্রমে আর এক ব্যক্তি সেইরূপ উপরে আসিয়া রাত্রিকালে তারকাখচিত আকাশ নিরীক্ষণ করিল। ফিরিয়া বলিল, আর একটা নূতন জগৎ আছে বটে, কিন্তু সেটা মোটের উপর আঁধার, তবে অনেকগুলা ক্ষুদ্র প্রদীপ সেখানে মিটিমিটি জ্বলিতেছে। অনেকে তাহার মতও গ্রহণ করিল। কিন্তু সেই অবধি সেই জীবসমাজ দুই বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অনেক মারামারি রক্তারক্তি করিয়া আসিতেছে। তদবধি আর তাহাদের শান্তিলাভ ঘটে নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল সর্ব্বদাই বিষাদময়।

প্রকৃতির মূর্ত্তি কিরূপ, এই সমস্যা লইয়া আমরাও হাতাহাতি রক্তারক্তি করিতে পারি। কিন্তু এরূপ বিবাদে মীমাংসার সম্ভাবনা নাই।

এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যাহার যেমন ইন্দ্রিয়গত অবস্থা, তাহার নিকট প্রকৃতির তেমনই রূপ ; যাহার যেমন অনুভূতি, প্রকৃতিরও তাহার নিকট তদনুরূপ মূর্ত্তি।

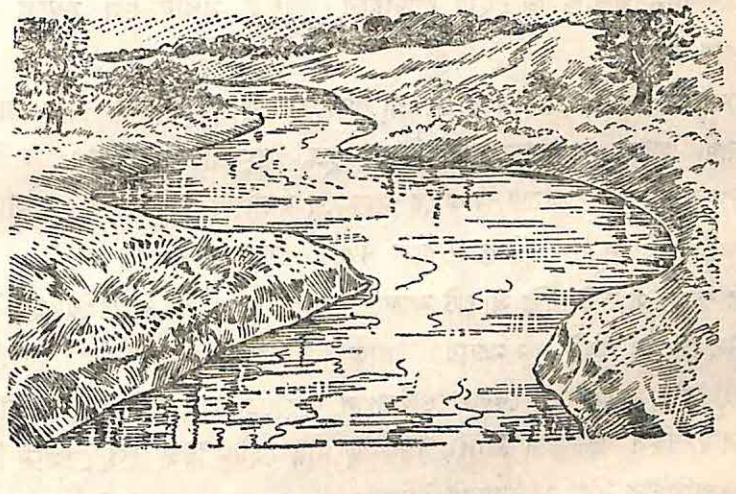
* * * প্রাকৃতিক শক্তি সবগুলা আমাদের জ্ঞানোৎপাদনে প্রযুক্ত হয় না। হইলে কি হইত, বলা যায় না। ঈথর বা আকাশের ভিতর দিয়া যে ঢেউগুলি যায়, তাহার মধ্যে যেগুলি এক ইঞ্চির তেত্রিশ হাজার ভাগ অথবা তার চেয়ে কম লম্বা এবং এক ইঞ্চির পঁয়ষটি হাজার ভাগের চেয়ে বেশী লম্বা, কেবল সেইগুলিই আমাদের চোখে পড়িলে আলোর জ্ঞান হয়। সেই ঢেউগুলির ছোট বড় তারতম্য অনুসারে অনুভূত রঙের তারতম্য জন্মে। কিন্তু যে ঢেউগুলি এই মাপের চেয়ে কিছু বড়, তাহাতে দৃষ্টিকার্য্য একেবারেই চলে না, তবে একটু তাপানুভূতি হয় মাত্র। এমন বড় বড় কত ঢেউ আমাদের শরীরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে ; আমরা তাহা টের পাই না উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের অভাবে। সেই ঢেউগুলি ধরিবার উপযুক্ত ইন্দ্রির থাকিলে না জানি কি রকমে উহারা কত নূতন ধরণের জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারিত। না জানি প্রকৃতির কি নূতন ধরণের মূর্ত্তি হইত।

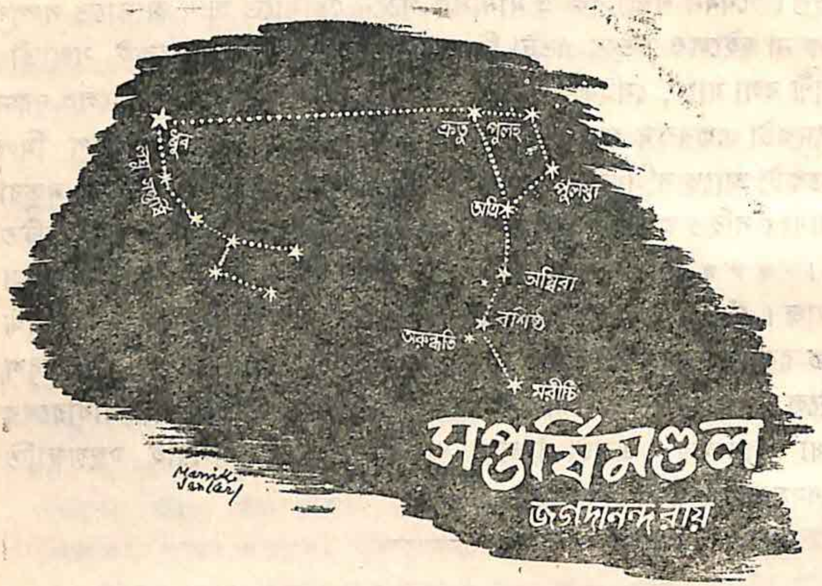
* * * দাঁড়াইল এই। প্রকৃতির মূর্ত্তি কেমন, এ কথার উত্তর নাই ; কেন না, প্রশ্নটার ঠিক অর্থ হয় না। আমার কাছে প্রকৃতির যেমন মূর্ত্তি, তোমার কাছে ঠিক তেমন নহে। আবার কুকুর, বিড়াল, পাখী, ইহাদের কাছে অন্য রকম ; আবার কীটপতঙ্গের কাছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদি ঘটনাক্রমে আমার মানসিক ভাবের অকস্মাৎ ব্যত্যয় হয়, অথবা দুই চারিটা ইন্দ্রিয় বিকৃত বা লুপ্ত, কিংবা দুই চারিটা ইন্দ্রিয় নূতন উদ্গত হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মত প্রকৃতির পরিদৃশ্যমান ছবিখানাও উল্টাইয়া বদ্‌লাইয়া যাইবে। তখন হয়ত কমলাকান্তের ন্যায় মনুষ্যকে পতঙ্গ দেখিতে থাকিব। অগ্নিশিখার সহিত কোর্টশিপে প্রবৃত্ত হইব। বীণার ঝঙ্কারে গাত্রজ্বালা ঘটিবে। সূর্য্যের আলোকে কর্ণ বিদীর্ণ হইবে। চন্দ্রলোকে বিহারার্থ প্রাণ ব্যাকুল হইবে। কিন্তু প্রকৃতির সে মূর্ত্তিটা ঠিক নহে, আর এখন যাহা দেখিতেছি, সেইটাই ঠিক, ইহা বলিবার কোনও অধিকার জন্মিবে না।

তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে। আমার জগতে ও পিঁপীড়ার জগতে বড় সাদৃশ্য নাই। কিন্তু তোমার জগৎ ও আমার জগৎ সম্পূর্ণ এক না হইলেও, উভয়ে কতকটা মিল আছে ; যেহেতু তুমি পিঁপীড়া নহ, তুমি

মনুষ্য। যেমন শারীরিক ও মানসিক গঠনে তোমাতে আর আমাতে সম্পূর্ণ এক না হইলেও উভয়ে এতটা মিল আছে, যাহাতে উভয়কেই সজাতীয় প্রাণী বলা যায়; সেইরূপ তোমার জগৎ ও আমার জগৎ এই মিলের দরুন অনেকটা একরকম ও সজাতীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইরূপ মিল কতকটা আছে বলিয়াই, তোমার সহিত আমার ব্যবহার চলিতেছে। নতুবা তোমার সহিত আমার সম্পর্ক থাকিত না। নতুবা সমাজের সৃষ্টি ঘটিত না। * * * সমাজবদ্ধ না হইলে মানুষের মঙ্গল নাই। পাঁচটাকে লইয়া সমাজ। পাঁচটার কাছে প্রকৃতির মূর্ত্তি পাঁচ রকম হইলে, পাঁচটার ধর্ম্মবুদ্ধি পাঁচ রকম হইলে, পাঁচজনের আচার ব্যবহার কাজকর্ম্মের ভাবগতি বিসদৃশ হইলে, তাহাদের সম্বন্ধবন্ধন ঘটিত না। * * * বস্তুতঃ মানবসাধারণের মধ্যে পরস্পর একটা মিলন আছে। আছে বলিয়াই মনুষ্যজাতি জীবনসংগ্রামে টিকিয়া আছে।

———





নক্ষত্রমণ্ডল লইয়া সব দেশেরই প্রাচীন পুঁথিতে অনেক গল্প আছে। আমাদেরও পুরানো পুঁথিপত্রে সেই রকম অনেক গল্প দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য মণ্ডলের চেয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলের গল্প সংখ্যাই বেশি। সব গল্প লিখিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড বই হইয়া দাঁড়াইবে। তাই সপ্তর্ষিমণ্ডল সম্বন্ধে তুই একটা গল্প বলিব।

আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিতেন, সূর্যের সাতটি রশ্মি অর্থাৎ কিরণরেখা আছে। ইহারা অদিতির পুত্র, সুতরাং দেবতা। অদিতি তাহাদিগকে সাতটি নক্ষত্রের আকারে আকাশে বসাইয়া রাখিয়াছেন। আবার সূর্যও অদিতির পুত্র। কিন্তু সূর্যকে তিনি সেখানে রাখেন নাই। এই প্রকারে সূর্যের সাতটি রশ্মি সাতটি নক্ষত্রের আকারে আকাশে রহিয়াছে।

গ্রীস দেশের গল্পটি বড় মজার। হাজার হাজার বৎসর আগে জুপিটার (Jupiter) নামে এক দেবতা ওলিমপস পাহাড়ে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল জুনো (Juno)। জুনোর যেমন ছিল রূপ, তেমনি ছিল গুণ। জুপিটার ছিল আমাদেরই ইন্দ্রের মত এক দেবতা। তাঁহার প্রধান অস্ত্র ছিল বজ্র। পৃথিবীর লোকে চুরি-ডাকাতি বা মারামারি করিলে, জুপিটার পাহাড়ে দাঁড়াইয়া পাপীদের মাথায় বাজ ফেলিতেন। যাহারা পুণ্য

কাজ করিত, জুপিটার তাহাদিগকে ধরিয়া স্বর্গে লইয়া যাইতেন। সেখানে তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া সুখে কাটাইত।

যাহা হউক, যে সময়ে জুপিটার পৃথিবীর লোকদের এই রকমে শাসন করিতেন, তখন আরকেডিয়ার রাজার কন্যা ক্যালিসটো (Calisto) জীবিত ছিলেন। তাঁর মত সুন্দরী স্ত্রীলোক পৃথিবীতে তখন একটিও ছিল না। ক্যালিসটোকে দেখিয়া জুনোর বড় হিংসা হইল। যাহাতে ক্যালিসটোর রূপ নষ্ট হয় এবং সে কুরূপা হইয়া যায়, জুনো সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জুপিটার তাঁহার স্ত্রীর এই বদ মতলবের কথা শুনিলেন। খামকা একটা মেয়ের রূপ নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা তিনি ভাল মনে করিলেন না। তাই তিনি ক্যালিসটোকে একটা ভল্লুকের আকার দিয়া আকাশে বসাইয়া দিলেন। তখন ক্যালিসটোর এমন সুন্দর দেহ লম্বা লম্বা কালো লোমে ঢাকিয়া গেল ; সুন্দর নখগুলি হইল লম্বা ও ধারাল এবং হাত-পা হইয়া গেল বাঘের থাবার মত থাবাযুক্ত। রাজকন্যা ক্যালিসটো সেই সময় হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল হইয়া আকাশে রহিয়াছেন। এইজন্যই য়ুরোপে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে বৃহৎ ভল্লুকমণ্ডল নাম দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক, ক্যালিসটোর আরকাস নামে যে একটি ছেলে ছিল, তাহার সম্বন্ধেও গল্প আছে। বাঘ, ভালুক, হরিণ প্রভৃতি শিকার করাই তাহার বাতিক ছিল। সে শিকার খুঁজিয়া অনেক সময়েই বনে জঙ্গলে কাটাইত। তাই জুপিটার যে ভালুকের আকৃতি দিয়া তাহার মাকে আকাশে রাখিয়াছেন, সে খবর তাহার জানা ছিল না। একদিন রাত্রিতে আরকাস আকাশে একটা ভালুকের চেহারা দেখিয়া মনে করিল, ভালুকটিকে মারিলে চার পাঁচ দিন বসিয়া বসিয়া তাহার মাংস খাওয়া যাইবে। তারপরে ভালুক শিকারের জন্য যেমন সে তীর-ধনুক হাতে করিল, অমনি জুপিটারের মাথায় টনক নড়িল। তিনি দেখিলেন সর্বনাশ উপস্থিত। আরকাস এখনই ভালুক মনে করিয়া তাঁহার মাকে মারিয়া ফেলিবে! তিনি অন্য কোনো উপায় না পাইয়া তাড়াতাড়ি আরকাসকেও আর একটা ভালুকের চেহারা দিয়া আকাশে লটকাইয়া দিলেন। তোমরা যে লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল চিনিয়াছ, তাহা সেই আরকাসেরই চেহারা। তাহা হইলে দেখ, ক্যালিসটোর

ছেলে আরকাসই লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল হইয়া এখনও আকাশে আছে। য়ুরোপের লোকে লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডলকে বলে, ক্ষুদ্র ভল্লুকমণ্ডল।

জুপিটারের স্ত্রী জুনো ভীষণ হিংসুটে ছিলেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলের গল্পে তোমরা তাহা জানিয়াছ। কেবল হিংসা করিয়াই তিনি রাজকন্যা ক্যালিসটোকে ভালুক করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, অনেকদিন আগে হারকিউলিস নামে এক মহাবীর পৃথিবীতে বাস করিতেন। তাঁর গায়ে এমন জোর ছিল যে, সমস্ত পৃথিবীটাকেও নাকি তিনি কাঁধে করিয়া বেড়াইতে পারিতেন। হারকিউলিসের শক্তি ও সাহস দেখিয়া জুনোর হিংসা হইল। জুনো প্রচার করিলেন, ওলিমপস পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে যে একটা বড় সিংহ আছে, তাহাকে শিকার করিয়া না আনিলে তিনি জলগ্রহণ করিবেন না। কিন্তু সিংহকে মারিয়া আনে এমন সাহসী ও বলবান লোক দেশে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। শেষে হারকিউলিসের ডাক পড়িল। তিনি জুপিটারের কাছে আসিয়া বলিলেন, একটা তো দূরের কথা, হুকুম করিলে একদিনে দশটা সিংহ মারিয়া জুনোর কাছে হাজির করিতে পারেন। জুনো মনে মনে খুব খুশি—তিনি ভাবিলেন, এইবারে হারকিউলিসের দর্প চূর্ণ হইবে। সে নিশ্চয়ই সিংহের হাতে প্রাণ দিবে। হারকিউলিস তীরধনুক এবং আরও অনেক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সিংহ শিকারে বাহির হইলেন।

ঘোর জঙ্গলের মধ্যে সিংহের গুহা। গুহার দ্বারে দাঁড়াইবামাত্র, সিংহ ঘোর গর্জন করিয়া বাহির হইয়া আসিল! গর্জনে আকাশ-পাতাল সকলই কাঁপিতে লাগিল। তারপরে সিংহের সঙ্গে হারকিউলিসের ঝুটাপুটি লড়াই। সিংহটা ছিল হাতীর মত প্রকাণ্ড। হারকিউলিস যে তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন, সেগুলি সিংহের গায়ে ঠেকিয়া টুকরা টুকরা হইতে লাগিল; তরোয়ালের ঘা তাহার গায়ে লাগিল না; গদার আঘাতেও সে কাতর হইল না। অন্য উপায় না দেখিয়া হারকিউলিস সিংহের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধের দাপটে জঙ্গলের বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; কাক, কোকিল, প্যাঁচা, বাঘ, ভালুক, হরিণ সকলেই বন ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। হারকিউলিস সিংহকে এমন ঘুঁসি ও লাথি মারিতে লাগিলেন যে, তাহার মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল। জঙ্গলের মাটি সিংহের রক্তে কাদা

হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি সিংহ মরিল না। শেষে হারকিউলিস এক ফন্দি করিলেন। তিনি সিংহের বুকের উপরে বসিয়া এমন জোরে গলা চাপিয়া ধরিলেন যে, সে আর নিশ্বাস ফেলিতে পারিল না। এইবারে সিংহ মরিয়া গেল।

হারকিউলিসের মনে আর আনন্দ ধরে না। মরা সিংহকে কাঁধে করিয়া তিনি জুনোর কাছে হাজির হইলেন। হারকিউলিসের এই কীর্তি দেখিয়া জুনো অবাক হইলেন কিন্তু একটুও খুশি হইলেন না। হারকিউলিসকে জব্দ করার জন্য তিনি আবার নূতন ফন্দি করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, হারকিউলিস যে সিংহটা মারিয়াছিলেন, তাহাই জুনোর আদেশে আকাশে উঠিয়া এখন সিংহ রাশি হইয়া আছে।

জুনোর ইহাই শেষ কীর্তি নয়। তিনি যখন ওলিমপস পাহাড়ে বাস করিতেন, তখন কালপুরুষ (Orion) নামে এক বলবান শিকারী ছিল। বেচারা দিবারাত্রি কেবল হরিণ, বাঘ, ভালুক এবং খরগোশ শিকার করিয়াই দিন কাটাইত। জুনোর দৃষ্টি এই লোকটির উপরেও পড়িল। হিংসায় জুনো ভাবিল—এমন সাহসী ও বলবান লোক পৃথিবীতে থাকিবে কেন? ইহাকে জব্দ করিতে হইবে। তারপরে তিনি একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছুকে কালপুরুষের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। বিচ্ছুর বিষ ভয়ানক। একটা ছোট বিচ্ছুতে কামড়াইলে মানুষ তাহার বিষে ছটফট করে। কিন্তু সেই বিচ্ছুটা ছিল তিমি মাছের মত প্রকাণ্ড। জুনোর হুকুমে একদিন রাত্রিতে সে কালপুরুষকে কামড়াইয়া পালাইয়া গেল। সেই কামড় কালপুরুষ সহ্য করিতে পারিল না। সে বিচ্ছুর বিষে মারা গেল। মরিয়া সে কালপুরুষ মণ্ডল এবং বিচ্ছু বৃশ্চিক রাশি হইয়া আজও আকাশে রহিয়াছে।

বুটিস মণ্ডলে যে স্বাতী নক্ষত্র আছে, তাহার সম্বন্ধেও একটা গল্প আছে। এক বনে একটি শঙ্খচিল থাকিত। সে বনের পোকা-মাকড় ও ছোট পাখী মারিয়া কোনোগতিকে পেট ভরাইত। একদিন শিকারের সন্ধানে উড়িতে উড়িতে সে জঙ্গলের মধ্যে একটি সুন্দর জায়গা দেখিতে পাইল। জায়গাটি সবুজ ঘাসে ঢাকা এবং তাহার মাঝে ও চারিপাশে নানা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ঠিক যেন একখানি বাগান। ঘোর জঙ্গল, মানুষের নামগন্ধ নাই। কে এমন

জায়গায় বাগান করিল? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে চিল বাগানের কাছে এক ঝোপের আড়ালে বসিল। একটু পরেই আকাশে সুমিষ্ট গানের শব্দ শুনা গেল। চিল ভাবিল, এ আবার কি? আকাশের দিকে তাকাইবামাত্র দেখিল, এক টুকরা সাদা মেঘের মত একটা জিনিস বাগানের দিকে নামিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই মেঘটা হইয়া দাঁড়াইল একটা টুকরি। তাহার সবটাই সোনা ও রূপা দিয়া তৈয়ারি। টুকরি ধীরে ধীরে বাগানে নামিল এবং দেখিতে দেখিতে সাতটি পরী টুকরি হইতে নামিয়া বাগানের ঘাসের উপরে নাচ-গান আরম্ভ করিয়া দিল।

চিল এই সব দেখিয়া মনে করিল, 'আমার বাসাতে কেহ নাই। যদি একটি পরীকে ধরিয়া বাসায় রাখিতে পারি, তবে সে বাচ্চাদের যত্ন করিতে পারিবে।' এই ভাবিয়া চিল যেমনি একটি পরীকে ধরার জন্য ছোঁ মারিতে গেল, অমনি সাতটি পরীই সোনার টুকরিতে চাপিয়া আবার আকাশের উপরে উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহারা মেঘের আড়ালে কোথায় গেল, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

কিন্তু চিল আশা ছাড়িল না। পর দিনে সে খরগোশের আকারে ফুলগাছের তলায় বসিয়া রহিল। পরীরা সোনার টুকরিতে আসিয়া আবার নাচ-গান শুরু করিল। চিল খরগোশের আকারে যেমনি একটি পরীকে ধরিতে গেল, অমনি সকলে খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে টুকরিতে চাপিয়া পালাইয়া গেল। চিল বুঝিল, ছদ্মবেশে পরীদের ধরা যাইবে না। পর দিনে সে ঠোঁট দিয়া গর্ত খুঁড়িয়া গর্তে লুকাইয়া রহিল। ঠিক সময়ে পরীরা আসিলে সবচেয়ে ছোট পরীকে ঠোঁটে করিয়া লইয়া সে বাসায় ফিরিল।

দুই মাস পরীটি চিলের বাসায় রহিল। চিলের আহার পচা ব্যাং, মরা ইঁদুর, মাঠের ফড়িং ও গোবরে পোকা। আর পরীর আহার ফুলের মধু আর চাঁদের সুধা। পচা ব্যাং খাইয়া পরীর গা ঘিনঘিন করিতে লাগিল। সে আবার আকাশের ওপারে পরীরাজ্যে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। ওদিকে পরীর বাপ-মা পরীকে হারাইয়া কাঁদিয়াই অস্থির।

একদিন গাছের ডালে বসিয়া রোদ পোহাইয়াই চিল ব্যাং ও ফড়িং শিকারের জন্য বাহির হইয়া পড়িল, ঘরে সেদিন খাবার ছিল না। এই

সুযোগে পরীর বাপ চিলের বাসায় আসিয়া পরীকে সেই সোনার টুকরিতে বসাইয়া পালাইয়া গেল। চিল দূর হইতে ইহা দেখিয়া পরীর পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটিল, কিন্তু নাগাল পাইল না।

পরী আকাশের ওপারে গিয়াও চিলকে ভুলে নাই। অনেকদিন পরে তাহাকে ডাকিয়া পরীরাজ্যে আনিয়াছিল। সেই চিলই এখন স্বাতী নক্ষত্র হইয়া আকাশে রহিয়াছে।

হাইড্রা (Hydra) অর্থাৎ জলসর্প মণ্ডলকে তোমরা চিনিয়াছ। এই মণ্ডল সম্বন্ধেও আমাদের শাস্ত্রে একটি সুন্দর গল্প আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দ ঘোষের ঘরে থাকিয়া বাল্যলীলা দেখাইতেছিলেন, তাহার গল্প হয় তো তোমরা শুনিয়াছ। অকাসুর বধ, বকাসুর বধ, গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি কত কাণ্ডই তিনি করিয়াছিলেন। যমুনার ধারই তাঁহার গরু চরাইবার জায়গা ছিল। এই সব ঘটনা যমুনার ধারেই ঘটিয়াছিল।

যাহা হউক, যমুনার জলে এক সময়ে একটা ভয়ঙ্কর কেউটে সাপ থাকিত। তাহার নাম ছিল কালিয় এবং আকৃতি ছিল প্রকাণ্ড তালগাছের মত। আবার তাহার ফণা ছিল হাজারটা। কেহ সাপের ভয়ে যমুনায় স্নানে যাইতে পারিত না। এমন কি বিষে যমুনার জল এমন বিষাক্ত থাকিত যে, কেহই সে জল খাইতে পারিত না।

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, এই আপদকে মারিতে না পারিলে দেশে থাকা দায় হইবে। একদিন কালিয় যখন তাহার হাজার ফণা মেলিয়া যমুনায় সাঁতার কাটিতেছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ এক লাফে ফণায় চড়িয়া তাহাকে পা দিয়া দলাইতে লাগিলেন। কালিয়র প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল, সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে শুরু করিল। কালিয়র স্ত্রী কাছেই চরিয়া বেড়াইতেছিল। স্বামীকে মৃতপ্রায় দেখিয়া সে হাতজোড় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব আরম্ভ করিল। ইহাতে খুশি হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'আচ্ছা, কালিয়কে প্রাণে মারিব না। কিন্তু ইহাকে যমুনা ছাড়িয়া পালাইতে হইবে।' কালিয় এই কথা শুনিয়া বলিল, 'প্রভু, কোথায় যাইব আদেশ করুন। গরুড় আমার পরম শত্রু। সে আমাকে দেখিলেই খাইয়া ফেলিবে।' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'ভয় নাই! তোমার ফণার উপরে আমার পায়ের চিহ্ন আছে। ইহা দেখিলে গরুড় তো দূরের কথা, স্বয়ং

যমও তোমার কাছে আসিবে না। তুমি পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশে গিয়া বাস কর।' সেই অবধি কালিয় হাইড্রার আকারে আকাশে রহিয়াছে।

তোমরা কন্যা রাশি, চিত্রা নক্ষত্র এবং ক্যানিস ভেনাটিসি নামে যে নক্ষত্রমণ্ডল দেখিয়াছ, তাহাদের সম্বন্ধেও আমাদের বেদে একটি গল্প আছে। তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ, প্রজাপতির দুই ছেলে দেবতা ও অসুরদের বংশে চিরকালই খুব শত্রুতা ছিল। দেবতারা বলেন, আমরা বড়। অসুরেরা বলেন, দেবতারা কিছুই নয়, আমরাই বড়। এই লইয়া দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যে কত ঝগড়াঝাটি, মারামারি ও যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে, তাহা তোমরা হয় তো মহাভারতে পড়িয়াছ। দেবতার রাজ্য ছিল স্বর্গে এবং অসুরেরা বাস করিতেন পৃথিবীতে ও পাতালে।

যাহা হউক, এক সময়ে দেবতাদের স্বর্গ আক্রমণ করার জন্য অসুরেরা পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ির আকারের এক আগুনের বেদী তৈয়ারি আরম্ভ করিলেন। দেবতারা দেখিলেন, অসুরেরা যদি সিঁড়ি দিয়া স্বর্গে হাজির হয়, তবে স্বর্গ ছারেখারে যাইবে। দেবতাদের রাজা ছিলেন ইন্দ্র। তাঁহার মাথায় এক ফন্দি আসিল। তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে একখানি ইট হাতে করিয়া অসুরদের কাছে গেলেন। অসুরেরা তখন সিঁড়ি গাঁথিতে ব্যস্ত। ইন্দ্র অসুরদের ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, বাছারা তোমরা যে মহৎ কাজে হাত দিয়াছ, তাহা অতি উত্তম। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর দু' দিন পরেই মরিতে হইবে। তোমাদের স্বর্গের সিঁড়িতে এই ইটখানি লাগাও। এই ইটের জন্যই আমি মৃত্যুর পর এই সিঁড়ি দিয়া স্বর্গে যাইব।' অসুরেরা বলিল, 'তথাস্তু, দাও তোমার ইট ; সিঁড়িতে গাঁথিয়া রাখি।' ইটখানি সিঁড়িতে গাঁথা রহিল।

সিঁড়ি গাঁথা শেষ হইয়া গেলে একদিন ইন্দ্র আবার সেই ব্রাহ্মণের বেশে গিয়া অসুরদের বলিলেন, 'বাছারা, স্বর্গের সিঁড়ি গাঁথিয়াছ ; বেশ করিয়াছ। আমি যে ইটখানি দিয়াছিলাম, তাহা এবারে ফেরত চাই।' এই বলিয়া ইন্দ্র সেই ইটখানি সিঁড়ি হইতে যেই খুলিয়া লইলেন, অমনি স্বর্গের সিঁড়ি হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইহাতে সিঁড়ি চাপা পড়িয়া যে কত অসুর মারা

গেল, তাহার ইয়ত্তা হইল না। কেবল ইহাই নয়, ইন্দ্র সেই ইট দিয়া বজ্র তৈয়ারি করিলেন এবং বজ্র দ্বারা হাজার হাজার অসুরকে বধ করিলেন।

এই ঘটনার পরে স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা ভাঙ্গা সিঁড়ির গোড়ায় আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'চিত্রং চিত্রং।' অর্থাৎ অতি আশ্চর্য! এমন সময়ে সিঁড়ির গোড়া হইতে এক জ্যোতির্ময় জিনিস আকাশে উঠিল এবং তাহাই হইয়া দাঁড়াইল চিত্রা নক্ষত্র। তা ছাড়া ভাঙ্গা সিঁড়ির যে দু'খানা ইট আকাশে উঠিয়াছিল, তাহারা হইয়া দাঁড়াইল ক্যানিস ভেনাটিসি মণ্ডলের দুইটি তারা।

কৃত্তিকা নক্ষত্রের গল্প করা যাউক। তোমরা সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারাকে চিনিয়াছ। মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং বশিষ্ঠ, এই সাতজন ঋষি সাতটি নক্ষত্রের আকারে আকাশে রহিয়াছেন। ইঁহাদের স্ত্রীদের নাম ছিল সম্ভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, অরুন্ধতী, শিবা এবং লজ্জা। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী। তিনি বশিষ্ঠেরই কাছে খুব ছোট তারার আকারে থাকেন। তোমরা অরুন্ধতীকে (Alcor) বশিষ্ঠের কাছে দেখিয়াছ। কিন্তু অন্য মুনি-পত্নীরা তাঁহাদের স্বামীর কাছে নাই।

আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, অগ্নিদেব প্রায়ই একা একা আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তখন তাঁহার ঘর-দুয়ার বা স্ত্রী-পরিবার কিছুই ছিল না। তিনি একদিন হঠাৎ সাতজন ঋষির সাতটি স্ত্রীকে দেখিয়া মনে করিলেন, এই সুন্দরী মেয়েগুলিকে যদি দাসী করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে খাবার-দাবার এবং ঘরকন্নার আর অসুবিধা থাকিবে না। অগ্নিদেব ঋষির স্ত্রীদের কাছে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তোমরা আমার দাসী হও।' তাঁহারা বড় বড় ঋষির স্ত্রী, অগ্নিদেবের কথা তাঁহারা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। ঋষিদের স্ত্রী এই রকমে অপমান করিলেন বলিয়া অগ্নিদেবের ভয়ানক কষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন, এমন অপমানের জন্য মরাই ভাল। তাই অনাহারে মরিবার জন্য অগ্নিদেব এক ঘোর জঙ্গলে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। সাত দিন এবং সাত রাত্রি তিনি এক বিন্দু জলও মুখে দিলেন না।

দক্ষের কন্যার নাম ছিল স্বাহা দেবী। তিনি আকাশ হইতে অগ্নিদেবের এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন। লোকটা না খাইয়া মারা যায় দেখিয়া তাঁহার

মনে দয়া হইল। কিন্তু উপায় কি ? ফস করিয়া স্বাহার মাথায় একটা ফন্দি আসিল। তিনি নিজের চেহারা বদলাইয়া অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধরিয়া অগ্নির কাছে উপস্থিত হইলেন। স্বাহাকে পাইয়া অগ্নিদেব খুশি হইলেন এবং তাঁহাকে দাসী না করিয়া বিবাহ করিলেন। এই রকমে স্বাহা হইয়া গেলেন অগ্নির স্ত্রী।

অগ্নিদেব এখন খুব খুশি। তিনি স্বাহাকে লইয়া ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি সপ্তর্ষির স্ত্রীদের দাসী করার ঝোঁক তাঁহার গেল না। স্বাহা দেখিলেন, মহা মুশকিল। একে তো শিবার রূপ ধরিয়া আসিয়া তিনি অন্যায় করিয়াছেন। অন্য মুনিদের স্ত্রীর রূপ ধরিয়া অগ্নিকে আবার ঠকাইলে আরও অন্যায় হইবে। লোকে তখন নিন্দা করিয়া বলিবে, দেখ বড় বড় ঋষিদের স্ত্রী অগ্নির দাসীপনা করিতেছে। স্বাহা মনের দুঃখে পাখীর আকারে উড়িয়া এক পর্বতের চূড়ায় বাসা বাঁধিলেন। পাহাড় যেমনি উঁচু, তেমনি জঙ্গলে ঢাকা। কাহার সাধ্য যে পাহাড়ে উঠে ? আবার পাহাড়ের গায়ে ধারাল তীর পোঁতা। যদি কেহ পাহাড়ে উঠিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার সর্বাঙ্গে তীর ফুটিয়া যায়।

এখানেও কিন্তু স্বাহা পালাইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে হারাইয়া অগ্নিদেব আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া পাগলের মত বনে বনে ঘুরিতে লাগিলেন। স্বামীর এই দুরবস্থা দেখিয়া স্বাহার খুব দুঃখ হইল। তিনি অগ্নিকে ভুলাইবার জন্য ছয় ঋষির ছয় স্ত্রীর আকার গ্রহণ করিয়া, অগ্নির কাছে এক একদিন যাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার বাড়িতে দাসীপনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর রূপ তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বশিষ্ঠ যেমন মহাজ্ঞানী ও তপস্বী ছিলেন, অরুন্ধতীও ঠিক সেই রকম মহাবিদুষী ও তাপসী ছিলেন। তাই অরুন্ধতীর রূপ গ্রহণ করিয়া অগ্নিকে ছলনা করিতে তাঁহার ভয় হইল। যাহা হউক, ছয় ঋষির ছয় স্ত্রীকে দাসীরূপে পাইলেন ভাবিয়া অগ্নিদেব ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে স্বাহার একটি ছেলে হইল। ছেলেটিকে তিনি আর অগ্নিদেবের ঘরে আনিলেন না। যে পাহাড়ে স্বাহা আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই পাহাড়ের এক গুহায় ছেলেটি বড় হইতে লাগিল। অদ্ভুত ছেলে—তাহার

ছয়টা মুখ, বারোটা কান, বারোটা চোখ, বারোটা করিয়া হাত ও পা। কিন্তু তাহার পেট ছিল একটা।

এদিকে মহা হুলুস্থুল। সপ্তর্ষিদের মধ্যে ছয়জন ঋষির কানে গেল যে, তাঁহাদের স্ত্রীরা অগ্নিদেবের দাসীপনা করিতেছেন। ঋষিরা একবার রাগিলে আর রক্ষা থাকিত না। তাঁহারা স্ত্রীদের ধমকাইয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ঋষি-পত্নীরা বলিতে লাগিলেন, 'আমরা দাসীপনা করি নাই। স্বাহাই আমাদের রূপ ধরিয়া অগ্নিদেবের দাসীপনা করিয়াছে।' কিন্তু ঋষিরা এ কথা বিশ্বাস করিলেন না।

ঋষিদের স্ত্রীরা এই রকমে ঘর ছাড়া হইয়া, অনেকদিন পথে পথে ভিক্ষা করিয়া কাটাইলেন। কিন্তু আর সহ্য হইল না। তাঁহারা সকলে মিলিয়া স্বাহার ছেলে স্কন্দের কাছে নালিশ করিয়া বলিলেন,—'দেখ বাবা, তোমার মা স্বাহার জন্যই আমাদের এই দুর্গতি।' স্কন্দের দয়া হইল। তিনি বলিলেন, 'আপনাদের আর ভয় নাই। আপনারা ছয় জনে একসঙ্গে আকাশে গিয়া থাকুন।'

আমরা এখন সেই ছয় ঋষির পত্নীকেই কৃত্তিকামণ্ডলের আকারে আকাশে দেখিতে পাই। গুণিয়া দেখ, কৃত্তিকাতে খালি চোখে ছয়টি বড় তারাকেই দেখা যায়।





একশ বৎসর আগে পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বাইবেলের উক্তি অনুসারে বিশ্বাস করতেন যে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। **** আধুনিক গবেষণায় স্থির হয়েছে, পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি নয়, বহু কোটি বৎসর। আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের কার্য-পরিমাণ আরও বিপুল, প্রচলিত ধারাপাতে সংখ্যার এই তালিকা দেখা যায়, এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত (million), কোটি, অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ (billion), পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য, পরার্ধ।

পরার্ধ মানে ১-এর পিঠে ১৭ শূন্য। ছেলেবেলায় আমরা যে ধারাপাত পড়তুম তাতে পরার্ধের পরেও অনেক সংখ্যা ছিল। তাদের কার্য ভুলে গেছি, শুধু শেষের দুটি মনে আছে—পার, অপার। আমাদের যিনি অঙ্ক শেখাতেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, অপারের পর কোন্ সংখ্যা ? তাঁর বিদ্যা বেশী ছিল না, উত্তর দিলেন, অপার সব চাইতে বড়, তারপর আর সংখ্যা নাই। আমি বললুম, কেন, অপারের পিঠে তো আরও শূন্য জুড়ে দেওয়া যায়। তিনি বললেন, তাতে তোর লাভটা কি ? অপারের বেশী টাকাও তোর হবে না, কাঁইবিচিও হবে না। মাস্টার মশাই রিয়ালিস্ট ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত পিঁপড়ের মতন। চিনির এক কণায় যদি পেট ভরে তবে বস্তার সন্ধান করা বোকামি।

বিজ্ঞানিরা টাকা গোণবার জন্যে সংখ্যা চান না, যেসব বৃহৎ বা সূক্ষ্ম বা রাশি রাশি বস্তু নিয়ে তাঁদের কারবার, তার পরিমাপের জন্যই সংখ্যা দরকার। লক্ষ, কোটি, মিলিয়ন, বিলিয়ন ইত্যাদিতে এখন কাজ চলে না। তারার তারার দূরত্ব মাপা হয় আলোকবর্ষ দিয়ে (প্রায় ৬ এর পর ১২ শূন্য মাইল), অথবা parsec দিয়ে (প্রায় ১৯ এর পর ১২ শূন্য মাইল), অতি সূক্ষ্ম বস্তু মাপা হয় Angstrom Unit দিয়ে (সেন্টিমিটারের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ)। ****

যাঁরা খাঁটি গাণিতিক তারা সংখ্যা নির্ধারণ করেই খুশী, তা দিয়ে কি মাপা হবে সে চিন্তা তাদের নেই। **Edward Kasner** একজন বিখ্যাত মার্কিন গণিতজ্ঞ। খেয়ালের বশে একদিন তিনি একটা সংখ্যা স্থির করলেন—১এর পিঠে ১০০ শূন্য। তাঁর ন বছরের ভাইপোকে বললেন, ওরে, একটা নাম বলতে পারিস? ভাইপো বলল, googol। নামটি গ্রীক ল্যাটিন বা ইংরেজী নয়, ছোট ছেলের স্বচ্ছন্দ বালভাষিত, যেমন হিট্‌টিমাটিম। কিন্তু এই গুগল নাম এখন সর্ব-স্বীকৃত হয়েছে। কাসনার তার ভাইপোকে আবার বললেন, গুগলের চাইতে ঢের বড় একটা সংখ্যা বলতে পারিস? ভাইপো বলল, পারি, এদের পিঠে দেদার শূন্য বসিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না হাতে ব্যথা হয়। কাসনার বললেন, তা হলে তো একটা মুর্খ পালোয়ানের কাছে আইনস্টাইনকে হেরে যেতে হবে, সংখ্যার নির্ধারণ গায়ের জোরে হতে পারে না। তখন ভাইপো চিন্তা করে বলল, একের পিঠে এক গুগল শূন্য, এর নাম হক googolplex। কাসনার বললেন, তথাস্তু, গাণিতিক সমাজও তাই মেনে নিলেন। **** গুগলপ্লেক্স লেখবার চেষ্টা করবেন না, পাগল হয়ে যাবেন। **** আমাদের গ্যালাক্সি বা ছায়াপথে কত তারা আছে? জ্যোতিষীরা অনুমান করেন ৩,০০০ কোটি থেকে ১০,০০০ কোটির মধ্যে, অর্থাৎ ৩ এর পর ১০ শূন্য এবং ১ এর পর ১১ শূন্যের মধ্যে। গুগলের চাইতে ঢের কম। ****

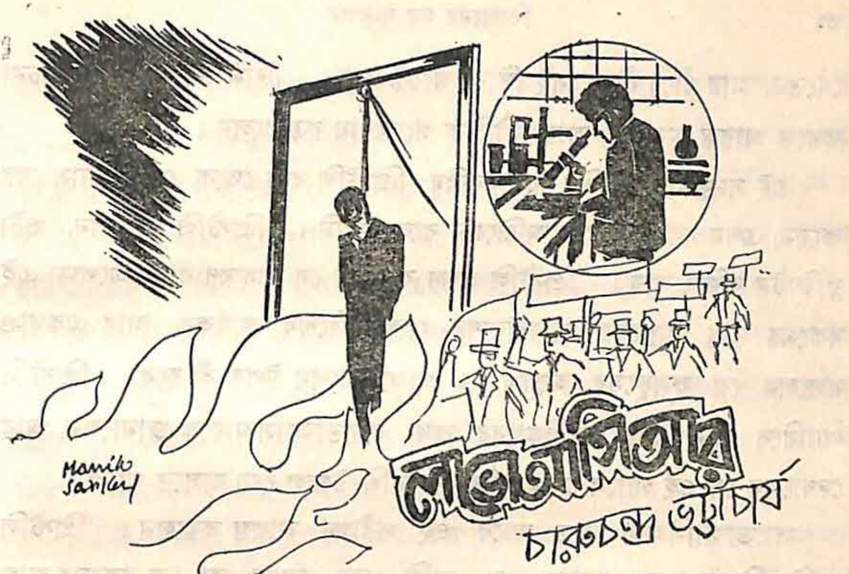
এইবার অতি ক্ষুদ্র রাশি—। *** আমাদের শাস্ত্রোক্ত অণু-পরমাণু কি বস্তু তা বোঝা যায় না। সংস্কৃত অভিধানে ত্রসরেণুর অর্থ—ছয় পরমাণুর সমষ্টি অথবা গবাক্ষচ্ছিদ্রাগত রৌদ্রে দৃশ্যমান চঞ্চল সূক্ষ্ম পদার্থ। জীববিজ্ঞানে

কীটের চাইতে কীটাণু ছোট, তার চাইতে জীবাণু বা মাইক্রোব আরও ছোট। তার চাইতে ভাইরাস ছোট (অণুবীক্ষণে অদৃশ্য)। রসায়নে অণু আরও ছোট, পরমাণু তার চাইতে ছোট, প্রোটন আরও ছোট, ইলেকট্রন সবচাইতে ছোট। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের উত্তম উদাহরণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। মাদার টিংচারে যে মূল বস্তু থাকে তার ১০ ভাগের ১ ভাগ থাকে প্রথম ডাইলিউশনে। তৃতীয় ডাইলিউশনে ১,০০০ ভাগের ১ ভাগ। দ্বাদশ ডাইলিউশনে লক্ষ কোটি ভাগের ১ ভাগ। শততম ডাইলিউশনে থাকে ১ গুগলের ১ ভাগ। হোমিও-প্যাথরা বলেন ডাইলিউশন বৃদ্ধিতে পোটেন্সি বৃদ্ধি হয়। অবিশ্বাসীরা বলেন, ১০০ ডাইলিউশনে পৌঁছবার আগেই এমন অবস্থা হয় যে এক শিশিতে অণুপ্রমান ঔষধও থাকেনা। বিশ্বাসী বলেন, তোমার অঙ্কশাস্ত্র যাই বলুন, অণু-প্রমান ঔষধ থাকুক না থাকুক, স্পষ্ট দেখছি উপকার হয়। অতএব তর্ক না করে খেয়ে যাও, বিশ্বাসেই কৃষ্ণলাভ হয়।

অতি সূক্ষ্মের আর একটি উদাহরণ—ব্যাঙের আধুলি গল্প। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতীতে তার ভাল বর্ণনা আছে। ব্যাঙ তার বন্ধুকে একটি আধুলি ধার দিয়েছিল। শর্ত এই ছিল যে প্রতি কিস্তিতে অর্ধেক শোধ করতে হবে। প্রথম কিস্তিতে চার আনা, দ্বিতীয়তে তুই আনা, তারপর যথাক্রমে এক আনা, তু পয়সা, এক পয়সা, আধপয়সা ইত্যাদি। ব্যাঙ হিসাব করে দেখল, তার পাওনা কোনও দিনও শোধ হবে না। একটু বাকী থাকবেই। সে মনের তুঃখে কাঁদতে লাগল। ব্যাঙ যদি বুদ্ধিমান হত তবে বুঝত যে কয়েক কিস্তি পরেই বাকীর পরিমাণ নগণ্য হয়ে যাবে। অনন্তকাল তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

অন্তরকলন বা differential calculus এর আবিষ্কর্তা লাইবনিৎস সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন তিনি প্রশিয়ার রাণীকে বললেন, যদি অনুমতি দেন তবে আজ আপনাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (infinitesimal) রাশির রহস্য বুঝিয়ে দেব। রাণী বললেন, আপনাকে বোঝাতে হবে না, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাকে বলে তা এখানকার এই সভাসদ্‌দের আচরণ থেকেই আমি টের পাই।

———



কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই একেবারে মানুষের কাজে লাগার আকারে জন্মায় না। আরম্ভটা হয় ছোট রকমে, ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে, মন্থর গতিতে। যে বীজ পরে বৃহৎ বটগাছে পরিণত হয়, আদিতে তা থাকে ক্ষুদ্র। রসায়নবিদ্যায় লাভোআসিআর যা দিয়ে গেছেন তা খুব বেশি নয়, কিন্তু তা ছিল রসায়নবিদ্যার মূলের কথা। লাভোআসিআরকে যথার্থই রসায়নবিদ্যার জনক বলা হয়।

লাভোআসিআরের আগে থেকেও রসায়নবিদ্যার অনুশীলন হয়ে আসছিল, কিন্তু সে সবের মধ্যে মাপজোখের হিসাব ছিল না। নিউটনের আবির্ভাবের সঙ্গে বিজ্ঞানের আবহাওয়ায় সূক্ষ্ম হিসাবপত্র দেখা দিল, রসায়নবিদ্যার চর্চাও সে আওতায় এসে পড়ল। লাভোআসিআর প্রচলিত জল্পনা কল্পনাকে যাচাই করলেন তুলাদণ্ডের সাহায্য নিয়ে।

প্রত্যেক দাহ্য পদার্থে দুটি অংশ থাকে, ভস্ম ও ফ্লজিস্টন। পুড়লে ফ্লজিস্টনটা বেরিয়ে যায়, পড়ে থাকে ভস্ম। এই ছিল লাভোআসিয়ারের পূর্বকার রসায়নবিদ্‌দের কথা।

১৭৪৩ সালে প্যারিসে এক ধনী পরিবারে লাভোআসিআর জন্মগ্রহণ করেন। ভবিষ্যতে আইন ব্যবসায় গ্রহণ করবার জন্য তিনি প্রস্তুত হন। কিন্তু সে সময় ওই শহরে রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা হত তিনি তা শুনতে

যেতেন, আর ধীরে ধীরে সেই দিকে আকৃষ্ট হলেন। তিনি ওই শাস্ত্র আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন, আর মৌলিক গবেষণায় রত হলেন।

এই সময়কার বিশিষ্ট রসায়নবিদ্ প্রিস্টলি বায়ু থেকে একটা গ্যাস বের করেন, এখন আমরা যাকে অক্সিজেন বলে জানি। প্রিস্টলি বললেন, ওটা ফ্লজিস্টন বর্জিত বায়ু। প্রিস্টলি লক্ষ্য করলেন যে সাধারণ বায়ু অপেক্ষা এই রকমের বায়ু মানুষের প্রাণধারণের পক্ষে বিশেষ কার্যকর, আর একথাও বললেন যে ফুস্‌ফুসের অসুখে এ গ্যাস বিশেষ উপকারী হবে। প্রিস্টলি প্যারিসে এসে তাঁর আবিষ্কারের কথা লাভোআসিআরকে জানালেন, আর দেখালেন যে ওই গ্যাসে মোমবাতি খুব বেশি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে।

লাভোআসিআর অন্য ভাবে ওই পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। প্রিস্টলি দেখিয়েছিলেন যে পারাকে খুব বেশি গরম করলে তা এক রকমের লাল গুঁড়াতে পরিণত হয়, আর সেই গুঁড়াকে গরম করলে ফ্লজিস্টনবিহীন বায়ু বেরয়। লাভোআসিআর প্রিস্টলির পরীক্ষা মেনে নিলেন, আর প্রিস্টলি যে গ্যাসকে ফ্লজিস্টনবিহীন বায়ু বলেছিলেন তিনি তার নাম দিলেন অক্সিজেন। সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ওজন করে লাভোআসিআর দেখলেন যে পরীক্ষা শেষে ওই লাল গুঁড়ার ওজন কিছুটা কমল, আর যতটা কমল ঠিক সেই ওজনের অক্সিজেন বেরল। এবার তিনি ওই লাল গুঁড়া সম্বন্ধে পরীক্ষায় এলেন। আবদ্ধ বায়ুতে পারা গরম করে ওই লাল গুঁড়া পেলেন। এখানে লাভোআসিআর দেখলেন যে পারা ওজনে যতটা বাড়ল, বায়ুর ওজন ঠিক সেই পরিমাণে কমল।

এই সব পরীক্ষা থেকে লাভোআসিআর দহন সম্বন্ধে এক নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। কোন ধাতুকে গরম করলে তা ওজনে বাড়ে। লাভো-আসিআর বললেন, এর একমাত্র কারণ হল, উত্তপ্ত অবস্থার ওই ধাতু বায়ুর কিছুটা অক্সিজেন নিয়ে নেয়, রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। ফ্লজিস্টন তত্ত্ব একেবারে পরিত্যক্ত হল, রসায়নবিদ্যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়াল।

শ্বাস নেবার সময় বায়ুর কি পরিবর্তন ঘটে সে সম্বন্ধে লাভোআসিআর বিবিধ পরীক্ষা করলেন। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এখানেও দহন ক্রিয়া চলেছে। দেহ অক্সিজেন নিচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করছে। তিনি যখন শুনলেন যে ক্যাভেণ্ডিস দু রকমের গ্যাস মিশিয়ে জল তৈরি

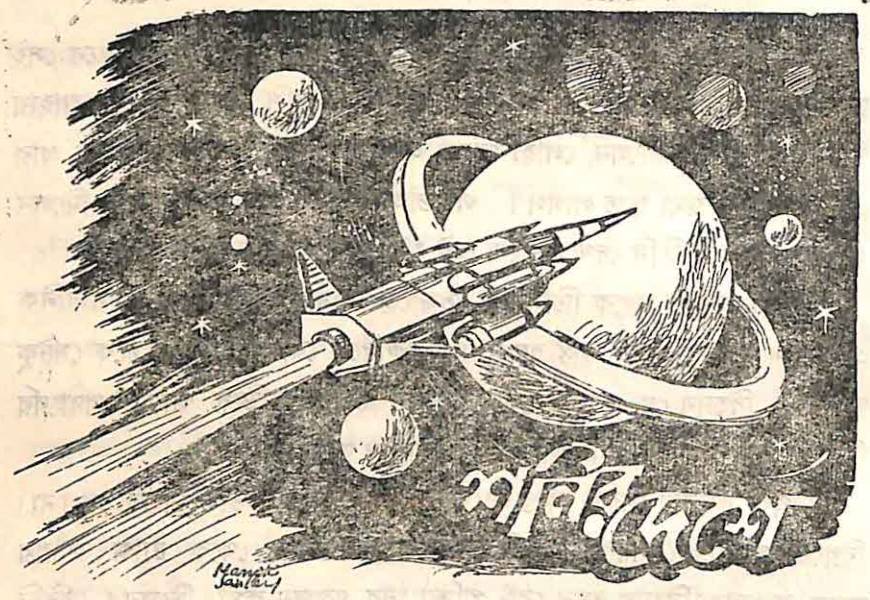
করেছেন, তখনই তিনি এক পরীক্ষার উদ্যোগ করলেন, জল বিশ্লেষণ করে সেই দু রকমের গ্যাস পাওয়া যায় কি না। তিনি খুব বেশি রকম উত্তপ্ত লোহার উপর দিয়ে স্টিম পাঠালেন, লোহা জলের অক্সিজেন নিয়ে নিল, অন্য দিকে আর একটা গ্যাস জমা হতে লাগল। লাভোআসিআর এই গ্যাসের নাম দিলেন হাইড্রোজেন। তিনি দেখলেন যে, এই হাইড্রোজেন গ্যাস নিজে জ্বলে।

বিবিধ পরীক্ষা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নতুন কিছুরই সৃষ্টি হয় না। একদিকে যেটুকু যায় অন্যদিকে সেটুকু আসে। বিজ্ঞান যে কয়টি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, পদার্থের নিত্যতা সম্বন্ধে লাভোআসিআরের এই সিদ্ধান্ত তার অন্যতম।

বিপ্লবী ফ্রান্সের নিকট কিন্তু লাভোআসিআরের প্রতিভাও রেহাই পেল না। বিপ্লবের পূর্বে যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান লোকের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করত, লাভোআসিআর তখন সেই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী ছিলেন। তিনি অভিযুক্ত হলেন, তাঁর প্রতি ফাঁসির দণ্ড হল। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি এই কথা জানালেন যে রাষ্ট্রে বিজ্ঞানীর কোন প্রয়োজন নেই।

লাভোআসিআর প্রাণ দিলেন। তাঁর পরও মানুষ-মানুষের মধ্যে অনেক মারামারি কাটাকাটি চলে এসেছে, সে সবের মূলে ছিল, কোথাও জাতিগত বিরোধ, কোথাও ধর্মগত দ্বন্দ্ব। কিন্তু আর একথা কারও মনে আসেনি যে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের কোন স্থান নেই। বরং বর্তমান যুগে এইটেই দেখা যাচ্ছে যে, যে-দেশ বিজ্ঞানকে বেশি করে আয়ত্তের মধ্যে আনছে, যুদ্ধে বিজয়ীর জয়মাল্য তারই গলায় এসে পড়ছে।

*** ফরাসি বিপ্লবে উন্মত্ত জনতা রাজাকে হত্যা করেছিল, সেটা তত বড় কথা নয়, তারা যে রসায়ন-বিদ্যার জনক লাভোআসিআরের প্রাণদণ্ড দিয়েছিল এইটাই চিরদিন মানবজাতির ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রাখবে। কিন্তু ফরাসিজাতির বুঝতে দেরি হল না যে, তাদের নৃশংসতা আঘাত করেছে শুধু একজন লোককে নয়, সমগ্র মানব জাতিকে। তাই ওই ঘটনার দু বছর পরে লাভোআসিআরের দেহ নিয়ে যে বিপুল শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে যে সব সাধুবাদ হয়েছিল সে সবে শুধু তাঁর বন্ধুরা যোগ দেন নি, যে-সব রাজনীতিজ্ঞ তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিলেন তাঁরাও এগিয়ে এসেছিলেন।



সুকুমার রায়

কেউ যদি বলে যে, এই পৃথিবীর বাইরে যেখানে বলবে, সেখানে নিয়ে তোমাদের তামাশা দেখিয়ে আনবে—তাহলে তোমরা কোথায় যেতে চাও? আমি জানি সেরকম হলে আমি নিশ্চয় শনিগ্রহে যেতে চাইব। পৃথিবীর আকাশে আমরা শুধু চোখে যতটুকু দেখতে পাই, তাতে মনে হয় যে, সব চাইতে সুন্দর জিনিস হল চাঁদ। সেখানে একবার যেতে পারলে আর কিছু না হোক, এই পৃথিবীটাকে কেমন মস্ত আর জমকালো চাঁদের মতো দেখায়, সেটা নিশ্চয়ই একটা দেখবার মতো জিনিস। কিন্তু শনিগ্রহে যাবার পথে সেটা আমরা দেখে নিতে পারব।

যাক, মনে কর যেন শনিগ্রহে যাত্রা করাই স্থির হল। মনে কর এমন আশ্চর্য আকাশ-জাহাজ তৈরি হল যাতে পৃথিবী ছেড়ে, পৃথিবীর বাতাস ছেড়ে ফাঁকা শূন্যের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া যায়। তোমার বয়স কত? দশ বৎসর? বেশ! তাহলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আমরা স্বপ্ন-জাহাজে রওনা হলাম শনিগ্রহে যাবার জন্য। আমাদের জাহাজটা মনে কর খুব দ্রুত এরোপ্লেনের মতো ঘণ্টায় ১০০ মাইল বা ১২৫ মাইল করে চলে।

আমরা আকাশের ভিতর দিয়ে হু হু করে চলেছি আর পৃথিবীর ঘর বাড়ি সব ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় শহর, বড় বড় নদী

সব বিন্দুর মতো, রেখার মতো হয়ে আসছে। এই গোল পৃথিবীর গায়ে পাহাড় সমুদ্র, দেশ মহাদেশ ক্রমে সব অতি নিখুঁৎ মানচিত্রের মতো দেখা যাচ্ছে। ঐ ফ্যাকাশে হলদে মরুভূমি, ঘন সবুজ বন, ঐ ছেয়ে-নীল সমুদ্র, ঐ সাদা সাদা বরফের দেশ। নভেম্বর মাসে আমরা এখান থেকে চাঁদ যতদূর, ততদূর চলে গিয়েছি। এক বছরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আমরা প্রায় দশ লক্ষ মাইল এসে পড়েছি। পৃথিবী থেকে চাঁদটাকে যেমন দেখি এখন পৃথিবীটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। হিমালয় পাহাড়কেও আর পাহাড় বলে ভাল বোঝাই যাচ্ছে না। চাঁদের যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়, দিনেদিনে কলায় কলায় বাড়ে কমে, পৃথিবীরও ঠিক তেমনি। এমনি করে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, কিন্তু কই ? শনিগ্রহ ত একটুও কাছে আসছে বলে মনে হয় না। শুনেছিলাম সে এক প্রকাণ্ড গ্রহ, তার চারিদিকে আংটি ঘেরা। কিন্তু তোমার ত বিশ বছর বয়স হল, গোঁফদাড়ি বেরিয়ে গেল, এখনও ত সে সবের কিছুই দেখা গেল না! ঐ লাল রঙের মঙ্গলগ্রহটা যেন একটুখানি কাছে এসেছে, কিন্তু সেও ত খুব বেশি নয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতটি বলছেন, মঙ্গল পর্যন্ত পেঁাছতে আরও চল্লিশ বৎসর লাগবে। ও হরি! তাহলে শনিতে পেঁাছব কবে ? শনি পর্যন্ত যেতে লাগবে প্রায় আটশ বৎসর! তাহলে উপায় ? একমাত্র উপায়, আরও বেগে যাওয়া। আরও পাঁচ গুণ দশ গুণ বিশ গুণ বেগে কামানের গোলার মতো বেগে ঘণ্টায় দু হাজার মাইল বেগে ছুটতে হবে। তাই ছোটা যাক্।

আরও দুই বৎসরে মঙ্গল পর্যন্ত এসে পড়া গেল। ওখানে গিয়ে একবার নামলে মন্দ হত না। ঐ লম্বা লম্বা আঁচড়গুলো সত্যিকারের খাল কিনা, ওখানে সত্যি সত্যি বুদ্ধিমান জীব কেউ আছে কিনা, একটিবার খবর নেওয়া যেত। কিন্তু আমাদের ত অত অবসর নেই, যেমনভাবে চলছি এমনি করে চললেও শনিতে পেঁাছতে আরও অন্তত চল্লিশ বৎসর লাগবে। সুতরাং সোজা চলতে থাকি!

মঙ্গলের পথ পার হয়ে এখন বৃহস্পতির দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে ছোট বড় গোলার মতো ওগুলো কি সামনে দিয়ে হুস্ করে ছুটে পালাচ্ছে ? কোনটা দশ মাইল, বিশ মাইল, কোনটা একশ মাইল বা দুশ মাইল

চওড়া—আবার কোনটা ছোটখাট ঢিপির মতো বড়, কোন কোনটা সামান্য গুলি-গোলার মতো। এরা সবাই গ্রহ। যে নিয়মে বড় বড় গ্রহরা সূর্যের চারিদিকে চক্র দিয়ে ঘোরে—এরাও প্রত্যেকেই, এমনকি যেগুলি ধূলিকণার মতো ছোট সেগুলিও, ঠিক সেই নিয়মেই নিজের নিজের পথে নিজের নিজের তাল বজায় রেখে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করে ছুটতে ছুটতে আরও দশ বৎসর কেটে গেল, ছোট ছোট গ্রহগুলি আর যেন দেখাই যায় না। পৃথিবী সূর্যের আশেপাশে মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। সূর্যও দেখতে অনেকখানি ছোট্ট হয়ে গেছে—সেই পৃথিবীর সূর্য আর এ সূর্য যেন ফুটবলটার কাছে একটি ক্রিকেট বল। ক্রমে আরও আট দশ বছর ছুটে, গ্রহরাজ বৃহস্পতির চক্র পথের সীমানায় এসে হাজির হওয়া গেল। কোথায় পৃথিবী আর কোথায় বৃহস্পতি! ৩৬৫ দিনে পৃথিবীর এক বৎসর—কিন্তু বৃহস্পতি যে প্রকাণ্ড পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই পথে একবার পাড়ি দিতে তার প্রায় বারো বৎসর সময় লাগে। ধোঁয়ায় ঢাকা প্রকাণ্ড শরীর—তার মধ্যে হাজারখানেক পৃথিবীকে অনায়াসেই পুরে রাখা যায়। অথচ এই বিপুল দেহ নিয়েই গ্রহরাজকে লাটিমের মতো ঘোরপাক খেতে হচ্ছে। এ কাজটি করতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু বৃহস্পতির দশ ঘণ্টাও লাগে না। বৃহস্পতির চারিদিকে সাত-আটটি চাঁদ—তার মধ্যে চারটি বেশ বড় বড়—তিনটি আমাদের চাঁদের চাইতেও বড়।

বৃহস্পতির এলাকা পার হয়েছি। শনির আলো ক্রমে আরও উজ্জ্বল হয়ে আসছে—ক্রমে বোঝা যাচ্ছে যে, তার চেহারাটা ঠিক অন্য গ্রহের মতো নয়। মনে হয় কেমন যেন লম্বাটে মতন—দুপাশে যেন কি বেরিয়ে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখ তার গায়ের চমৎকার আংটিটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। পৃথিবী থেকে ছোটখাট দূরবীণ দিয়ে যেমন দেখেছি এখন শুধু চোখেই সেইরকম দেখতে পাচ্ছি। আংটিটা বাসনের কানার মতো, উকিলের শাম্‌লার ঘেরের মতো—খুব পাতলা আর চওড়া। শনিগ্রহকে আমরা যে দেখি, সব সময়ে ঠিক একরকম দেখি না—কখন একটু উঁচু থেকে, কখন একটু নিচু থেকে, কখন আংটির উপর দিকটা, কখন তার তলাটা, কখন সামনে ঝোঁকা, কখন পিছন-হেলান। যখন ঠিক খাড়াভাবে আংটির কিনারা থেকে দেখি, তখন

আংটিটাকে দেখি সরু একটি রেখার মতো—এত সরু যে খুব বড় দূরবীণ না হলে দেখাই যায় না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হল আমরা পৃথিবী ছেড়েছি—এখন আর আট-দশ বৎসর গেলে আমরা শনিতে পৌঁছব। ততদিনে তোমার চুল দাড়ি গোঁফ সব পেকে যাবে—তুমি যাট বছরের বুড়ো হয়ে যাবে। শনিকে অনেকখানি ডাইনে রেখে আমরা ছুটে চলেছি। শনিও ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে ঐ বাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে, আর কয়েক বৎসর পরে সে ঠিক আমাদের সামনে এসে হাজির হবে। সেও কিনা সূর্যের প্রজা, কাজেই সূর্যের চারিদিকে তাকেও প্রদক্ষিণ করতে হয়। কিন্তু আমাদের উনত্রিশটা বছরেও তার একটা পাক পুরো হয় না।

যাক্—এতদিনে পথের শেষ হয়েছে; আমরা শনিগ্রহের উপরে এসে পৌঁছেছি। 'আংটি'টার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, আকাশের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যেন আলোর খিলান গেঁথে দিয়েছে। খিলানের মধ্যে খিলান তার মধ্যে ঝাপসা আলোর আরেকটি খিলান। তার উপর আবার শনিগ্রহের ছায়া পড়েছে। সূর্যের এই প্রকাণ্ড রাজত্বের মধ্যে যতদূর যাও, এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখবে না—আমাদের পৃথিবীর দূরবীণের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যায়, এমন জিনিস আর দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া যায়নি।

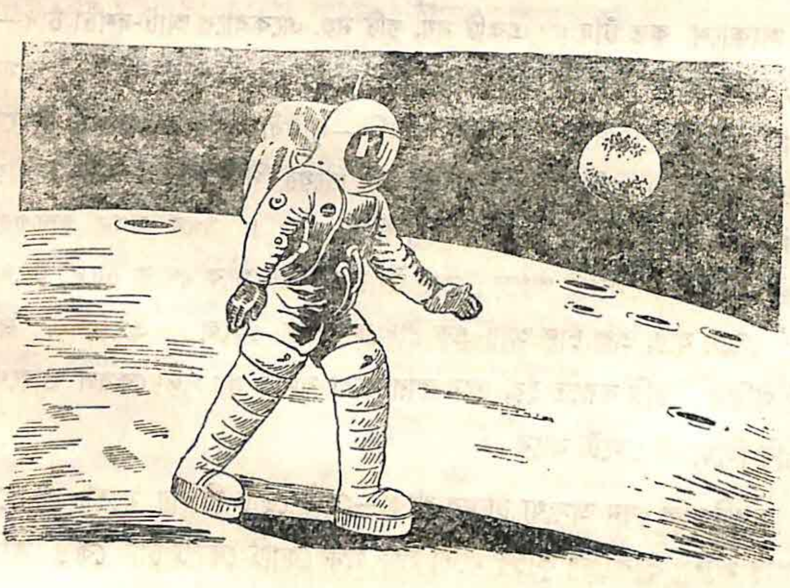
আকাশে কত চাঁদ! একটি নয়, দুটি নয়, একেবারে আট-দশটা চাঁদ—ছোট বড় মাঝারি নানারকমের। সওয়া দশ ঘণ্টায় এখানকার দিন রাত—ঘুমের পক্ষে ভারি অসুবিধা। দিনটিও তেমনি—পৃথিবীর রোদ এখানকার চাইতে একশ গুণ কড়া। পৃথিবী থেকে সূর্যকে যদি চায়ের পিরিচের মতো বড় দেখায়, তবে এখান থেকে তাকে দেখায় আধুলিটার মতো। যখন তখন চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ ত লেগেই আছে; তার উপর আবার থেকে থেকে চাঁদে চাঁদেও গ্রহণ লেগে যায়, এক চাঁদ আর-এক চাঁদকে ঢেকে ফেলে। এখানকার জন্য যদি পঞ্জিকা তৈরি করতে হয়, তবে তার মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কেবল গ্রহণের হিসাব লিখতেই কেটে যাবে।

আংটিগুলি যেন অসংখ্য চাঁদের ঝাঁক—ছোট ছোট ঢিপির মতো, পাথরের ভেলার মতো, কাঁকড়ের কুচির মতো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চাঁদ কেউ কারও

গায়ে ঠেকে না, আশ্চর্য নিয়মে প্রত্যেকে নিজের পথে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। আর সমস্তে মিলে আশ্চর্য সুন্দর আংটির মতো চেহারা হয়েছে।

এখন অসুবিধার কথাটাও একটু ভাবা উচিত। গরম বাতাস আর ধোঁয়ার ঝড় ত এখানে আছেই—তার উপর সব চাইতে অসুবিধা এখানে দাঁড়াবার মতো ডাঙা পাবার যো নাই—ডাঙা খুঁজতে গেলে অনেক হাজার মাইল গভীর গরম ধোঁয়াটে মেঘের সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিতে হবে। সেই মেঘের মধ্যে জীবজন্তু কেউ বাঁচতে পারে কিনা খুবই সন্দেহ। সুতরাং এখন কি করার উপায় দেখতে হবে।

এসেছিলাম কামানের গোলার মতন বেগে—কিন্তু তার চাইতে তাড়াতাড়ি চলা যায় কি? আলো চলে সব চাইতে তাড়াতাড়ি—প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল। তাহলে সেইরকম বেগে আলোর সওয়ার হয়ে ছোটা যাক্। পৃথিবীতে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে? এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট।





যোগ্যতা পরীক্ষা

ড: মেঘনাদ সাহা

কোনও দেশে অতি বিচক্ষণ ও সর্বকার্যে দক্ষ একজন রাজা ছিলেন। অন্যান্য রাজাদের মত তিনি অসার আমোদ-প্রমোদে বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। তাঁহার মন্ত্রীও তাহারই মত অতি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। সুবিধা পাইলেই রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত কাজ নিজেদের চক্ষে পর্যবেক্ষণ করিতেন। মাঝে মাঝে গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া প্রজারা তাঁহার শাসন সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করে তাহার খোঁজ-খবর লইতেন।

অন্যান্য রাজাদের যেমন হইয়া থাকে, এই রাজারও নানাশ্রেণীর ভৃত্য ছিল এবং তাহারা নিজ নিজ কাজের অনুযায়ী নানারূপ বেতন পাইত। প্রধানমন্ত্রী সকলের চেয়ে বেশী বেতন পাইতেন। সাধারণ কর্মচারীরা ৫০ হইতে ১০০ টাকা পর্যন্ত পাইত এবং সাধারণ ভৃত্যেরা—যাহারা ঘর পরিষ্কার, বাসন মাজা, জল তোলা এবং ফরমাইস খাটা ইত্যাদি কাজ করিত, তাহারা দশ হইতে বিশ টাকা পর্যন্ত মাসে বেতন পাইত।

একদিন রাজা মন্ত্রীর সহিত ছদ্মবেশে চাকরদের ঘরের নিকট দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, তাহারা খুব জটলা করিয়া রাজার কাজের আলোচনা করিতেছে। একজন বলিতেছে—দেখ ভাইসকল, মহারাজের কি ঘোর অবিচার! আমাদিগকে সমস্তদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া

খাটিতে হয়, আর মহারাজা আমাদিগকে বেতন দেন মাত্র দশ হইতে পনের। আর কেরানীবাবুরা শুধু চেয়ারে বসিয়া কলম চালান, তাঁহারা আমাদের পাঁচ ছয় গুণ বেতন পান, আর বড় বড় কর্মচারীরা ত কিছুই করেন না। মন্ত্রী মহাশয় শুধু মহারাজের সাথে গল্প করেন এবং হুকুম জারী করেন ; আর তিনি যে কত হাজার টাকা বেতন পান, তাহা কেহ গণিয়া বলিতে পারে না। রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই এই সমস্ত কথা শুনিলেন। কিন্তু তখন চাকরদের কিছু না বলিয়া পর দিন দরবারে তাহাদের কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সকলে আসিলে পর মন্ত্রী বলিলেন—তোমরা কাল রাত্রে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিতেছিলে যে, তোমরা সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম কর ও মহারাজ তোমাদের তেমন বেতন দেন না। সেইজন্য মহারাজ তোমাদের দুঃখ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই হেতু তোমাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি একটি সমস্যা উত্থাপন করিয়া তোমাদের প্রত্যেককে তাহা সমাধান করিতে দিয়াছেন। তাহা এই—রাজবাটীর সম্মুখে অতিশয় পুরাতন এবং উচ্চ তালগাছটি কত উঁচু তাহা বাহির করিতে হইবে। ইহার জন্য তোমাদিগকে তিন দিন সময় দেওয়া হইল।

ইহা শুনিয়া চাকরদের মধ্যে মহা ভয় উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, কি করিয়া তালগাছের উচ্চতা মাপা যাইতে পারে। একজন বলিল—একটি খুব বড় মই তৈয়ারী করিয়া গাছের মাথায় চড়ি। তারপর সেখান হইতে সূতা ফেলিয়া তালগাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করিতে পারিব। কিন্তু রাজবাটীর সূত্রধর বলিল যে, অতবড় মই তৈয়ারী করা সম্ভবপর নয়। তখন অন্য একজন ভৃত্য বলিল—আচ্ছা, এস আমরা ঐ তালগাছের সমান উঁচু একটি মাটির দেওয়াল তৈয়ারী করি। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, এইরকম দেওয়াল প্রস্তুত করিতে অনেক বৎসর লাগিবে এবং অনেক হাজার টাকা লাগিবে। আর একজন বলিল—আমাদের মধ্যে কেহ কোমরে সূতা বাঁধিয়া তালগাছের উপরে উঠুক এবং সূতা কত লম্বা, তাহা মাপিয়া দেখিলেই তালগাছের উচ্চতা বাহির করা যাইবে। কিন্তু এমন উঁচু তালগাছে চড়িতে পারে এমন লোক পাওয়া গেল না। সুতরাং তালগাছ না কাটিয়া কিরূপে তাহার উচ্চতা বাহির করিতে পারা যাইবে, চাকরেরা তাহা

কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না। তখন তাহারা রাজদণ্ডের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তিনদিন কাটিয়া গেলে মহারাজ তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভয়ে ভয়ে তাহারা দরবারে উপস্থিত হইল। তখন প্রধানমন্ত্রী বলিলেন—তোমরা কি তালগাছের উচ্চতা নিরূপণ করিতে পারিলে? চাকরেরা ভয়ে ভয়ে বলিল, না মহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও তালগাছের উচ্চতা বাহির করিতে পারিলাম না। তখন মন্ত্রী মহাশয় একজন সাধারণ কর্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি এই তালগাছটি কত উঁচু না কাটিয়া তাহা বলিয়া দিতে পার? সে খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—এই কাজ দুই রকমে হইতে পারে। যদি একজন খুব ভাল তীরন্দাজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ তালগাছের মাথা লক্ষ্য করিয়া একটি তীর ছুঁড়িতে হইবে। তীরের নীচের দিকে একটি শক্ত সূতা বাঁধা থাকিবে। তীরন্দাজ যদি ঠিক গাছের মাথায় তীর বিদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে সূতা লম্বভাবে মাটি পর্যন্ত পৌঁছিবে, এবং তখন ঐ সূতা মাপিলেই গাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করা যাইবে। কিন্তু সকলে বলিল, তালগাছের মাথায় তীর বিদ্ধ করিতে পারে, এমন সুদক্ষ তীরন্দাজ পাওয়া মুস্কিল। তখন কর্মচারী বলিল—যদি শক্ত সূতা দিয়া একটি ঘুড়ি উড়ান যায়, এবং চেষ্টা করিয়া উক্ত ঘুড়িকে গাছের মাথায় আটকান যায়, তাহা হইলে সূতার দৈর্ঘ্য হইতে তালগাছের উচ্চতা বাহির করা যাইতে পারে। মন্ত্রী বলিলেন, তুমি ঘুড়ি গাছের মাথায় আটকাইতে পার? কর্মচারী বলিল, না হুজুর, কিন্তু যাহারা খুব ভাল ঘুড়ি উড়ায়, বোধ হয় তাহারা পারিবে। মন্ত্রী বলিলেন, আচ্ছা দেখা যাউক, ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আছে কিনা। তিনি তখন একজন বড় বিশিষ্ট কর্মচারীকে ডাকিলেন, এবং বলিলেন, আপনি কোন সহজ উপায়ে এই তালগাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করিতে পারেন কি? কর্মচারী বলিলেন, নিশ্চয়ই পারি, আমি অল্প সময়ের মধ্যেই গাছ কত উঁচু, তাহা মাপিয়া দিতেছি। তিনি তখন বাহিরে যাইয়া একটি প্রায় আট হাত লম্বা কাঠি সোজাভাবে (লম্বভাবে) মাটিতে পুঁতিলেন এবং একটি মাপকাঠি লইয়া কাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিলেন। দেখা গেল, ছায়ার দৈর্ঘ্য ছয় হাত এবং তখনই তালগাছের গোড়া হইতে সূতা ধরিয়া উহার ছায়া কত বড়, তাহা

মাপিলেন। উহা দৈর্ঘ্যে হইল ১২০ হাত। তখন তিনি হিসাব করিলেন, ছয় হাত ছায়া যার, তার দৈর্ঘ্য যদি হয় আট হাত, তবে ১২০ হাত ছায়া যার তার দৈর্ঘ্য কত হইবে? —৬ : ৮ :: ১২০ : ক, $\therefore$ ক $= \frac{১২০ \times ৮}{৬} =$ ১৬০ হাত। এই সমস্ত করিতে প্রায় পনের মিনিট সময় লাগিল। তখন তিনি আসিয়া বলিলেন, গাছের উচ্চতা ১৬০ হাত এবং যে প্রণালীতে উহা বাহির করিয়াছেন তাহাও সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। রাজা ও মন্ত্রী ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইল।

তখন রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্ত্রী, আপনি ইহা অপেক্ষা সহজে তালগাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করিয়া দিতে পারেন কি? মন্ত্রী বলিলেন, Sextant (কোণ-মান) যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষণিকের মধ্যেই গাছের বা যে কোন জিনিসের উচ্চতা বাহির করা যাইতে পারে। আমি এই যন্ত্রের কথা অবগত আছি, কিন্তু ব্যবহারে অভ্যস্ত নই, আপনার জরীপ বিভাগের কর্মচারীরা অতি সহজেই এই কার্য করিতে পারে।

রাজা তখন জরীপ বিভাগের প্রধান কর্মচারীকে ডাকাইলেন, এবং তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই Sextant দিয়া গাছের উচ্চতা ঠিক মাপিয়া বাহির করিলেন।

সেইদিন হইতে রাজবাড়ির ভৃত্যদের মধ্যে আর কাহারও কোন অসন্তোষের ভাব রহিল না।***

[***Sextant যন্ত্রের বর্ণনা যে কোন প্রাকৃতিক দর্শনের পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু Sextant সাধারণতঃ স্থলে ব্যবহার হয় না, সমুদ্রে সূর্য বা তাহার উচ্চতা মাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্থলে যে যন্ত্র ব্যবহার হয় তাহার নাম Theodolite***]



জল-সন্ধানী যাদুকর

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

মাঝে মাঝে শোনা যায় অনেক পয়সা খরচ করে কূপ খনন করা হলো, বহুদূর পর্যন্ত মাটির নীচে নেমেও কপালের দোষে জলের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। তাই আগের কালের মানুষ নদীর ধারে বসতি করতে যেত—আজও সে পুষ্করিণী খুঁড়ে বর্ষার জল ধরে রাখে শুক্‌নো ডাঙ্গায়। এখন অবশ্য মাটির ভেতরে বহুদূর নল চালিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। পয়সা খরচ করতে পারলে হাজার ফুটের তলা থেকেও বৈদ্যুতিক পাম্প চালিয়ে জল তোলা যায়। কলকাতার মধ্যেই সে রকম দু'তিনটি গভীর নলকূপের খবর পাই।

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা আজ মনে হচ্ছে। আমার ইন্‌জিনিয়র বন্ধু গল্প করছিলেন—তাঁর উপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভার পড়েছিল অন্তরীণ যুবকদের জন্য হিজলীতে জেল গড়ে তোলার। ঘরবাড়ি তৈরী হলো, জেলের বিরাট পাঁচিল উঠলো, কিন্তু সরকারের সামনে উঠলো এক নতুন সমস্যা। বহু পয়সা খরচ করেও মাটি খুঁড়ে সেখানে প্রথমবার জল পাওয়া গেল না। সেখানে তাই হয়ত মানুষে বসত করেনি—বিশাল ভূভাগ জঙ্গল হয়েই ছিল। সরকার হয়ত সেই জন্যই ওখানেই জেল বসাতে চাচ্ছিলেন। স্বদেশী ছেলেরা যেন গ্রামের লোকের সংস্পর্শে না আসতে পায়—দেশপ্রেমের বিষ যেন চারিদিকে না ছড়ায়। হিজলী গ্রাম হয়ত সেই জন্যই নির্বাচিত হয়েছে।

কাগজে পড়া যেত, এক শ্রেণীর যাতুকর নাকি আছে যারা কোথায় খুঁড়লে জল মিলবে ঠিক আন্দাজ করতে পারে। কেউ কেউ বলতো ওসব বুজরুকী—তবে সেই সময় কলকাতার বিলাতী এক কোম্পানী প্রচার করতো মোটা ফী পেলে তারা জল খুঁজে দেবার দায়িত্ব নিতে পারে। শেষ অবধি তাদেরই স্মরণ নিতে হলো। কোম্পানীর লোক জল খুঁজতে এল, দেখা গেল কর্মপদ্ধতি নতুন ধরণের, কিন্তু কোন দামী যন্ত্রের বালাই নেই। কোন এক তাজা গাছের ডাল যেখানে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে সেই y-অনুকরণের একটি অংশ গাছ থেকে কেটে নিয়ে দুই হাতের তালুর মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঈষৎ চেপে সে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল—অবশেষে এক জায়গায় দেখা গেল বার বার যাতুদণ্ডের সোজা অংশ ক্রমাগত একই স্থানে এলে ঝুঁকে পড়ছে। লোকটি বল্লে এইখানে কূপ খুঁড়লে নিশ্চয়ই জল মিলবে। সেবার ঘটলোও তাই। জেলখানার জলের বন্দোবস্ত সন্তোষজনকভাবেই হয়ে গেলো।

আমি নতুন যুগের নবীন বিজ্ঞানী, অলৌকিক শক্তির খবরে মন সাড়া দেয় না। যদিও বন্ধু আরও অনেক নজীর দিয়ে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে এমন অঘটন আজও ঘটছে—বিজ্ঞানীরা যা স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় পদার্থের সাধারণ গুণাবলীর আলোচনা আমাকেই করতে হতো। মহাকর্ষ বস্তুর সাধারণ গুণ। নিউটন কবে গাছ থেকে আপেল ফল পড়তে দেখেছিলেন সেই থেকেই পৃথিবীর চারিদিকে যে অদৃশ্য শক্তিক্ষেত্র রয়েছে—g¯ক্ষেত্র, কৌতূহলী বিজ্ঞানীরা তার মর্ম ও ধর্ম নানাভাবে পরীক্ষা করে চলেছেন। হাঙ্গারীর বিজ্ঞানী ব্যারণ ইয়োটভস্ (Eotvos) g¯ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিকে তার আপেক্ষিক মাপের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করবার এক সূক্ষ্ম তুলাযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, তারই খবর দিতে হচ্ছিল ছাত্রদের। জটিল গণিতের তথ্য জুগিয়ে ছাত্রদের মন পাওয়া ভার। আবার তখন গান্ধীজির নন-কোঅপরেশনের ছেলেরা কলেজ পালাবার ও পরীক্ষা ফাঁকি দেবার সুন্দর অজুহাত খুঁজে পেয়েছে। কাজেই হঠাৎ প্রচুর অবসর মিললো। ভারী ভারী বিরাট প্রামাণ্য গ্রন্থের পাতা উলটিয়ে জানা গেল অনেক নতুন কথা। ইয়োটভসের মানদণ্ড ভূতত্ত্ববিদ্‌রা তাদের কাজে

লাগাতেন—মাটির অনেক নীচে তেলের নদী কোথায় বহমান, কোথায় বা ধাতুর আকর স্তরে স্তরে বিছান রয়েছে মাটির তলায়। ফলে g শক্তি ক্ষেত্রের যে অল্প বিকৃতি ঘটছে তা হয়ত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। অনুসন্ধানীর মানদণ্ডে তার হ্রাসবৃদ্ধির নিশানা পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে এই সূক্ষ্মযন্ত্রের সাহায্যে অনেক আকর বা পেট্রোলিয়ম উৎস আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীর নানা জায়গায়। অস্ট্রেলিয়ায় বা সাহারায় মরুপ্রান্তরে তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এর কল্যাণে—বলে জনশ্রুতি। মনে হলো আমাদের দেশেও এই দামী যন্ত্রটির কোথায়ও থাকার কথা। তবে হয়ত সেটি অতি যত্নে কাচের আলমারীতে রক্ষিত থেকে সঞ্চয়ী বিজ্ঞানীর ভাণ্ডার পূর্ণ করছে। তাকে নিয়ে বনজঙ্গল ঘুরবার অসম সাহস এদেশী বিজ্ঞানীর তখনও হয় নি। যান্ত্রিকদণ্ড মাটির নীচে বহতা জলের খবর দিতে পারে, তবে এই সূক্ষ্ম তুলামাপকের সঙ্গে y-যাদুদণ্ডের তো কোন সাদৃশ্যই নেই। তাই y-যাদুদণ্ডে সহজেই মানুষ এত গভীর তলের খবর পায় এ বিশ্বাস করতে মন চাইল না। সমস্যা রয়েই গেল।

কয়েক বৎসর পরে শোন নদীর ধারে এক মনোরম স্থানে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে গেছি। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি, তখনই দিনে বেলার দুদণ্ড বাড়লে সূর্যের তেজ অসহ্য ঠেকছে। বিরাট আবাদের মধ্যে সামনে একটা বাংলো প্যাটার্ণ বাড়ি। মালিকবন্ধু ইংরাজ। এক সময় ঘাটওয়াল রাজার কর্মচারী হয়ে এদেশে এসেছিলেন। পরে রাজার অনুগ্রহে বহুশত বিঘা জমি নিয়ে চাষ শুরু করেছেন—আধুনিক প্রথায় তারই ছেলে ও বন্ধুরা ট্রাক্টার চালিয়ে জমি চাষ করছে। আমি যখন হাজির হলাম কোন বিশেষ কারণে সকাল থেকেই সেদিন অতিথি আপ্যায়নের আয়োজন হয়েছিল। সকালেই বাড়ীর বারান্দায় বহু লোক। তাঁরা একটা তামার তার বেকিয়ে y-দণ্ড করেছেন ও প্রত্যেকে তাই নিয়ে পরীক্ষা করছেন জলের সন্ধান মেলে কিনা। কৌতুকের কারণ হলো এই বারান্দার উপর বিশেষ কোন এক পথে চললে কারোর কারোর হাতে y-দণ্ডটি ঝুঁকে পড়েছে, তবে সকলের হাতে সাড়া পাওয়া যায় না। আমি নিজের হাতে পরীক্ষা করে দেখলাম কিছুই হলো না। তখন ক্ষেতের সেচের জন্য জলের খুবই দরকার। তবে বাড়ির ভিত্তি ভেদ করে ওই ইঙ্গিতের

যথার্থ্য তো যাচাই করা চলে না। কাজেই ব্যাপারটি অমীমাংসিত রয়ে গেল সেদিন।

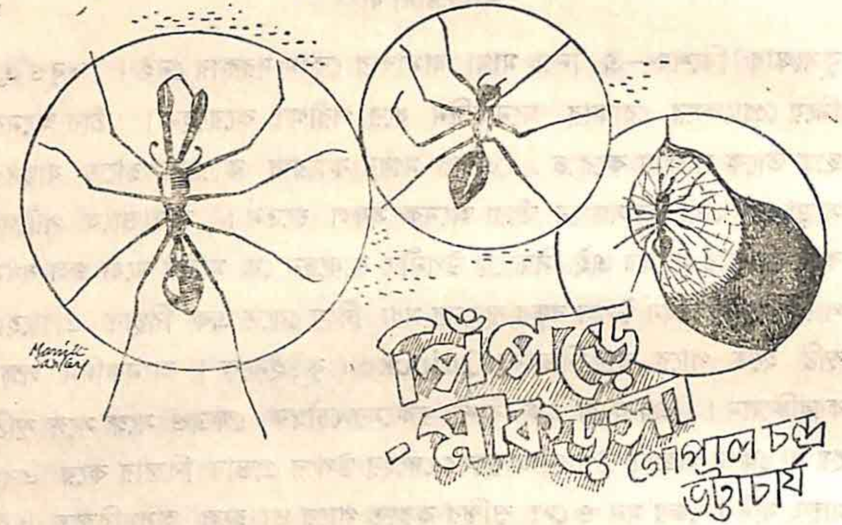
পরের খবর স্বাধীন ভারতের দিল্লী শহরের। তখন রাজ্যসভার সভ্য, গিয়ে শুনি রাজপুতানায় এক পানিওয়ালা মহারাজের আবির্ভাব হয়েছে। নানাস্থানে উৎসের সন্ধান দিয়ে তিনি দেশের লোককে উপকৃত ও চমৎকৃত করেছেন। সরকার তাঁকে কোনভাবে বিপুল কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন কিনা তারই আলোচনা উঠেছিল সেবারে সে সভায়।

অতি প্রাচীনকালে রাজপুতানার পশ্চিম ভূভাগের মধ্য দিয়ে এক খর-স্রোতা নদী প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে মিশতো। দুই তীর আশ্রয় করে বহুলোকের বসতি ছিল সে সময় সে অঞ্চলে। তখন নগরকেন্দ্রিক যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার ধ্বংসাবশেষ উৎখননের ফলে মধ্যে মধ্যে আজও প্রকাশ পাচ্ছে। অভিজ্ঞরা মনে করেন বৈদিক যুগের আগে—আর্যরা এদেশে আসার বহুপূর্ব থেকে যে সভ্য জাতি এখানে বাস করতো, তারা প্রাচীন মহেন্‌জদারো ও হরপ্পার অধিবাসীদের নিকট জ্ঞাতি। চার হাজার বছরে এদেশের জলবায়ুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মরু প্রান্তর অল্পে অল্পে এগিয়ে উর্বর ভূমিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে। নদী নিশ্চিহ্ন হয়ে বালুর মধ্যে লুকিয়েছে। কেউ কেউ বললেন পানিওয়ালা মহারাজের কৃপায় হারানো নদীখাতের পুনরুদ্ধার সম্ভব এবং তাহলে এই প্রদেশে ফিরে আসবে অধুনালুপ্ত পুরানো শ্রীবৃদ্ধি। শেষ অবধি সে আশা ফলবতী হলো না। মাটির মধ্যে জলের সন্ধান পেলেও তাকে সুমিষ্ট জলের উৎসের খোঁজ বলে পরিগণিত হতো না। প্রচুর লবণ জাতীয় বস্তু দ্রবীভূত হয়ে জল বিস্বাদ করে রেখেছে—সে জল চাষ-আবাদের অযোগ্য। কাজেই দিল্লীতে এক সময় পানি-মহারাজের নাম দিকে দিকে বিঘোষিত হলেও আজ তাঁর কথা লোকে ভুলেছে।

১৯৬২ সালে একটি ছোট বই হাতে এলো। লিখেছেন বন্ধু প্রোফেসর রোকার (Rocard)। দেখলাম এ বিষয় অনেক খবর আছে যা আমার অজানা ছিল। মধ্যযুগ বা তার অনেক আগে থেকেই যাদুকর দণ্ডের সাহায্যে জল বা যখের ধনের খোঁজাখুঁজি চলতো। এখন অনেক সময় বিপথে চালিত হচ্ছে এই নিপুণতা। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষ অনেক সময় ভাবে এটি

কুসংস্কার বিশেষ—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। তবুও এই নিয়ে প্রোফেসর রোকার অনেকদিন ধরে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর অনেক ছাত্র তাঁকে সাহায্য করেছে। এদের মধ্যে কারোর কারোর হাতে যাদুদণ্ড সাড়া দেয় এবং জলসন্ধানে তাঁরা অনেক সফল হতেন। নানাভাবে পরীক্ষা করে রোকার সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মাটির মধ্যে জল যখন পরিশ্রুত হয় তখন উপল বন্ধুর স্থানের মধ্য দিয়ে যেতে এক বিদ্যুত প্রবাহের সৃষ্টি হতে পারে যা বিজ্ঞানী Quincke (কুউইনকে) অনেকদিন লক্ষ্য করেছিলেন। এর ফলে এক বিশেষ রকমের চৌম্বক ক্ষেত্রও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় যা কোন অজ্ঞাত উপায়ে মানুষের দেহের উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং মানুষ যদি নিজের মন ও দেহ সুস্থির করতে পারে তা হলে অসমবিস্তৃত এই চৌম্বক ক্ষেত্র গতিশীল মানুষকে এমন অবস্থায় আনতে পারে যার বহির্নির্দেশ হল এই যাদুদণ্ডের বিনমন। বিশেষভাবে নিজের মাংসপেশীকে স্তম্ভিত করতে শিখলে দেখা যায় প্রায় শতকরা পঞ্চাশের কাছাকাছি লোক এভাবে সাড়া দিতে পারেন। প্রোফেসর রোকার যন্ত্র তৈরী করে মৃদু চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি নিরূপণ করেছেন যার থেকে শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে ন্যূনতম কি পরিমাণ শক্তিমাত্রার প্রয়োজন তার একটা মাপ করার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র কোন অজ্ঞাত উপায়ে মানুষের শরীরের উপর প্রভাব চালায় যার ফলে এই যাদুকরী বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

শহরের ছেলেমেয়েরা তো বনে-জঙ্গলে y-দণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান করতে পারবে না—তবে তাদের শরীরে এইভাবের কোন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সুপ্ত আছে কিনা দেখতে, প্রোফেসর একটি পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন যে সব শহরেই সহজেই হবে। তিনি দেখেছেন যে, বিশেষ ধরণের মোটর গাড়ির যন্ত্র থেকে যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র বিকীর্ণ হয় তা অল্প দূর থেকে যাদুদণ্ডের সাহায্যে মানুষে অনুভব করতে পারে। এর জন্য দণ্ডটি ধরবার বিশেষ কায়দা আছে সেটি কয়েকবার চেষ্টা করে সকলেই আয়ত্ত করতে পারে।



পিঁপড়ে-মাকড়সা

গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য

বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা ঝোপের মধ্যে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করছিলাম। আশে পাশে বেশ ফাঁকা জায়গা। ফাঁকা জায়গাটার একপাশে ডেঁয়ো-পিপঁড়ের গর্ত্ত। কালো রঙের ডেঁয়ো-পিপঁড়েগুলো আমার আশে পাশে আনাগোনা করছে। বিশেষ পরিচিত জীব—পরিচিত তাদের কাজ-করবার। তবুও বসে বসে খানিকক্ষণ তাদের আনাগোনা লক্ষ্য করছিলাম। হঠাৎ আমার সামনে, প্রায় হাত দেড়েক দূরে, ঝোপটার একটা পাতার উপর কোথা থেকে যেন একটা ডেঁয়ো-পিপঁড়ে বেরিয়ে এলো। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পিপঁড়েটা পাতার উপর উঠেই হঠাৎ আমায় দেখে যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। একটুও নড়ন-চড়ন নেই। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। পিপঁড়েটার রকম-সকম দেখে অবাক হয়ে গেছি। কখনওতো কোন পিঁপড়ের এইরূপ অদ্ভুত ভঙ্গী দেখিনি। পিপঁড়েটাকে ধরবার চেষ্টা করতেই বিদ্যুৎগতিতে সে যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তার কোন হদিশই মিললো না। মনে একটা অস্বস্তি নিয়ে ফিরে এলাম।

এই ঘটনার অনেক কাল পরে, দুপুর বেলা একদিন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনস্‌-এর মধ্যে মাঝারি গোছের একটা গাছের উপর লাল পিঁপড়েদের (নালসো-পিঁপড়ে) বাসা বাঁধবার কৌশল লক্ষ্য করছি। হঠাৎ নজরে পড়লো, একটা পাতার উপর একটা নালসো-পিঁপড়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঘোরাফেরা করছে। চলা-ফেরার ভঙ্গীটা মোটেই পিঁপড়ের মত নয়। ভাল করে'

দেখবার জন্যে আর একটু এগিয়ে গেলাম। একটু নড়াচড়া দেখেই পিঁপড়েটা বিদ্যুৎগতিতে আমার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল। কোন জাতের পিঁপড়েই এরূপ করে না। মনে পড়ল—আগের দেখা সেই কালো পিঁপড়েটার কথা; সেটারও ভাবভঙ্গী ঠিক এধরণেরই ছিল। সেটা ছিল কালো ডেয়ো-পিঁপড়ের মত, আর একটা লাল নালসো-পিঁপড়ের মত দেখতে। স্থির করলাম, যেমন করেই হোক, পিঁপড়েটাকে ধরে রহস্যটা জানতে হবে। কিন্তু ধরা সহজ নয়; কাছে যেতেই নিমেষের মধ্যে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল। তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও সন্ধান পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে ক্ষুণ্ণ মনে লাল-পিঁপড়েদের সমারোহই দেখতে লাগলাম। কিন্তু মন পড়ে আছে সেই অদ্ভুত প্রাণীটার উপর। মাঝে মাঝে সে জায়গাটার দিকে চেয়ে দেখছি—যদি দৈবাৎ সেটা আবার আত্মপ্রকাশ করে। ঘটলোও তাই। পাতার আড়ালে একটা সরু ডালের উপর প্রাণীটা হেঁটে বেড়াচ্ছে। প্রজাপতি-ধরা জালের লম্বা কাঠের বাঁটটার সাহায্যে দূর থেকে ভয় দেখিয়ে আস্তে-আস্তে সেটাকে গাছের গুঁড়িটার গায়ে একটা ফাঁকা জায়গায় তাড়া করে নিয়ে এলাম। এবার আর অদৃশ্য হয়ে যাবার উপায় নেই। সহজেই তখন তাকে পোকা-মাকড় ধরবার কাচের টিউবের সাহায্যে বন্দী করে ফেললাম। দেখতে লাল-পিঁপড়েদের মতই বটে; তবে আকৃতিগত কিছু কিছু খুঁটিনাটি পার্থক্য আছে। কিন্তু মুখের দিকটা পিঁপড়ের মত নয়। বিশেষ করে চোখের পার্থক্য সুপরিস্ফুট। মোটরের যেমন হেড-লাইট থাকে, কপালের উপর তেমনি দু'জোড়া গোলাকার চোখ যেন জ্বল্‌জ্বল্ করছিল। পরীক্ষাগারে নিয়ে এসে মাইক্রস্কোপের নীচে পরীক্ষা করতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা গেল। প্রাণীটা পিঁপড়ে নয় মোটেই—একটা মাকড়সা মাত্র; লাল-পিঁপড়েকে হুবহু অনুকরণ করেছে। চোখের সংখ্যা চারটে নয় আটটা। পা-ও আটখানা; কিন্তু সামনের দুখানা পা ঠিক পিঁপড়ের শুঁড়ের অনুকরণে উঁচু করে রাখে। শরীরের পশ্চাদ্ভাগে সূতা বোনবার যন্ত্র রয়েছে। পিঁপড়েদের মত মাথা ও বুক আলাদা নয়, একসঙ্গে জোড়া। প্রকৃতির রাজ্যে এরূপ নিখুঁৎ অনুকরণ কেমন করে সম্ভব হলো—সে এক মহাসমস্যার কথা। যাহোক, পিঁপড়ে-মাকড়সাটাকে সেদিনের মত টিউবে করে লেবরেটরীতে রেখে দিলাম। পরের

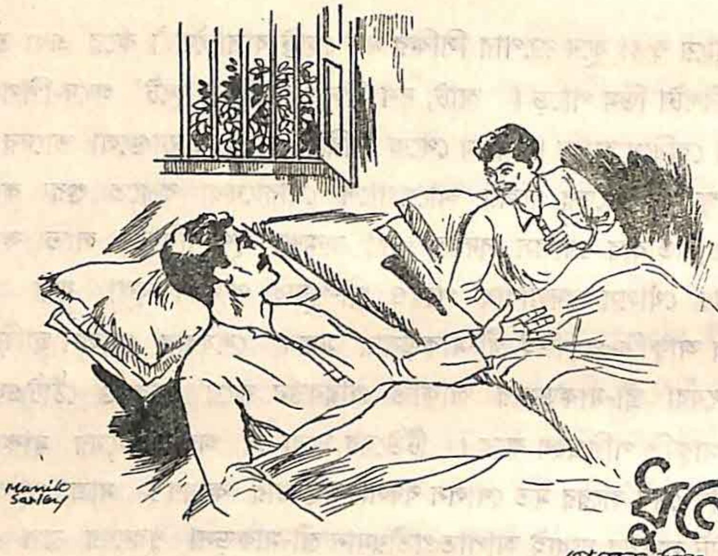
দিন গিয়ে দেখি—একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। টিউবের মধ্যে আগের দিনের সেই মাকড়সাটা নেই। রয়েছে, সম্পূর্ণ নতুন রকমের ভীষণদর্শন অদ্ভুত একটা প্রাণী। দেখলেই মনে হয় যেন দু'টো লাল-পিঁপড়ে লম্বালম্বিভাবে একত্র জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একটু লক্ষ্য করতেই দেখা গেল—দু'টো নয় একটা মাকড়সাই বটে; কিন্তু তার ঠোঁট দু'টো একজোড়া মুগুরের মত অসম্ভব রকমের বেড়ে গেছে। মুগুরের মাথা থেকে বাউলি-সাঁড়াশীর মত বাঁকানো লম্বা সূচের মত যন্ত্র বেরিয়েছে। এই সূক্ষ্ম যন্ত্র দু'টো মুগুরের নীচের দিকে খাঁজের মধ্যে ভাঁজ করা। মুগুরের ডগা থেকে শরীরের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রাণীটা লম্বায় আগেকার পিঁপড়ে-মাকড়সাটার প্রায় দ্বিগুণ হবে। কোথা থেকে, কেমন করে এটা টিউবের মধ্যে আস্‌লো আর আগের মাকড়সাটাই বা গেল কোথায় কিছুই স্থির করা সম্ভব হলো না। কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলো। রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করতেই হবে। মাকড়সাটা যেখানে ধরা পড়েছিল সেখানটায় জোর অনুসন্ধান চালাতে লাগলাম। সাধারণতঃ লাল-পিঁপড়েরা যেখানে আনাগোনা করে সেখানেই এদের আস্তানা। অনেক দিনের চেষ্টায় গুটিকয়েক লাল-পিঁপড়ে-মাকড়সা ধরে এনে বড় কাচের ঘরে স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে পুষতে আরম্ভ করলাম। প্রায় বছর তিনেক পোষবার ফলে এদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনেক রহস্যই জানা সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতের অনেক পিঁপড়ে-মাকড়সারই সন্ধান পেয়েছি।

আমাদের এই বাংলাদেশেই বিভিন্ন জাতের অসংখ্য রকমারি পিঁপড়ে-মাকড়সা দেখা যায়। একমাত্র কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকেই ষাট রকমেরও বেশী বিভিন্ন জাতের পিঁপড়ে-মাকড়সা সংগ্রহ করেছি। কোন কোন পিঁপড়েকে একাধিক বিভিন্ন জাতের মাকড়সা অনুকরণ করে থাকে। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, এদের বাচ্চাগুলো আবার বিভিন্ন রকমের ক্ষুদে পিঁপড়েকে অনুকরণ করে চলে। পিঁপড়ে-মাকড়সাদের স্ত্রী এবং পুরুষের আকৃতি বিভিন্ন; কিন্তু গায়ের রং একই রকম। পুরুষগুলোর মুগুরের মত প্রকাণ্ড দু'টো ঠোঁট বেরিয়ে থাকে। মুগুর দু'টোর ভিতরের দিকে করাতের দাঁতের মত অসংখ্য দাঁত সারবন্দিভাবে সাজানো। কুমীরের মত প্রকাণ্ড হাঁ করে যখন এরা লড়াই শুরু করে তখন খুবই ভয়ঙ্কর দেখায়। স্ত্রী-মাকড়সা

পাতার গায়ে সূতা বুনে রূপোর সিকির মত ছোট্ট বাসা তৈরী করে এবং তাতে পনেরো বিশটা ডিম পাড়ে। আট, দশ দিন পরে ডিম ফুটে' ক্ষুদে-পিঁপড়ের মত বাচ্চা বেরিয়ে আসে। ডিম থেকে বেরিয়ে এসেই বাচ্চাগুলো তাদের মত চেহারার ক্ষুদে-পিঁপড়ের দলের আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে। সর্ব্বসমেত ৫।৬ বার খোলস বদলে এরা ক্রমশঃ পূর্ণ-পরিণতি লাভ করে। পঞ্চম বার খোলস বদলাবার পরেও স্ত্রী-পুরুষ পার্থক্য বুঝা যায় না। সবাইকার আকৃতি-প্রকৃতিই স্ত্রী-মাকড়সার মত। শেষবার খোলস ছাড়িবার সময় পুরুষেরা স্ত্রী-মাকড়সার আকৃতি পরিবর্ত্তন করে' প্রকাণ্ড ঠোঁটওয়ালা পুরুষের আকৃতি পরিগ্রহণ করে। টিউবের মধ্যে যে অন্য রকমের মাকড়সা দেখেছিলাম শেষ বারের মত খোলস বদলানোই তার কারণ। মাত্র পনেরো বিশ মিনিট সময়ের মধ্যেই আপাতপ্রতীয়মান স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষের রূপ ধরে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

*** পিঁপড়ে-মাকড়সার ছবি দেওয়া হয়েছে। এথেকে প্রায় সব রকমের পিঁপড়ে-মাকড়সা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারবে। এ *** মাকড়সারাই লাল-পিঁপড়ে বা নালসোদের অনুকরণ করে থাকে। উভয়ের গায়ের রং-ই নালসোদের মত, কিন্তু প্রথম দিকে বর্ণিত মাকড়সার আকৃতি যেমন হুবহু নালসোদের মত, অপরটা কিন্তু ঠিক সেরকম নয়। তবু হঠাৎ দেখে নালসো-পিঁপড়ে বলেই ভুল হবে। এরা নালসো-পিঁপড়ে শিকার করে জীবিকানির্ব্বাহ করে। কিন্তু প্রথম দিকের গুলো শত্রুর চোখে ধূলো দেবার জন্যেই পিঁপড়েদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে' ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ শিকার করে' বেড়ায়।





ধুলো

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বার্মুডা না বাহামা ?

বেনেপুকুর বোধহয় !

সেই সেকালের বটতলা উপন্যাসের ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারত যে, কোন এক বর্ষণক্ষান্ত সন্ধ্যায় একটি জীর্ণপ্রায় বাড়ির দ্বিতলের একটি নাতিপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে কয়েকটি অপরিণত যুবক ও জনৈক অনির্দিষ্ট বয়সের কিঞ্চিৎ শীর্ণ ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত কথোপকথন হইতেছিল।

কিন্তু যত প্যাঁচ করেই বলি একথা কি কেউ সহজে বিশ্বাস করবে যে প্রথম উক্তিটি স্বয়ং ঘনাদার আর দ্বিতীয়টি আমাদের ?

ঘনাদা তাঁর মৌরসী আরাম কেদারায় বসে নিজে থেকে বার্মুডা কি বাহামা, কোথায় শিশিরের যোগানো সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে তাঁর গল্পের গুল ছাড়বেন ভাবছেন, আর আমরা বেতালা বিদ্রূপের খোঁচায় তাঁর মুখ বোজাতে চাইছি !

এও কি সম্ভব ?

অন্য দিন হ'লে ওই বেনেপুকুর নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গল্প শোনার আশা ভরসা তাইতেই ডুবত নিশ্চয়, কিন্তু আজ ঘনাদা যেন কানে তালা আর পিঠে কুলো বেঁধে বসেছেন।

ফ্লোরা কি ডোরার দেখা অবশ্য তখনো পাইনি।—বলে তুচ্ছ বেনেপুকুর মার্কা বিদ্রূপ গ্রাহ্যই না করে ঘনাদা স্মৃতির ভাঁড়ার ঘটা করে ঘাঁটতে বসে গেছেন আমাদের সামনে।

আর তা সত্ত্বেও পোশাকের ওপর ওয়াটারপ্রুফ চড়িয়ে মাথায় তার হুড-এর বোতাম লাগাতে লাগাতে গেলে কি কেলেঙ্কারী-ই হ'ত? বলে আমরা মুখ টিপে হাসছি!

এমন কখনো হতে পারে বলে ভাবা যায়?

অমৃতে কি অরুচি হয়?

হয়।

হয়, অসময়ে যদি অমৃতও কেউ মুখে ঢেলে দেয় জোর করে!

ধরো, দারুণ তেষ্টা পেয়েছে, ছাতি ফেটে যাচ্ছে তেষ্টায়, সে সময়ে এক ভাড় রাবড়ি কেউ মুখে ধরলে কেমন লাগে?

কিংবা খেলার মাঠে সকাল থেকে লাইন দিয়ে কোনো মতে ঢুকে পাক্কা ছুটি ঘণ্টা খোলা গ্যালারীতে ছাতা বিহনে রামভেজা ভিজে হঠাৎ বিপক্ষ দল মাঠে নামবে না বলে ঘোষণায় প্রাণটা পর্যন্ত জল হয়ে যাবার পর গেটের পয়সা ফেরত নিতে আর এক দফা ভিজে ন্যাতা হয়ে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ছুটে এসে এক কাপ গরম চায়ের জন্যে দোকানে যখন হামলে গিয়ে পড়তে যাচ্ছি, তখন যদি কেউ দরদ দেখিয়ে বাজে জায়গায় চা খাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচাতে এয়ার কণ্ডিশন্‌ড্ কোনো রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে আইসক্রীম সোডার দরাজ অর্ডার দেয় কি রকম মনে হয় তখন?

ঠিক এতটাই না হোক সেদিন যা হয়েছে তা প্রায় তাই।

খেলার মাঠের ওই রাগ আর হতাশায় ব্লেণ্ড করা মেজাজ নিয়ে ভিজে সপসপে হয়ে চৌরঙ্গীর ধারের এক দোকানে সবে চায়ে চুমুক দিতে যাচ্ছি এমন সময়ে দুই মূর্তিমানের সঙ্গে দেখা।

দুই মূর্তিমান আর কে? শিশির আর গৌর।

আমরা সারা দুপুর মাঠের মাঝখানে ভিজে আমসত্ত্ব হয়েছি আর ওঁরা দুজনে দিব্যি মেসে বসে জানলা থেকে বর্ষার শোভা দেখে, আর সেই সঙ্গে রামভুজকে দিয়ে কোন না দুটো অন্ততঃ পাপড় ভাজিয়ে তাই দাঁতে কাটতে

কাটতে অর্ধেক বিকেলটা পার করে বৃষ্টি ধরে যাবার পর সেজে গুজে এসপ্ল্যানেডে একটু টহল দিতে এসেছেন!

যে খেলা দেখার জন্যে আমাদের এই হয়রানি তার ওপর ত' ওঁদের তুজনের কারুরই কোনো টান নেই। খেলা বলতে ওঁরা বোঝেন শুধু ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান। আর সব ওঁদের কাছে বেলেখেলা।

ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের জন্যে জান দিতে যাঁরা প্রস্তুত, অন্য খেলার দিন তাঁরা মাঠের ধার মাড়ান না।

তুই মূর্তিমানের ওই সাজাগোজা ফিটফাট হাওয়া-খেতে-বার-হওয়া চেহারা দেখেই ত' মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে, তার ওপর ওদের বদান্যতায় আরো।

আরে! এখানে চা খাচ্ছিস কি! পেটের ভেতরটা ট্যান হয়ে যাবে। চল চল,—বলে যে সব জায়গার ওরা নাম করেছে সেগুলি কলকাতার সব সেরা রেস্তোরাঁ হলেও পেটের ট্যানিং বাঁচাতে সেখানে এই অবস্থায় গিয়ে ঢুকলে বুকে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া।

শিশির গৌরের উদার নিমন্ত্রণ শুধু সেই জন্যেই অবশ্য প্রত্যাখ্যান করি নি। একসঙ্গে এই তুজনের ঘাড় ভাঙবার এমন একটা মৌকার জন্যে শিবু আর আমি, নিউমোনিয়ার ঝক্কিও অন্য সময় হ'লে হয়ত নিয়ে ফেলতাম। কিন্তু আমাদের আরেক গরজ তখন অনেক বেশী জবর।

কোনো রকমে মেসে ফিরে জামা কাপড়টা শুধু বদলেই আমাদের না ছুটলে নয়।

শিবু সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে গৌর শিশিরকে।

এখন রেস্তোরাঁয় যাব কি? পাইকপাড়া যেতে হবে না?

পাইকপাড়া? সেখানে আবার কেন?—গৌর শিশির যেন আকাশ থেকে পড়েছে।

একেই বলে জেনেশুনে ন্যাকা সাজা। পাইকপাড়া কোথায়, কি, কেন, সব যেন ভুলে গেছে তুজনে!

ওদিকে বুকের ভেতরটা ত' চড় চড় করছে। নিজেরা যেখানে দেউড়ি দিয়ে পা বাড়াতে না বাড়াতে পত্রপাঠ বিদায়, সেখানে আমরা সাতমহলের

ছটা মহল পেরিয়ে এবার খাসমহলে ঢুকতে যাচ্ছি ! মনের ভেতর সেই দুঃখই পাক্ খাচ্ছে, আবার বলে কি না, পাইকপাড়া ! সেখানে আবার কেন ?

তা ওরা যদি ডালে ডালে চরে ত' আমরা যাই পাতায় পাতায় ।

যেন বলবার মত কিছু নয় এমনি ব্যাপারটা তুচ্ছ করে আমি বলেছি,—এমন কিছু না । ওই একটু খেলতে যাবো দুজনে ।

খেলতে যাবে !—শিশির গৌরের যেন কথাটা হতভম্ব হয়ে দুবার আওড়াবার পর খেয়াল হয়েছে,—ও, আজ ত' সেই ব্রীজ কম্পিটিশনের খেলা । হ্যাঁ, হ্যাঁ তোরা যেন কোন রাউণ্ডে উঠেছিস ?

রাউণ্ডে আর নেই !—পয়লা রাউণ্ডেই যারা খসে পড়েছে তাদের গায়ে চিড়বিড়িনি ধরাবার এমন সুযোগ আর ছাড়ি,—উঠেছি সেমিফাইন্যালে ।

ওঃ সেমিফাইন্যালে !—তাচ্ছিল্য করবার চেষ্টা করলে কি হয় গৌরের গলাটা আফসোসে মিয়নো ।

শিশির হঠাৎ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যেই ভাবিত হয়ে উঠেছে,—কিন্তু এত ভিজেছিস, আবার এই বৃষ্টির মধ্যে অত দূর যাবি ! বাসে ওঠাই ত' এখন দায় ।

বাসে যদি না হয় তাহলে ট্যাক্সিতে যাবো ।—শিবু যেন একটানা মুখস্থ পড়া পড়ে গিয়েছে,—ট্যাক্সি না জোটে রিক্‌শ নেবো । আর তাও যদি না পাই হেঁটে যাবো পাইকপাড়া । জোকার ক্লাবের অল বেঙ্গল ব্রীজ কম্পিটিশনের শীল্‌ডটা আমাদের বাহাত্তর নম্বরের বসবার ঘরে মানাবে বলেই ত' মনে হয় ।

শেষ কথাগুলো হয়েছে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে । মতি শীলের গলির ভাঁড়ের চা পেটে ছ্যাকা লাগানো দুটো করে চুমুকে শেষ করে মেট্রোর সামনে থেকে ট্যাক্সি ধরে তখন আমরা এসপ্ল্যানেড থেকে বনমালী নস্কর লেনে চলেছি ।

ও ! দেয়ালে শীল্‌ড টাঙাবার পেরেক পুঁতেই ফেলেছিস বুঝি !—গৌর একটু বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু খোঁচাটাই ভোঁতা ।

শিশির অন্য রাস্তা নিয়েছে । বাহাত্তর নম্বরের সামনে নেমে ট্যাক্সির ভাড়াটা নিজেই চুকিয়ে দিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বলেছে,—কিন্তু আজ হয়ত মিছিমিছি যাবি ! খেলাই হয়ত আজ বন্ধ !

কেন ? রেনী-ডে বলে !—ওপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমি উপযুক্ত জবাব দিয়েছি,—এ কি স্কুল পেয়েছিস ? রেনী-ডে বলে ছুটি হবে ! রেনী-ডে হলেই ত' খেলা বেশী জমে ! গিয়ে পৌঁছোতে যে পারবে না সে দল বাতিল।

শিশির গৌর আর একটা ছুতো পেয়ে গেছে এবার।

গৌর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই চোখ বন্ধ করে নাকটা একটু তুলে গদগদ স্বরে বলেছে,—আঃ ! গন্ধটা পাচ্ছিস ?

শিশির ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে,—রামভুজ ডালপুরী বানাচ্ছে যে ! এ যা পাচ্ছিস, এ ত' শুধু ওর স্পেশ্যাল সব্‌জির গন্ধ। এরপর যখন ডালপুরী ভাজবে তখন ত' তর হয়ে যাবি। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা লাগবে। তারপরেই গরমা গরম !

ততক্ষণে দোতালায় পৌঁছে নিজেদের ঘরের দিকে চলেছি। শিবু একেবারে বৈরাগী বিবাগীদের মডেল হয়ে বলেছে,—গরমা গরম তোমরাই সেঁটো ভাই। আমাদের লোভ নেই।

নিজেদের ঘরের দিকে যেতে যেতে বসবার ঘরটার দিকে একবার চোখ না ঘুরিয়ে পারিনি অবশ্য।

বেশ একটু তাজ্জবই হতে হয়েছে অস্বীকার করব না।

স্বয়ং ঘনাদা সেখানে তাঁর মৌরসী কেদারা দখল করে বসে আছেন !

তা থাকুন ! মুনির মন টলাতে পারে, কিন্তু আমাদের আজ টলায় এমন ত্রিনিয়ায় কোনো কিছু নেই।

শুধু জোকার ক্লাবের কম্পিটিশনে যাওয়ার জেদ ত' নয়—শিশির গৌরের সঙ্গে এ এক মোক্ষম মনের জোরের পাঞ্জা লড়া।

অল বেঙ্গল ব্রীজ কম্পিটিশনের শীল্‌ডটা আমরা জিতে নিয়ে আসব, তা আবার এই আসর ঘরের দেওয়ালেই আমাদের কীর্তি দিনের পর দিন মনে করিয়ে দেবার জন্যে চোখের ওপর ঝুলবে এতটা কি সহ্য হয় !

তাই যা করে হোক আমাদের ব্রীজ খেলতে যাওয়াটা বন্ধ করতেই হবে !

বাহাত্তর নম্বরে ডালপুরীর যোগাড় জেনেও শিশির গৌরের আগবাড়িয়ে এ সময়ে এসপ্ল্যানেডে টহল দিতে যাওয়ার মানেটা কি আর এতক্ষণে বুঝি নি !

ওখান থেকেই বাখড়া দেওয়া যাতে শুরু করা যায় সেই আশাতেই ওই টহলদারী। ওখানে না পেলে মেসে ফিরে এসে পর পর চালবার সাজানো ঘুঁটি ত' আছেই। এখন যা চালছে।

যে প্যাঁচই খাটাক, আমরা কেটে বার হবার জন্যে তৈরী।

বসবার ঘরটা পেরিয়ে যাবার সময় একটু বেকায়দায় অবশ্য পড়তে হয়েছে।

আরে শিবু সুধীর যে! তপস্যা করে যাঁকে পাওয়া যায় না সেই ঘনাদা নিজে থেকে সেধে ডেকেছেন,—কোথায় ছিলে এতক্ষণ! আসর ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে! শীগ্‌গির এসে তাতাও।

হ্যাঁ, তাতাচ্ছি এই যে!—মনে মনে বলেছি। শিবুর সঙ্গে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে মুখে বলেছি,—হ্যাঁ আসছি কাপড় ছেড়ে।

ছেড়ে আসতে মিনিট কয়েক মাত্র লেগেছে। শুধু পোশাক বদলেই নয় গায়ে ওয়াটারপ্রুফগুলো গলাতে গলাতে হুড দুটো হাতে করে নিয়ে আসর ঘরে ঢুকেছি।

তা, একটু চমক দিতে পেরেছি বইকি!

আমাদের ডাকছিলেন তখন?—বেশ একটু শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করে নেহাত যেন অনিচ্ছাভরে ঘরে এসে দাঁড়াবার পর আর সকলের ত' বটেই ঘনাদারও ভুরু দুটো একটু যে উঠেছে তা লক্ষ্য করেছি।

নাসারন্ধ্র দুবার একটু নীরবে বিস্ফারিত করে তিনি বলেছেন,—তোমরা বেরুচ্ছ এখন!

উক্তিটা বিস্ময়ধ্বনিও নয় প্রশ্নও না।

শিবু আর আমি ততক্ষণে ওয়াটারপ্রুফ দুটো গায়ে গলিয়ে ফেলে বোতাম পর্যন্ত এঁটে ফেলেছি।

না, বেরিয়ে আর করি কি!—এদিক ওদিক কিছু একটা খোঁজার জন্যে তাকিয়ে একটু যেন অন্যমনস্কভাবেই ঘনাদাকে জবাব দিয়ে আবার বলছি,—একটা ছাতা শুধু খুঁজছিলাম!

ছাতা!—একটু আশার আলো পেয়ে গৌরের গলায় সহানুভূতি উথলে উঠেছে যেন,—সত্যিই ত' ছাতা একটা না হলে আজকের এই বৃষ্টি শুধু ওয়াটারপ্রুফে কি আটকায়! কিন্তু বাহাত্তর নম্বরে ছাতা কোথায়? সেই

উল্টো নামের শ্রীমান সুশীলের ছাতা ঘনাদা রাস্তায় দান করে আসবার'পর থেকে বাহাত্তর নম্বরে ছাতা আর কেউ কি দেখেছে ?

কিন্তু ছাতা একটা না হলে তোরা বেরুবি কি করে ? শিশির গৌরের চেয়েও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

এই এমনি করে ?—বলে হুডগুলো এবার মাথায় চাপিয়েছি।

ঘনাদা যেন হঠাৎ আমাদের কথা ভুলেই গেছেন। তাঁকে ঘিরে যারা বসেছে তাদের দিকে চেয়ে স্মরণশক্তিটা উস্‌কে নেবার চেষ্টায় বলেছেন,—হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম ? তখন আমি ঠিক কোথায়, তাই না ? বার্মুডা বা বাহামা ?

বাইরে না হোক মনে মনে আমরা ঘনাদার মতই নাসিকাধ্বনি করেছি। এসব পুরোনো প্যাঁচ আমাদের খুব জানা আছে। এতেই কাবু হবার মত কাঁচা ছেলে ভেবেছে নাকি আমাদের ?

ঘনাদার কথার পিঠে চটপট চিম্‌টিটুকু কেটেছি তাই।

ঘনাদার যেন কানে তুলো গোঁজা এমনি ভাবে তিনি নতুন কি প্যাঁচ ছেড়েছেন তা ত' আগেই বলেছি।

ঘনাদা যেন নিজের স্মৃতির ডুবুরী হয়ে হেঁয়ালির জট তুলেছেন,—ফ্লোরা কি ডোরার দেখা তখনো পাইনি!

শিবু আর আমি এ ওর মাথায় বর্ষাতি ঘোমটার বোতাম এঁটে দিতে দিতে মুখ টিপে হেসে বলেছি,—পেলে কি কেলেঙ্কারীই হ'ত!

ঘনাদার কানটা হঠাৎ কি করে শুধরে গেছে কে জানে! আমাদের কথাটা এবার নির্ভুল শুনে তাতেই জোরের সঙ্গে সায় দিয়েছেন,—কেলেঙ্কারী বলে কেলেঙ্কারী! ওদের কারুর সঙ্গে দেখা হওয়া মানে একেবারে দফা রফা!

ঘনাদার কথায় আর কান দেবারই দরকার কি ? শিবুকে তাই ধাক্কা দিয়ে বলেছি, চল! চল!

তুজনে দরজার দিকে পা বাড়াবার সঙ্গে শিশিরের ভয়ে কাঁপা গলা শুনতে পেয়েছি,—ওই ডোরা আর ফ্লোরা যা নাম করলেন, সব খুব সাংঘাতিক মেয়ে বুঝি ?

তা সাংঘাতিক মেয়ে ছাড়া আর কি বলবে!—দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে এসেও ঘনাদার কথাটা কানে এল,—ডোরারটা ঠিক হিসেব নেই, কিন্তু ফ্লোরার হাতে গেছে অন্ততঃ সাত হাজার একশ' তিরেনব্বুই জন।

সাত হাজার একশ' তিরেনব্বুই জন খুন! গৌরের শিউরে-ওঠা আধা-চিৎকারটা বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির মুখটা পর্যন্ত আমাদের পিছু নিয়েছে—রাক্ষুসী নাকি?

রাক্ষুসী ছাড়া আর কি? ঘনাদার গলাটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি,—দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরের দ্বীপ ট্রিনিডাডের মাথার ওপর দিয়ে এসে গলা বাড়ানো হাইতির ছোট মুণ্ডুটা মাড়িয়ে কিউবার পূব কোণটা একটু ছুঁয়ে উত্তর মুখো হয়ে নিরুদ্দেশ হবার মধ্যেই ওই সাত হাজার একশ' তিরেনব্বুই জনকে সাবাড় করেছে ফ্লোরা।

শিবুকে এবার ধমক দিতে হয়েছে,—হাঁ করে আবার থমকে দাঁড়ালি কেন সিঁড়ির মাথায়?

না, দাঁড়ালাম কোথায়?

শিবু সিঁড়িতে এক ধাপ নামতেই বলতে হয়েছে, দাঁড়া, দাঁড়া, কি যেন একটা ফেলে এলাম মনে হচ্ছে।

গৌর গলা ছেড়ে তখন জিজ্ঞাসা করছে শুনতে পাচ্ছি,—নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বলছেন, তার মানে ওই রাক্ষুসী খুনে মেয়েদুটোকে কেউ ধরতেও পারেনি।

সাধ্য কি তাদের কেউ ধরে! আর শুধু কি দুটো!—ঘনাদা যেন সেই সর্বনাশী মেয়েদের কথা ভাবতেই খানিক গুম হয়ে গেছেন।

কই, কি ভুলে গেছিস মনে পড়ল?—শিবু আমায় খোঁচা দিয়েছে সেই ফাঁকে।

ওঘরে না গেলে মনে ত' পড়বে না ঠিক!—বেশ ব্যাজার মুখেই বলেছি, —কিন্তু গেলেই ত' ভাববে লোভে লোভে ফিরে এসেছি!

ভাবুক না যা খুশি। শিবু বেপরোয়া হয়ে আমায় সাহস দিয়েছে,—আমরা কারুর ভাবনায় পরোয়া করি নাকি? দরকার থাকলেও টিট্‌কিরির ভয়ে ও ঘরে যাবো না?

আলবৎ যাবো ! আমি বীরবিক্রমে এগিয়ে গেছি।

পেছনে শিবু।

খোঁচার বদলে পাল্টা খোঁচার সঙীন উঁচিয়ে তৈরী হয়েই আসর ঘরে ঢুকেছি। কিন্তু কই টিট্‌কিরি ত' দূরের কথা কেউ যেন খেয়ালই করেনি।

ঘনাদা তখনো বুঝি তাঁর সর্বনাশীদের ধ্যানে ভোম্ মেরে আছেন। গৌর তা ভাঙবার জন্যেই তখন বলছে, স্তম্ভিত গলায়,—দুটো নয় কি বলছেন! আরো আছে ?

আছে না ?—ঘনাদা দুঃখের হাসি হেসে আবার একটু চুপ।

শিবু তখন খালি একটা চেয়ারে বসেই পড়েছে।

বললাম,—বসলি যে !

চাপা গলাতেই বলেছি অবশ্য।

তা বসলামই বা !—শিবুও গলা নামিয়ে বলেছে,—তুই ত' এখন কি ভুলে গেছিস মনে করবি !

শিবুর যুক্তির বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। কি ভুলে যাচ্ছি ভাববার জন্যে আমাকেও একটু বসতে হয়েছে।

চেয়ার আর নেই কিন্তু ছোট চৌকিটায় গৌর নিজে থেকেই নীরবে একটু সরে বসেছে জায়গা করে দেবার জন্যে।

যাহোক একটু জায়গা হলেই হল। কতটুকুই বা আর বসব! শুধু ভুলটা মনে পড়ার ওয়াস্তা।

কিন্তু ঘনাদা বসে বসেই ঘুমোলেন নাকি !

আর যারা সব তারাও ওই ফ্লোরার মতই খুনে ?—শিশির ঘনাদার চট্‌কা ভাঙাতে নাড়া দিয়েছে।

কম যায় না বড়ো !—ঘনাদা বাহামা না বার্মুডা থেকে বনমালী নস্কর লেনে ফিরে এসে বলেছেন—ফ্লোরা খতম করেছে সাত হাজারের ওপর তেষট্টি সালে, আর তার আগে উনিশ শ আটাশ-এ আর একজনের হাতে সাবাড় হয়েছে চার হাজার। তার আবার নামও কেউ জানে না। নামই হয়নি হয়ত। নামকরাদের মধ্যে হ্যাটী, ডোনা, হিল্ডা, হেজেল, শতমারীর নিচে কেউ নয়। হেজেল দফা নিকেশ করেছেন এক হাজার একশ' পঁচাত্তর জনের, হিল্ডা

পঞ্চান্নতে ছ'শ, ডোনা যাটে একশ পঁয়ষটি আর হ্যাটী একষট্টিতে দু'শ পঁচাত্তর। এছাড়া ক্লিও অড্রে আর ছোটখাট আরো ত' আছেই। মানুষকে প্রাণে যারা কম মেরেছে তারা সুদ সুদ্ধ পুষিয়ে নিয়েছে ধনে। ডোনা এমনিতে ওদের দলে যাকে বলে লক্ষ্মী মেয়ে বলা যায়। জান নিয়েছে মাত্র একশ পঁইষট্টি জনের কিন্তু যেখান দিয়ে গেছে সেখানে কমসে কম সাতশ কোটি টাকার ধন দৌলত লোপাট !

এত খুনোখুনি লুটপাটের কথার মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা করে কিছু ভাবা যায় ! কি ভুলে গেছি মনেই করতে পারিনি এতক্ষণে। ডোরা ফ্লোরার জন্যে আমার কিসের মাথা ব্যথা ! নেহাৎ বিদঘুটে আলোচনাটা থামাবার জন্যেই বলতে হয়েছে,—ওই খুনে মেয়েগুলো সব বুঝি আপনি যেখানে ছিলেন সেই বার্মুডা না বাহামার ?

বার্মুডা নয়, ছিলাম তখন বাহামায়। এখন মনে পড়েছে।—ঘনাদা আমায় খুশি মুখেই জবাব দিয়েছেন,—আর ওরা সবাই ঠিক বাহামার না হলেও ওই অঞ্চলের বলা যায়। ছোট অ্যান্টিলিজ দ্বীপপুঞ্জের পূবদিকে উত্তর অ্যাটলান্টিক সমুদ্র। সেখান থেকে এসেছে অনেকে। কারুর কারুর আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান সাগরেই জন্ম। উনিশ শ সাতান্নতে তিনশ নব্বুই জনকে যমালয়ে পাঠিয়ে অন্ততঃ একশ' কোটি টাকার সম্পত্তি যে লোপাট করে দেয় সেই অড্রে ত' দূর দূরান্তর কোথাও থেকে আসেনি। মেক্সিকো উপসাগর থেকে মাত্র আমেরিকার লুইসিয়ানা স্টেট-এর সীমানা ছাড়িয়ে মিসিসিপির চৌকাঠ পর্যন্ত পেঁছেই অড্রে নিপাত্তা। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যে যেখানে সে চোখ দিয়েছে সেখানেই শ্মশান।

একটু থেমে, পুরোনো স্মৃতির একটু চমকেই যেন শিউরে উঠে,—ঘনাদা বলেছেন,—কিন্তু ফ্লোরা, হিল্ডা, হেজেল, অড্রে এরা সব ত' পাহাড়ী বিচ্ছুর কাছে ডেয়ো পিঁপড়ে ! একেবারে ঠিক সময়ে না সামলালে লরা যে কি করত তা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। আমেরিকার নিউ অরলিনস্ থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত বংশে বাতি দিতে কাউকে বোধহয় রাখত না।

অ্যাঁ ! এমন ভয়ঙ্কর মেয়ে ! এ লরাকে সময় মত সামলেছিল কে ?

শিবুটা প্রথমে খানিক হাঁ করে থেকে, পরে আহাম্মকের মত জিজ্ঞেস করে বসেছে—আপনি ?

ঘনাদার বাঁকানো ঠোঁটে অসীম ধৈর্য আর ক্ষমার একটু হাসি। টেনজিং নোরকে-কে যেন কে প্রথম এভারেস্ট-এর চূড়ায় উঠেছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, প্রথমে কে একটানা প্লেনে আটলান্টিক পার হয়েছে জানতে চাওয়া হয়েছে লিণ্ডবার্গের কাছে !

শিবুর আহাম্মকিতে ঘনাদা চটুন না চটুন, আমার কি আসে যায় ? আমরা ত' যাচ্ছি জোকার ক্লাবে ! নেহাৎ কি ভুল হয়েছে ভাববার জন্যে একটু বসেছি তাই শিবুকে একটু ধমক দিতে হয়েছে।—জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করল না তোর ? ঘনাদা নয়ত লরাকে আর কে সামলাবে শুনি !

শিবু অধোবদন হবার পর ঘনাদাকেই জিজ্ঞাসা করেছি,—ও মুণ্ডমালিনীকে কেমন করে সামলালেন ঘনাদা ?

কেমন করে ?—ঘনাদা তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন—একটু ধুলো দিয়ে !

ধুলো দিয়ে !

আমার শুধু একার নয়, আসরে যে যেখানে ছিল সবার চোখই ছানাবড়া।

হ্যাঁ,—ঘনাদা ব্যাখ্যা করেছেন,—লরা-র চোখে একটু ধুলো দিতেই কাম ফতে হয়ে গেল।

চোখে ধুলো দিয়ে কাম ফতে ?—আমাদের হাঁ মুখ আর বুঝতে চায়নি !

হ্যাঁ, লরার অর্ধেক শয়তানি জারি-জুরি তাতেই চোখের জলে গলে গেল বলতে পারো !—ঘনাদা আর একটু বিশদ হয়েছেন,—তারপর যাকে বলে কানা হয়ে দিগ্বিদিক ভুলে আতলান্তিকের ওপরই উধাও হয়ে কোথায় মুখ থুবড়ে মরেছে কে জানে ! কারি তাই বলত,—দাস, কোথায় ছিলে তুমি উনিশ শ চুয়ান্নতে। এক হাজার একশ' পঁচাত্তর জনকে নিকেশ করার বদলে এই বাহামার মায়াগুমা দ্বীপে পৌঁছোবার আগেই হেজেল নিজে কাবার হয়ে যেত !

হেজেল বুঝি মায়াগুমা দ্বীপে হানা দিয়েছিল ?—জিজ্ঞাসা করেছে শিশির।

শুধু কি মায়াগুমা দ্বীপ ! ঘনাদা দুঃখের হাসি হেসেছেন,—ওইখানে ত' তার উৎপাত সবে শুরু। সেখান থেকে সাগর পেরিয়ে আমেরিকার

উইলমিংটন শহরের পাশ দিয়ে ফিলাডেলফিয়াকে ডাইনে রেখে সোজা সেই অনটারিও হ্রদ পর্যন্ত।

সত্যি, আপনি থাকলে ত' আর এ সব হয় না !—গৌর আফসোস করেছে, —ঠিকই বলত ত' ওই কি নাম বললেন যেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ কারি। ওই কারি কে ?

কারি আমার বন্ধু একজন কংক্।—ব্যাখ্যা করেছেন ঘনাদা—তার সঙ্গে স্ট্রম্বস্ গাইগাস্, মানে, পঞ্চমুখী শাঁখের খোঁজে তখন বেল দ্বীপে একটা স্লুপে থাকি, আর সেই স্লুপেরই একটা ডিঙি নিয়ে তাতে কারি আর আমি পঞ্চমুখী শাঁখ খুঁজে ফিরি সমুদ্রের তলায়। ডিঙিতে আমার হাতে থাকে তলায় কাঁচ আঁটা একটা বালতি আর কারির হাতে হাল। কাঁচ আঁটা বালতির মত চোঙটা সমুদ্রের জলের ভেতর ডুবিয়ে ধরে আমি তার ভেতর দিয়ে কোথায় পঞ্চমুখী অ্যালজির ওপর চরে বেড়াচ্ছে দেখি আর দেখতে পেলে আঁকশি লগি দিয়ে তা বোটে তুলে নিই। আমার লোভ পঞ্চমুখী শাঁখের ওপর আর কারির লোভ শাঁখের শাঁসালো মাংসে। শাঁখের শাঁসই তাদের প্রধান খাদ্য বলে এই শাঁখ শিকারীদের একটা নাম কংক্। বেশীর ভাগ শাঁখ শিকারীই নিগ্রো বলে তাদের এ নামটা অবজ্ঞাভরেই দেওয়া হয়েছে।

যারা তা দিয়েছে একজন কংক্-এর দৌলতেই কত বড় ভয়ঙ্কর পরিণাম থেকে যে তারা রক্ষা পেয়েছে তা কোনদিন বোধহয় জানবে না।

চোখে ধুলো দিয়ে কানা করে লরার জারিজুরি আমি ভেঙে দিয়েছি ঠিকই কিন্তু কারি আমার সঙ্গে না থাকলে লরা কখন কোথায় যে রাক্ষসী মূর্তি ধরছে তা আমি জানতেও পারতাম না।

কারিরা প্রায় চৌদ্দপুরুষ ধরে বাহামাতেই আছে, বাহামার মাটি জল হাওয়ার সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ। কারির আবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা এই যে সাইজমোগ্রাফে যেমন ভূমিকম্প, ব্যারোমিটারে যেমন হাওয়ার চাপ, কারি তেমনি তার হাড়ের ভেতরে ঝড় তুফানের সব হদিস আগে থাকতে টের পায়।

সারাদিন শাঁক শিকারের পর রাত্রে স্লুপের ডেকে তারার আলোয় ঝলমল আকাশের তলায় শুয়ে গল্প করতে করতে হঠাৎ কারি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছে সেদিন।

কি হল কি কারি?—আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যেন ভূত দেখলে মনে হচ্ছে। ভূত নয় ডাকিনী!—ধরা গলায় বললে কারি,—আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি সে জাগছে।

হাজার বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হলেও বাহামায় শাঁক শিকার করে জীবন কাটিয়েছে। আমি তাই ব্যাপারটা কারির অন্ধ কুসংস্কার ভেবেছি। বিশ্বাস করিনি। তাকে শুধু ক্ষুণ্ণ না করার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম,—জাগছে কোথায়?

এই কাছেই!—কারি সভয়ে বললে,—প্রভিডেন্স প্রণালীতে।

এবার একটু হেসে ঠাট্টা করে বললাম,—কি বলছ কি কারি! প্রভিডেন্স প্রণালীতে ডাকিনী জাগছে আর তুমি এখানে শুয়ে শুয়ে তা টের পেলে! ও তোমার গেঁটে বাত-টাত হবে। কাল অমাবস্যা তাই একটু চাগাড় দিয়েছে।

না, না বাত নয় দাস!—কারি ব্যাকুল হয়ে উঠল আমায় বোঝাতে,—আমি সত্যি আমার হাড়ের ভেতর এ সব টের পাই। হেজেল-এর বেলা ঠিক এই রকম টের পেয়েছিলাম। তখন জানাবার কেউ ছিল না। তুমি আছ বলে তাই জানাচ্ছি। এ ডাকিনী হেজেলের চেয়ে শতগুণ সর্বনাশী। প্রভিডেন্স প্রণালীতে কাল ভোরের আগেই জেগে উঠে সৃষ্টি ছারখার করে দেবে।

এবার আর হাসতে পারলাম না। গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—ভোরের আগে প্রভিডেন্স প্রণালীতে পৌঁছোতে পারবে?

কারি বললে,—পারব।

স্লুপে একটা হারপুন ছোঁড়া বন্দুক আছে না?—জিজ্ঞাসা করলাম তারপর।

হ্যাঁ আছে।—কারি অবাক হয়ে বললে,—কিন্তু হারপুন ছুড়ে এ ডাকিনীকে তুমি ঘায়েল করবে?

করব।—জোর দিয়ে বললাম,—তবে শুধু হারপুন ছুড়ে নয়, হারপুনের কামানে এ ডাকিনীর চোখ নিশানা করে ধুলো ছুড়ে তাকে কানা করে।

কি বলছ কি দাস!—কারি মাথা নেড়ে বললে,—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! নিশ্বাসে যে প্রলয় ঘটায় সেই তুফানকে তুমি ধুলো ছুড়ে জব্দ করবে!

তোমার হাড়ের খবর যদি ভুল না হয়, আর ভোরের আগে প্রভিডেন্স প্রণালীতে যদি পৌঁছে দিতে পারো এ স্লুপে, তাহলে চেষ্টা করে ত' একবার

দেখতে পারি।—এবার ইচ্ছে করেই সুরটা একটু নামিয়ে বললাম,—এ সব তুফানের একটা এবং একটিমাত্র চোখ থাকে জানো ত’?

জানি। কারি আমার কৌশলটা বোঝাবার চেষ্টা করে বলল,—সে চোখ তোমায় দেখাতেও পারব।

তাহলেই হবে।—তাকে আশা দিলাম।

হলও তাই। প্রভিডেন্স প্রণালীতে পেঁাছোলাম ভোর হবার আগেই। তুফান ডাকিনী তখন থমথমে সমুদ্রে ঘূর্ণি হাওয়ার সঙ্গে জাগতে শুরু করেছে।

কারি সভয়ে বললে,—এখন হাল্কা কথার সময় নয়! তবু ওই ঘূর্ণি দেখে আমার লরা বলে এক নাচিয়ে মেয়ের কথা মনে পড়ছে। সেও সর্বনাশী মেয়ে। হাজার বুক ভেঙেছে।

বেশ তাহলে এ ডাকিনীর নামও থাক লরা।—আমি হেসে বললাম,—এবার তৈরী থাকো হারপুন কামান নিয়ে। আমি ধুলোয় ঠাসা গোলা তাতে ভরে রেখেছি।

`দেখতে দেখতে লরা ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল। আর তার চোখ তাগ করে ছুড়লাম সেই ধুলো-ভরা গোলা!

ব্যস্! খানিকক্ষণের মধ্যেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায় ঝরে পড়ে লরা নেতিয়ে পড়ে কাৎ।

ঘনাদা থামলেন।

এক একজনের মুখে তখন এক এক রকম বিস্মিত প্রশ্ন।

ওঃ! লরা ফ্লোরা মানে সব তুফান ঝড়?

ঘনাদা একটু মুচকে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

কিন্তু ধুলোর গোলা যে ছুড়লেন, সে ধুলোটা কি?

হলদে রঙের একরকম ধুলোর মত গুঁড়ো। ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন,—তার চিহ্ন হল ‘এ জি আই’, আর নাম সিল্ভার আইওডাইড্!

সিল্ভার আইওডাইড্! এবার আমি মৌকা পেয়ে চেপে ধরলাম, কিন্তু সে ত’ বৃষ্টি নামাবার জন্যে সাধারণ মেঘের ওপর ছড়ানো হয়। তাতেও তেমন কাজ হয় না। সিলভার আইওডাইডে ফ্লোরা ডোরার মত প্রলয়ঙ্করী হরিকেন থামানো যায়?

কাকে বলছি ?

ঘনাদা তখন ঘরের দরজা দিয়ে তাঁর টঙের ঘরের দিকেই চলেছেন। হাতে তাঁর গোটা একটা সিগারেটের টিন। এখনো খোলাই হয়নি।

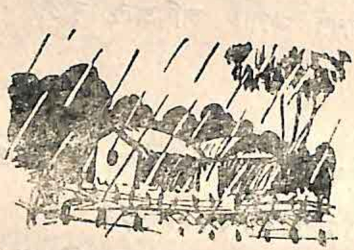
এটা যেন ঘুষ মনে হল !

শিশির গৌরের দিকে চাইলাম। তাদের মুখে যেন দুষ্টু দুষ্টু হাসি। বললে—বোস, ডালপুরী আসছে।

ডালপুরী তোমরাই খেয়ো।—যথাসাধ্য গলায় অবজ্ঞা ফোটাবার চেষ্টা করে শিবুর দিকে ফিরে বললাম,—কই, ওঠ!

তাড়া দিয়ে শিবুকে ওঠালাম। গেলামও সেই পাইকপাড়ায় কাদা জল ভেঙে। লাভ হল না।

সময়ে না পৌঁছোবার দরুণ কম্পিটিশন থেকে আমাদের দলের নাম কাটা গেছে।





হিমঘর

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর কাঞ্জিলাল আরামকেদারায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

ধবধবে সাদা চুল, ধবধবে সাদা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। চোখ কাগজের ওপর স্থিরভাবে নিবদ্ধ। যেন কোন দিকেই হুঁশ নেই। এটা তাঁর বহুদিনের স্বভাব। যখন যা করবেন তাতে তন্ময় হয়ে যাবেন তখন।

গরমের ছুটির আর বেশী দেরি নেই। ছেলেমেয়েরা কলকাতার বাইরে কোথাও বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু যাবে কোথায়? পাহাড়ী শহরগুলোতে তো গিসগিস করছে লোক। হোটেলগুলোতে একটুও জায়গা নেই, পথে সর্বদাই ভিড়। মনে হচ্ছে বছর কয়েক বাদে পৃথিবীতে আর নড়বার-চড়বারও জায়গা মিলবে না।

কিন্তু লোকগুলো যাবেই বা কোথায়? এক, যদি মানুষ অন্য গ্রহ-উপগ্রহ জয় করে সেখানে উপনিবেশ গড়তে পারে! বিজ্ঞানীরা যেমন তোড়জোড় লাগিয়েছেন তাতে চাঁদে হয়তো তাঁরা অল্পদিনের মধ্যেই গিয়ে হাজির হতে পারবেন। কিন্তু উপনিবেশ হিসেবে চাঁদ যে খুব লোভনীয় হবে এমন মনে হয় না। তবে যদি মঙ্গলগ্রহে যাওয়া যায়! কিন্তু তারও হুজ্জত কম নয়।

বছরখানেক আগে একখানা মার্কিন রকেট মঙ্গলের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছিল বটে। বোধ হয় আট হাজার মাইল দূর দিয়ে। টেলিভিশন

মারফত তার কিছু কিছু ছবিও পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সে রকেট আর ফেরেনি। হালে নাকি রুশরা চেষ্টা করছে মঙ্গলের গায়েই রকেট নামিয়ে দেবে। কিন্তু তাতেও কি আর লোক পাঠানো চলবে? সাত আট মাস একটানা রকেট-প্লেনে বসে থাকা সহজ কথা নয়। তারপর যদিই বা মঙ্গলে পৌঁছল আবার ফিরে আসবার কি ব্যবস্থা হবে?

আজকের কাগজেও এ নিয়ে কিছু জল্পনা-কল্পনা বেরিয়েছে। তারই মধ্যে ডুবে ছিলেন ডক্টর কাঞ্জিলাল।

ডক্টর কাঞ্জিলালের বয়স প্রায় পঁচাত্তর হতে চলল, কিন্তু এখনও তাঁর কর্মশক্তি অটুট। বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি তাঁর বড় কম নয়, আর মজা, বিজ্ঞানের শুধু একটা দিক্ নিয়েই তিনি পড়ে নেই—বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তিনি গবেষণা করেছেন এবং সর্বত্রই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আর, শুধু বিজ্ঞানই বলব কেন, অবসর সময়ে তিনি ভাষাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এসব নিয়েও চর্চা করে থাকেন। এগুলোকে তাঁর "হবি" বলা চলে।

ডুগ্ ডুগ্…ডুগ্ ডুগ্…ডুগ্ ডুগ্…

হঠাৎ বাইরে রাস্তায় ডুগডুগির শব্দ শোনা গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুলেটের বেগে ঘরে ঢুকল তাঁর নাতনী বুবু।—"দাদু, দাদু, সেই ভালুক-ওয়ালাটা যাচ্ছে, ডাকব?"

বড় আদরের নাতনী, দাদুর 'না' বলার উপায় নেই। ডক্টর কাঞ্জিলাল হেসে বললেন, "আচ্ছা ডাক্।"

থপ থপ করে এক বিরাট কালো ভালুক এসে দাঁড়াল রাস্তার ধারে। তাকে ঘিরে এক দঙ্গল লোক—ছেলে, বুড়ো কেউ বাদ নেই।

"কি খেলা দেখবে খোঁখী?"—ভালুকওয়ালা বুবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। বুবু তার অনেক দিনের পুরোনো খদ্দের।

"নতুন কি খেলা শিখিয়েছ তাই দেখাও। এদ্দিন কোথায় ছিলে?"—বুবু অভিমানের সুরে বলল।

ভালুকওয়ালা হেসে বলল, "নোতুন আর কি শিখলাব? এইতো ওর নিদ্ ভাঙ্গল। সমুচা শীতটা শুধু ঘুম-ঘুম আর ঘুম। কুচ্ছু খাবে না, দো মাহিনা

ভোর শুধু নিদ্ যাবে। তাই তো পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে আসি, হামিও মুলুক চলে যাই। গরম পড়ল তো ফিন্ চলে আসি। পাহাড়ে চলে যাই। ও-ও নিদ্ ভাঙ্গলে ঠিক চলে আসে। পোষ মেনে গেছে কিনা।"

"বল কি! সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটিয়েছে তোমার ভালুক? কিচ্ছু না খেয়ে?"—বুবুর চোখ দুটো ছানাবড়ার মত বড় হয়ে উঠল।

ভালুকওয়ালা বুবুর অজ্ঞতা দেখে মনে মনে হাসল, বলল, "খোঁখী, তুমি কুছু জান না। ভাল্লু, সাঁপ, বেঙ,—এরা তো সমুচা শীত ঘুম লাগায়। কুছু হয় না ওদের। আচ্ছা, আভি নাচ দেখো···নাচ্ ভাল্লু, নাচ্···।" ডুগ্ ডুগ্···ডুগ্ ডুগ্···ডুগ্ ডুগ্।

ভালুকওয়ালা চলে গেলে বুবু এসে দাদুর কাছে বসল।

"আচ্ছা, দাদু, পাহাড়ী ভালুক বুঝি সারা শীতকাল ঘুমোয়? তা, না খেয়ে বেঁচে থাকে কি করে?"

"ঘুমোবার আগে ওরা খুব করে খেয়ে নেয়; গায়ে চর্বি জমে। ঘুমোবার সময় ঐ চর্বিই ওদের খাবারের কাজ করে। পেটে না খেলেও ঐ জমানো চর্বিই ওদের শরীরকে তাজা রাখে। তারপর যখন লম্বা ঘুম ভাঙ্গে তখন অবিশ্যি খিদেটা ভাল করেই পায়।"

"ভারী মজা তো! আমি যদি দু'মাস ওভাবে ঘুমোতে পারি তাহলে আমারও তো খাওয়া-দাওয়ার দরকার হবে না! সত্যি, সারা শীতকালটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারলে কি মজাটাই না হত! টেরও পেতাম না কোথা দিয়ে শীত কেটে গেল। বিচ্ছিরী লাগে আমার শীতকালটা।"

বুবু হয়তো আরও অনেকক্ষণ বকবক করে যেত কিন্তু তার আগেই লছমন সিং এসে জানালে যে সেই পার্সেলের বাক্সটা এসে গেছে।

"এসে গেছে? বাঃ!"—ডক্টর কাঞ্জিলাল বললেন।—"আমার লাইব্রেরী ঘরে তুলে রাখতে বল।"

আগেই বলেছি ভাষাতত্ত্ব ডক্টর কাঞ্জিলালের একটা 'হবি'। তাঁরই এক পুরোনো ছাত্র মিলিটারীতে যোগ দিয়ে কিছুদিন আগে নেফা অঞ্চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে পাহাড়ের ওপরে ষোল হাজার ফুট উঁচুতে ক্যাম্প পড়েছিল ওদের। চিরতুষারের রাজ্য সেটা। সেইখানেই টেণ্ট বসাবার জন্য

বরফের মধ্যে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে ওরা বরফের নীচে কয়েকটা কাঠের বাক্স পায়। হয়তো কোন অতীত যুগে ওখানে কোনও বৌদ্ধ-বিহার বা মন্দির-টন্দির ছিল। তারই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছিল ঐ বাক্সগুলো। মন্দির বা বিহারের চিহ্ন এখন আর নেই, কিন্তু কয়েকটা বাক্স ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে এবং দীর্ঘদিন বরফচাপা থাকায় এখনও নষ্ট হয়নি। ভারী মজবুত কাঠের বাক্স, ওপরে কারুকাজ-করা। তারই একটা বাক্সের ভিতর বিচিত্র ভাষায় লেখা কতকগুলি পুঁথি পাওয়া যায়। ওদের পাঞ্জাবী কম্যাণ্ড্যান্ট্ সেগুলো আবর্জনায় ফেলে দিয়ে বাক্সগুলো জ্বালানী কাঠ হিসেবে ব্যবহার করবার নির্দেশ দেন। ছাত্রটির কিন্তু কৌতূহল হয়—ঐ পুঁথিগুলিতে কি লেখা আছে জানতে হবে। কম্যাণ্ড্যান্টকে বলে-কয়ে সে ঐ পুঁথির বাক্সটা চেয়ে নেয়, কিন্তু ঐ দুর্বোধ্য ভাষা বুঝবার মত বিদ্যে তার ছিল না। তখন তার মনে পড়ে ডক্টর কাঞ্জিলালের কথা। তাঁর হবির কথাও ওর জানা ছিল। তাই একটা চিঠি দিয়ে সে বাক্সটা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। লছমন সিং সেই পার্সেলটার কথাই বলছিল।

দুপুরে ডক্টর কাঞ্জিলাল সাধারণতঃ ল্যাবরেটরীতেই কাটান সেই রাত পর্যন্ত। কিন্তু আজ রবিবার। আজ আর ল্যাবরেটরী নয়, আজ শুধু লাইব্রেরী। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু পড়াশোনা করবার জন্য তিনি তাঁর লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুকলেন আর তখনই মনে পড়ল সেই কাঠের বাক্সটার কথা।

পুরু, দামী কাঠের তৈরী বাক্স, ভেতরে একতাড়া হাতে লেখা পুঁথি। বোধহয় কোনও গাছের ছালের ওপর লেখা, কিন্তু প্রায় কাগজের মতই মসৃণ এবং পাতলা।

ডক্টর কাঞ্জিলাল সাবধানে একটা পুঁথি তুলে নিলেন। সোজা সোজা, ওপর নীচে টানা, অনেকটা ছবির হরফে লেখা। কি ভাষা এটা? খুব প্রাচীন কোন ভাষাই হবে বোধ হয়। ছবির অক্ষর দেখে তাই তো মনে হয়। চীনে ভাষার সঙ্গে তাঁর অল্পস্বল্প পরিচয় আছে, এগুলো কি তবে প্রাচীন চীনে ভাষায় লেখা? তিব্বতের কাছে পাওয়া গেলেও তিব্বতী ভাষা এগুলি নয়, কারণ তিব্বতীরা তাদের অক্ষর বা লিপি ভারতের কাছ থেকেই নিয়েছিল, তাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল না।

কিন্তু কোন্ সময়কার ভাষা এটা ? বৌদ্ধ যুগের, নাকি তারও অনেক আগের ? ছবির ভাষা দেখে সেই রকমই তো একটা সন্দেহ জাগে।

একটা জিনিস কিন্তু ডক্টর কাঞ্জিলালের কাছে বেশ আশ্চর্য লাগল। অত পুরোনো লেখা, কিন্তু সে তুলনায় তা এখনও যেন বেশ অবিকৃত আছে। কাগজটাও, আসলে গাছের পাতা হলেও, তেমন মুচমুচে হয়ে যায়নি। একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস নিয়ে ডক্টর কাঞ্জিলাল পাতাগুলো উলটে যেতে লাগলেন।

অনেকগুলো পাতা উলটে হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। একটা ইঞ্চি তিনেক মাপের পোকার ফসিল পাতাটার গায়ে লেপটে আছে। পোকাটার আকৃতি অদ্ভুত ! শরীরের একটা অংশ খোলা দিয়ে ঢাকা, বাকিটা তার তলা দিয়ে উঁকি মারছে। কিসের ফসিল বলে মনে হচ্ছে ? ডাইক্যালিপ্টো-ইউসেনিকাস্ ?

ডক্টর কাঞ্জিলাল ফসিল নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছেন। ডাইক্যালিপ্টো-ইউসেনিকাস্ নামে এক জাতের ফসিলের কথা তিনি জানতেন। এই জীব বহুদিন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। এদের ফসিলও বেশ দুষ্প্রাপ্য। এখন যেখানে হিমালয় পাহাড়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে সেখানে ছিল সমুদ্র—বিজ্ঞানীদের দেওয়া নাম টেথিস সমুদ্র। হিমালয় পাহাড়ের বুকে এখনও অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সমুদ্র পালটে যখন ডাঙ্গা হল তখন একদল সামুদ্রিক প্রাণীও ধীরে ধীরে চেহারা বদলে ডাঙ্গার প্রাণীতে নিজেদের রূপান্তরিত করল। অবশ্য এই পরিবর্তন একদিনে বা এক-আধ পুরুষে সম্ভব হয়নি—লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টাতেই হয়তো এরকম হয়েছে। যাই হোক, পরিবর্তনের মাঝামাঝি সময়ে যে সব প্রাণী দেখা দিয়েছিল তাদেরই একটি হচ্ছে এই ডাইক্যালিপ্টো-ইউসেনিকাস্। এরা জল আর ডাঙ্গার মাঝামাঝি জীব। অবশ্য ডাঙ্গা হবার পরও এদের বেঁচে থাকতে কোন বাধা ছিল না, তবে যতদূর জানা যায় বহুদিন যাবৎ এরা লোপ পেয়ে গেছে। এ পর্যন্ত এদের সামান্য ২।৩টি ফসিল মাত্র পাওয়া গেছে।

ফসিলটা দেখে ডক্টর কাঞ্জিলাল ভারী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। অতি যত্নে অতি সাবধানে সেটি তুলে জানালার ধারে নিয়ে রাখলেন, যাতে রোদের

আলোয় ভালো করে দেখা যায়। গরমের দিন, রোদের তাতও বড় কম নয়। ফসিলের গায়ে রোদ পড়ে তার কালচে রংটাও যেন ঝকমক করতে লাগল।

বেশ খানিকক্ষণ পোকাটাকে ভালো করে দেখে কাঞ্জিলাল উঠে গেলেন লাইব্রেরী থেকে একটা প্যালিয়ন্টলজীর বই আনতে—যার মধ্যে এদের কথা ভালো করে লেখা আছে। মিনিট দশেক খোঁজাখুঁজির পর বই বেরুল। ফসিলটার বর্ণনা আছে তাতে, একটা ছবিও আছে তার। বইটা নিয়ে ফিরে এলেন ডক্টর কাঞ্জিলাল আবার জানালার কাছে।

কিন্তু পোকাটা যেখানে রেখেছিলেন সেখানে তো সেটা নেই! বেশ খানিকটা দূরে সরে এসেছে। কি করে এল! ভাবছেন, এমন সময় দেখেন পোকাটা আবার নড়ে উঠল, তারপর সুড়সুড় করে আবার খানিকটা এগিয়ে গেল।

তবে—তবে কি এটা জ্যান্ত পোকা! ফসিল নয়? কিন্তু—কিন্তু কি করে হয়? অত দিনের লুপ্ত জীব এখনও, এই পরিবর্তিত পরিবেশেও কি বেঁচে থাকতে পারে?

ডক্টর কাঞ্জিলাল আস্তে আস্তে একটা কাঠি দিয়ে এবার পোকাটাকে উলটে দিলেন। পোকাটা কিলবিল করে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার চেষ্টা করে উলটে সোজা হয়ে গেল, তারপর বিদ্যুৎগতিতে জানালার গরাদের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিল। নাঃ, জ্যান্ত পোকাই বটে!

ছোট্ট একটা জালের খাঁচায় পোকাটাকে রাখার ব্যবস্থা করা হল।

এরপর ডক্টর কাঞ্জিলালকে কয়েকদিন খুবই চিন্তান্বিত মনে হল। সারাদিন লাইব্রেরীতেই কাটান আর মাঝে মাঝে ল্যাবরেটরীতে ছুটে গিয়ে এটা ওটা পরীক্ষা করেন। বাড়িতেই একটা ছোটখাট ল্যাবরেটরী বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি—যাতে সব রকম পরীক্ষারই কিছু কিছু একসঙ্গে একই ঘরে বসে করা যায়।

একদিন দেখা গেল ডক্টর কাঞ্জিলাল বরফের কুচির সঙ্গে এটা ওটা নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে থার্মোমিটার দিয়ে ক্রমাগত কি লক্ষ্য করছেন। বরফের সঙ্গে নুন মেশালে বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হয়। অন্য কোন মসলা মিশিয়ে আরও ঠাণ্ডা করা যায় কিনা সম্ভবতঃ তাই ছিল তাঁর পরীক্ষার বিষয়।

শুধু বরফ নিয়েই পরীক্ষা নয়, ল্যাবরেটরীতে ঠাণ্ডা করার আরও যত রকম কৌশল ব্যবহার করা হয় সব নিয়ে তিনি পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছেন। মনে হল এও বোধ হয় তাঁর একটা নতুন হবি।

শেষে একদিন দেখা গেল ল্যাবরেটরীতে যে গিনিপিগের খাঁচা ছিল তারই সামনে দাঁড়িয়ে গিনিপিগগুলোকে বাছাই করছেন তিনি। অনেকক্ষণ দেখে সাদা-কালো ছোপ ছোপ রঙের একটা মোটাসোটা গিনিপিগ বেছে নিয়ে তিনি সেটা বার করে ফেললেন। গিনিপিগটার একটা কানের খানিকটা ছিল কাটা।

দাদুর হাতে গিনিপিগ দেখতে পেয়ে বুবু ছুটে এল। "কি করবে দাদু কাটাকানিকে দিয়ে?" বুবু ওঁর খাঁচার সব কটি বাসিন্দা গিনিপিগ, খরগোশ —প্রত্যেকটিকেই চেনে। ওদের এক-একটা নামও সে দিয়ে রেখেছিল। এই গিনিপিগটার কান কাটা বলে এটার নাম দিয়েছিল সে 'কাটাকানি'।

ডক্টর কাঞ্জিলাল হেসে বললেন, "দেখ্ না কি করি!"

বিরাট একটা সিন্দুকের মত যন্ত্র ল্যাবরেটরীর এক কোণায় দাঁড় করানো ছিল। এটি হালে তৈরী করানো হয়েছে ফরমাশ দিয়ে। গিনিপিগটাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ডক্টর কাঞ্জিলাল নাতনীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম ;—ভালুকের মত লম্বা ঘুম! ঘুমোক আরামসে।"

ছ'মাস পরের কথা। গিনিপিগটার কথা বুবু ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ দাদুকে সেই সিন্দুকের মত যন্ত্রটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখে সেও এগিয়ে এল—দরজায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখতে লাগল। দাদুর অনুমতি ছাড়া এ ঘরে ঢোকা বারণ।

কাঞ্জিলাল সিন্দুকের পাল্লা খুলে ফেলেছেন, আর সন্তর্পণে একটা চিমটে দিয়ে আলগোছে সেই গিনিপিগটাকে টেনে বার করছেন। বুবু দেখল সেটা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। ঘুম তার ভাঙ্গেনি তখনও, কিন্তু চেহারা তেমনি মোটাসোটাই রয়েছে। কাটা কান দেখে এটাই যে তার সেই কাটাকানি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই রইল না। সেই সাদা-কালো ছোপ ছোপ রং।

ডক্টর কাটাকানিকে এনে রোদের মধ্যে ফেলে রাখলেন। তারপর আস্তে আস্তে হট্ ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে সেঁক দিতে লাগলেন ওর গায়ে। মিনিট

পনেরো এইভাবে কাটলে কাটাকানি হঠাৎ নড়ে উঠল। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু তার জড়তা তখনও কাটেনি।

কিন্তু ঘন্টাখানেক পরেই বুবু দেখল দাদু তাকে ফের খাঁচার মধ্যে পুরেছেন আর সেখানে সে অন্য গিনিপিগদের সঙ্গে দিব্যি ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে।

মাস কয়েক পরে দেখা গেল, ডক্টর কাঞ্জিলালের বাড়িতে কয়েকজন বিদেশী সাহেব এসেছেন অতিথি হয়ে। এঁরা এসেছেন রাশিয়া থেকে; সকলেই নাম-করা বিজ্ঞানী। ডক্টর কাঞ্জিলালের সঙ্গে দিবারাত্র চলল তাঁদের শলা-পরামর্শ। তারপর একদিন দেখা গেল দমদম এরোড্রোমে একটা বিরাট জেট প্লেনে চেপে তাঁরা দেশে ফিরছেন এবং ডক্টর কাঞ্জিলালও এবার তাঁদের সঙ্গী হয়েছেন।

ইতিমধ্যে চাঁদে যাবার জন্য মানুষের তোড়জোড় সমানে চলছিল। রাশিয়া আর আমেরিকা কোমর বেঁধে লেগেছে কে আগে সেখানে সশরীরে লোক নামিয়ে দেবে। আর ঠিক তখনই একদিন অবাক্ হয়ে সবাই কাগজে পড়ল রাশিয়া এবার খোদ মঙ্গলগ্রহের দিকে একটা রকেট ছুড়ে দিয়েছে। সেটা সাত মাস পরে মঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে হাজির হবে আর সেবারকার আমেরিকান রকেটের মত তার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে না গিয়ে মঙ্গলের গায়ে গিয়েই আঘাত করবে। নামবার সময়ে যাতে জোরে ধাক্কা না লাগিয়ে ধীরে ধীরে মঙ্গলের গায়ে নামতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে রকেটে। ভেতরে কি আছে? স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, টেলিভিশন যন্ত্র—এসব তো নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা ছাড়া?......

সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নীরব।

ডক্টর কাঞ্জিলাল সেই যে রাশিয়ায় চলে গেছেন, আর ফেরেননি। তাঁর ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন এ যাবৎ অবশ্য তাঁর চিঠিপত্র নিয়মিতই পাচ্ছিল—কিন্তু কিছুদিন হল হঠাৎ তা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে কি ডক্টর কাঞ্জিলাল অসুস্থ? নাকি ওখানে গিয়েও এমন কোন গবেষণায় মেতেছেন যার ফলে চিঠিটুকু লেখবার পর্যন্ত ফুরসত নেই তাঁর?

ওদিকে দিন গড়িয়ে যাচ্ছে, মঙ্গলগ্রহের দিকে ছুটে-চলা রকেটটির কথা

প্রায় ভুলেই গেছে লোকে, এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন তুই ইঞ্চি হেড লাইন দিয়ে খবরের কাগজগুলো সরব হয়ে উঠল।

কি ব্যাপার ?

সোবিয়েত রকেট মঙ্গলগ্রহে গিয়ে নেমেছে। না, ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যায় নি, এমন কি উলটেও যায়নি। দিব্যি ধীরে ধীরে প্যারাস্যুটের মতই মন্থর বেগে মঙ্গলের ডাঙ্গায় গিয়ে পেঁ ৗছেছে। ব্যস, খবর ঐ পর্যন্ত। কিন্তু তারপর ?

কোন খবর নেই !

কিন্তু এ রকম তো কখনই হয়নি ! রকেটে কি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ছিল না ? টেলিভিশন ক্যামেরার ব্যবস্থা ছিল না ? তা কি অচল হয়ে গেল ?

না, ছিল না। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির বদলে ছিলেন স্বয়ং একজন অভিযাত্রী, মঙ্গলগ্রহে প্রথম মানুষ। যন্ত্রপাতি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন আর তা চালাবার ভার তিনি নিজেই নিয়েছিলেন।

বারো ঘণ্টা পরে সত্যিই টেলিভিশনে খবর আর ছবি এক সঙ্গে ভেসে উঠল ঃ

"মঙ্গলগ্রহ থেকে কথা বলছি। শুনুন—আমার নাম কাঞ্জিলাল। সত্যিই আমি শেষ পর্যন্ত মঙ্গলগ্রহে এসে পেঁ ৗছেছি, এবং বেঁচেও আছি। এখানে এখন চমৎকার আবহাওয়া। অবশ্য পৃথিবীর তুলনায় এখানকার বাতাস খুবই হালকা, তাই আমাকে মাঝে মাঝে সঙ্গে-আনা অক্সিজেন ব্যবহার করতে হচ্ছে। প্রচুর অক্সিজেন আমি সঙ্গে এনেছি, এ ক'মাস তার একটুও খরচ হয়নি। মনে হচ্ছে এ দিয়ে আমার এখনও বেশ কয়েক মাস চলে যাবে। ইতিমধ্যে আমি মঙ্গলগ্রহের পরিবেশে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেবার চেষ্টা করব। তখন হয়তো আর বাড়তি অক্সিজেনের দরকারও হবে না আমার।

কি দেখছি মঙ্গলে ? এখনও ভাল করে ঘুরে দেখিনি। দেখে, ক্রমশঃ তার কথা বলব। তবে শরীরটা বেশ হালকা লাগছে। ওজনটা যেন অনেক কমে গেছে। না, কোন খাল,—কাটা বা স্বাভাবিক, কিছুই এখন পর্যন্ত নজরে পড়েনি, কিন্তু ছোট ছোট গাছপালা, ঝোপঝাড় এদিক্ ওদিক্ ছড়িয়ে রয়েছে। ঠিক সবুজ নয়, ঈষৎ পাণ্ডুর, কিন্তু সংখ্যায় খুব কম নয়। তবে পায়ের তলায় কাঁটা ঝোপ ছাড়া ঘাস পাইনি,—সবই প্রায় বালি। উঃ, কত

বালি ! চার ধারেই বালি আর বালির পাহাড়। এজন্যই বোধহয় পৃথিবী থেকে এ গ্রহটাকে এত লাল লাগে—বালির ওপর সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে কিনা ! আর সেই বুদ্ধিমান্ প্রাণী ? না, এখনও তাদের কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। যদি সত্যি তারা থাকে তবে কিভাবে আমাকে তারা আতিথ্য দেবে তা ভাববার কথা।

হেলমেটের আড়ালে ডক্টর কাঞ্জিলালের মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু গলার স্বরে হাসির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল ঠিকই।

একটু থেমে আবার টেলিভিশনে শব্দ ভেসে এল।

"কি করে এখানে এলাম সে রহস্য সবাই জানেন না। আপনাদের কৌতূহল মেটাবার জন্য সংক্ষেপে বলছি ঃ

আমার ল্যাবরেটরীতে পর পর কয়েকটা ঘটনা লক্ষ্য করে আমার ধারণা হয়েছিল যে উপযুক্ত পরিবেশে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জমাট করে দিয়ে নির্জীব পদার্থের মত সজীব প্রাণীকেও দীর্ঘদিন ধরে 'সংরক্ষিত' করে রাখা যায়। ঐ সময়ে জীবনের সমস্ত লক্ষণই অনির্দিষ্ট কালের জন্য থেমে থাকে, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় না। বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা একে বলি "ডর্ম্যাণ্ট" বা "সুপ্ত" অবস্থা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পোকাকেও আমি এইভাবে বরফের নীচে হাজার হাজার বছর বরফ চাপা পড়ে থাকার পর রোদের তাপে পুনর্জীবন লাভ করতে দেখেছি। নিজের পরীক্ষাগারে গিনিপিগকে ঠাণ্ডায় জমাট করে রেখে দিয়ে ছ' মাস পরে আবার বার করে রোদে রেখে আর সেঁক দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছি। এ যদি সম্ভব হয় তবে মানুষের বেলায়ও তা সম্ভব হবে না কেন ? সেই চেষ্টাই আমি এর পর করতে থাকি এবং নিজেকে এ কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সমর্পণ করি। আমার বন্ধু সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা আমাকে এইভাবে ঠাণ্ডায় "ফ্রীজ্" ক'রে মঙ্গলগ্রহযাত্রী রকেটে পুরে দিয়েছিলেন। এই সাত মাস আমি সজীব থেকেও জীবনের সমস্ত লক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়ে ছিলাম—তাই আমার দেহে কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ আমিও এই সাত মাস 'ডর্ম্যাণ্ট' অবস্থায় কাটিয়েছি।

এখানে এসে রকেট থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে আমি ঐ অবস্থা থেকে মুক্তি পাই। ধীরে ধীরে বাইরের মুক্ত আবহাওয়ায় এসে আমি আবার

চেতনা ফিরে পাই, জীবনের স্পন্দন আবার শুরু হয় আমার। মঙ্গলের আবহাওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ার অনেকটা মিল থাকায় এ ব্যাপার ঘটতে কোন অসুবিধা হয়নি।—বরঞ্চ হয়তো পৃথিবীতে যতটা সময় লাগত তার আগেই আমি চেতনা পেয়েছি। আমার সঙ্গে-আনা অক্সিজেনও আমি ঠাণ্ডায় জমিয়ে শক্ত করে এনেছি। কাজেই অতি স্বল্পপরিসর জায়গায়ও বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন আনা সম্ভব হয়েছে। ধীরে ধীরে আমি তা ব্যবহার করব। এই ক'মাস আমার কোনও খাবারের দরকার হয়নি, এখন থেকে হবে। কিছু জমাট-করা খাবার আমার সঙ্গেই আছে। বেশ কিছুদিন চলে যাবে তাতে। ইতিমধ্যে অবশ্য এখান থেকেও তা কিছু কিছু সংগ্রহের চেষ্টা করে নিতে হবে। না পেলে কি করব এখনও ভাবিনি। তবে পাব বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পৃথিবীতে আমি আবার ফিরতে পারব কিনা জানতে আপনাদের নিশ্চয়ই ঔৎসুক্য হচ্ছে? এখন পর্যন্ত সে রকম কোনও সম্ভাবনা দেখছি না। যদি ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে মঙ্গলে যাতায়াতের কোন উন্নততর ব্যবস্থা সম্ভব হয় তবে হয়তো আমারও ফেরা সম্ভব হতে পারে। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা হয়তো সে ব্যবস্থা একদিন করবেন, তবে আমার জীবনে তা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ, যদি না-ই হয়, আমার বিন্দুমাত্র আপসোস নেই। জীবনের পঁচাত্তর বছর আমি পৃথিবীতে থেকে তার সুখদুঃখ ভোগ করেছি, বাকি ক'টা দিন না হয় মঙ্গলের অভিজ্ঞতা নিয়েই কাটিয়ে দেব। আমার ডায়েরীতে সে অভিজ্ঞতার কথা আমি লিখেও রেখে যাব। তারপর······"

টেলিভিশনের পর্দা আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে এল। সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ডক্টর কাঞ্জিলালের কণ্ঠস্বরও।

———



কুঞ্জবিহারী পাল

খবরটা পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। মর্মাহতও বটে। কাগজে যে বিবরণটা বেরিয়েছে তা থেকে কোনো স্পষ্ট ধারণা করাও আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কী যে করি তা ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলাম না। সেদিনকার কাগজে যা বেরিয়েছে তা সংক্ষেপে এরকম :

খ্যাতনামা পরমাণু-বিজ্ঞানী ডক্টর বিমান চাকলাদারের রহস্যজনক অন্তর্ধান ! গত বুধবার বিকেলে ডক্টর চাকলাদার তাঁর দক্ষিণ শহরতলীর গবেষণাগার থেকে জিপগাড়ী নিয়ে একা বেরিয়ে যান। সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে তাঁকে শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে ডায়মণ্ডহারবার রোডের ধারে এক খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে গাড়ী চালাতে দেখা গেছে। তারপর থেকে তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। অধিক রাত পর্যন্ত গবেষণাগারে ফিরে না আসায় তাঁর সহকারী প্রশান্ত পাত্র এবং ড্রাইভার রামসুজন সিং বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ে। ডক্টর চাকলাদারের মা থাকেন মধ্য কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ীতে। অধিক রাত্রে প্রশান্ত তাঁর কাছে টেলিফোন করে জানতে চায় ডক্টর চাকলাদার সেখানে গেছেন কিনা। কারণ মাঝে মাঝে ডক্টর সেখানে গিয়ে মার কাছে থাকতেন। অবশ্য সেরকম ক্ষেত্রে তিনি সহকারীকে তা আগে থেকেই জানিয়ে যেতেন। কিন্তু সেদিন তিনি সেখানে যান নি। তাঁর মাও বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন।

পরের দিন পুলিসে খবর দেওয়া হয়। পুলিসের তদন্ত চলছে। প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ যে, ডক্টর চাকলাদারকে বেশ কিছুদিন যাবৎ বিশেষ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। অধিকাংশ সময়ই তিনি গবেষণাগারের ভেতরেই কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। সময়মত নাওয়া-খাওয়ার দিকেও তাঁর বিশেষ নজর ছিল না। কোনো বাইরের লোকের সঙ্গে এ' কদিন দেখাসাক্ষাৎও করেন নি। আগে মাঝে মাঝে তিনি তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে বিজ্ঞানকলেজে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যেতেন। কিন্তু গত কিছুদিন যাবৎ তাও যান নি।

এর পর স্টাফ রিপোর্টার চাকলাদারের দীর্ঘ জীবনী এবং তাঁর গবেষণার বিষয়য় বস্তুর বিবরণ দিয়েছেন। পরমাণু বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে অমূল্য গবেষণার কাজ করছিলেন তারও উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান পরমাণু-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যে ডক্টর চাকলাদারের যোগাযোগ ছিল এবং এঁদের কারোর কারোর কাছে যে তিনি দীর্ঘদিন হাতেকলমে কাজ করেছেন সে-সব কথারও উল্লেখ রয়েছে।

সবশেষে জানানো হয়েছে যে, ডক্টর চাকলাদারের গবেষণাগারটি তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে ; বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র, ডায়েরী প্রভৃতি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হবে যথাসময়ে। ওখানে কাউকেই যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সহকারী প্রশান্ত, ড্রাইভার রামসুজন সিং এবং ভৃত্য পাঁচুকে গবেষণাগারের চৌহদ্দির বাইরে অন্য একটি বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হয়েছে অনুসন্ধানকার্যের সুবিধের জন্য।

ডক্টর চাকলাদারের গবেষণাগারে গিয়ে লাভ নেই। তাই একবার তাঁর মার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বয়স্কা বিধবা মহিলা। একমাত্র কীর্তিমান পুত্রের এহেন ব্যাপারে তিনি রীতিমত মুষড়ে পড়েছেন, একেবারে শয্যাশায়ী হতে বড় একটা বাকী নেই। আমাকে দেখে তাঁর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। বিমানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের গভীরতা যে কতখানি তা তাঁর অজানা নয়। প্রকৃতপক্ষে বিমানকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আমি যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি একসময়, তার জন্যে তিনি

আমার কাছে বহুবার বহুভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আমিও তাঁকে সে সময়ে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছি। আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরমাণু-বিজ্ঞানী হিসাবে ডক্টর বিমান চাকলাদার স্বীকৃতি পেয়েছেন, আগামী দু-এক বছরের মধ্যে তাঁর বিশ্বের সেরা সম্মান নোবেল পুরস্কার লাভ করার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। এহেন সময়ে এধরনের রহস্যজনক ঘটনায় চরম আঘাত পাওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই কোনো সান্ত্বনার কথাই আজ আমার মুখ থেকে বেরোল না। আসার সময় তাঁর পায়ে হাত দিতেই তিনি আরও বেশী ভেঙে পড়লেন। শুধু বললেন, আবার খবর নিও।

বিমানের মায়ের কাছ থেকে বেরিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক ঘুরলাম খানিকক্ষণ। বিক্ষিপ্ত মনটাকে কোনোক্রমেই সংযত করতে পারছি না। কিছুক্ষণ বাইরের লোকজন, ট্রামবাস, নানা বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে ঘুরে মন কিছুটা স্থির হল। রাস্তা থেকে সেদিনকার কয়েকখানা বিভিন্ন ধরনের খবরের কাগজ কিনে একসময় বাড়ী ফিরে এলাম।

খবরটা সব কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বেরিয়েছে। কোনো কোনো কাগজে তাঁর ছবিও ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি কাগজ এসম্বন্ধে সম্পাদকীয়ও লিখেছে। সব কটা কাগজ থেকেই খবরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। না, কোথাও কেউ নতুন আলোকপাত করতে পারে নি। 'দৈনিক গ্রামীণ বন্ধু' কাগজের পঞ্চম পৃষ্ঠায় যেখানে ডক্টর চাকলাদারের খবরটা শেষ হয়েছে সেই কলমের শেষে কয়েক লাইনের মতো জায়গা ছিল। সেখানে অতি ছোট, অতিশয় গুরুত্বহীন একটি খবর স্থান পেয়েছে। খবরটি দিয়েছেন ডায়মণ্ডহারবার থেকে কোনো সংবাদদাতা। খবরটির তারিখ কয়েকদিন আগের। খবরটি এরকম : গত কয়েকদিন আগে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীরা সন্ধ্যার পরে দূরের মাঠে এক অদ্ভুত আলোর রোশনাই দেখতে পায়। এর স্থায়িত্বকাল ছিল এক সেকেণ্ডের মতো। আলোর তীব্রতা এত অধিক ছিল যে, সমস্ত এলাকাটা মুহূর্তের মধ্যে আশ্চর্য-জনক আলোর রোশনাইতে ভরে গিয়েছিল। বিদ্যুৎচমক বা ওরকম কিছু হলে যে ধরনের শব্দ শোনা যায়, এ ক্ষেত্রে যে শব্দ শোনা গিয়েছে তার প্রকৃতি ছিল তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।

গুরুত্বহীন তুচ্ছ এক গ্রামীণ খবর! নজরে পড়বার মতো নয়। অন্য কোনো নামকরা কাগজে খবরটি বেরোয়ও নি। কিন্তু মানুষের মনের এমন একটা অবস্থা এক-এক সময় আসে যখন অতি তুচ্ছ ব্যাপারও একটা গভীর দাগ কেটে যায় মনের ওপরে। সামান্য একটা খবর বেরিয়েছে, তেমন কোনো নামকরা কাগজে নয়, তবু কেন জানি না, আমার কাছে খবরটি কোনোক্রমেই তুচ্ছ বলে মনে হল না। ঘুরে-ফিরে আলোর রোশনাই-এর ঘটনাটা আমার মনের ভেতরে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে। কারণ হয়তো এই যে, কয়েক মাস আগে ডক্টর চাকলাদার কথায় কথায় ওই 'আলোর রোশনাই' কথাটিই ব্যবহার করেছিলেন আমার কাছে আমাকে একটা কথা বোঝাতে গিয়ে। কথাটা আজ এই মুহূর্তে কেবলই মনে পড়ছে।

আগেই বলেছি ডক্টর চাকলাদার ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু—অন্তরঙ্গ বন্ধুই বলা চলে। তাঁর সঙ্গে প্রথম কিভাবে সাক্ষাৎ এবং আলাপ হয়েছিল তা আজ এতদিন পরে আমার মনে নেই। তবে প্রথম পরিচয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। সে প্রায় এক যুগ আগের কথা।

আমি ছিলাম সাহিত্যের ছাত্র। ভারত সরকারের একটি বৃত্তি নিয়ে আমি বছর তুই-এর জন্যে ওখানে গিয়েছিলাম তুলনামূলক সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করতে। ওখানেই ডক্টর চাকলাদারের সঙ্গে আমার আলাপ। তিনি তখন ওখানকার একটি নামকরা গবেষণাগারে পরমাণু সম্বন্ধে গবেষণা এবং অধ্যাপনা করছেন। আমার ওখানে যাওয়ার বছর পাঁচেক আগে থেকেই তিনি ওখানে রয়েছেন। তার আগে তিনি প্রায় দশ বছর কাজ করেছেন অ্যাটমিক রিঅ্যাকটর যন্ত্র নিয়ে। যে সময়ের কথা বলছি তখন তিনি আমেরিকায় পরমাণু-বিজ্ঞানী হিসেবে বেশ নামটাম করেছেন, বিজ্ঞানী মহলে তখন তিনি একরকম স্বনামধন্য।

একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আর একজন তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক, কিন্তু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে দেরি হল না। ক্রমে সে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। ক্যালিফোর্নিয়ায় বছরখানেক আমরা একই সঙ্গে একই বাড়ীতে ছিলাম।

ডক্টর চাকলাদার ছিলেন কলকাতার এক ধনী পিতামাতার একমাত্র

সন্তান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এস্-সি পাশ করার পর তিনি ক্যানাডা যান গবেষণা করতে। সেখানে প্রায় দশ বছর কাজ করার পর একটি অধ্যাপকের পদ নিয়ে তিনি আসেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। ইতিমধ্যে অনেকগুলো বড় বড় ডিগ্রি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এককথায় বলা যায়, তিনি তখন একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী। বিদেশে যাওয়ার পর ডক্টর চাকলাদার দু-একবার মাত্র দেশে এসেছেন। একবার এসেছেন পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে। সে সময় তাঁর মা তাঁকে স্থায়ীভাবে দেশে থেকে যাওয়ার জন্যে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ডক্টর চাকলাদার তাতে রাজী হন নি। তিনি বলেছিলেন, দেশে গবেষণার সুযোগ কোথায়? আমি যে বিষয় নিয়ে কাজ করছি তা এদেশে একরকম অসম্ভব।

তার জবাবে তাঁর মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলেছিলেন, তুমি দেশে এসে নিজেই গবেষণাগার তৈরী করে কাজ কর। যত টাকাই লাগুক আমি দেব।

আগেই বলেছি ডক্টর চাকলাদারের পিতা প্রচুর অর্থের মালিক ছিলেন। যে কোনো গবেষণাগার বসাতে কোনো অর্থের অভাব হয়তো হবে না ঠিকই, ডক্টর চাকলাদারও তা জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি রাজী হন নি।

ডক্টর চাকলাদারের দেশে ফিরে না আসার অন্য একটা প্রছন্ন কারণও হয়তো ছিল। তিনি যখন এম. এস্-সি ক্লাসের ছাত্র, তখন তাঁর গায়ে শ্বেতির লক্ষণ দেখা দেয়। পরে তা তাঁর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশে শ্বেতিকে রোগ বলেই মনে করে অনেকে। এর পর থেকেই বিমান চাকলাদার লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করতেন। পরে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তিনি একমাত্র পড়াশুনা করেই দিন কাটিয়ে দিতে থাকেন; ঘরের বাইরে বড় একটা বেরোতেনই না। সে যাই হোক, ক্যানাডা যাওয়ার পরে তাঁর সে ভাবটা কেটে যায় এবং তিনি আলাদা জীবনের আস্বাদ পান। বলতে গেলে তখন থেকেই প্রকৃত বিজ্ঞানীর জীবন কাটাতে থাকেন ডক্টর চাকলাদার।

ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার কাজের মেয়াদ ফুরালে আমি যথাসময়ে বাড়ী

ফিরে আসি। কলকাতায় ডক্টর চাকলাদারের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতোই গ্রহণ করেন। আমার সঙ্গে তার ছেলের অন্তরঙ্গতার কথা তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়। চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি সে-সব খবর রাখতেন। প্রথম দিনই তিনি আমাকে বলেছিলেন, দেখ বাবা, তুমি আমার বিমানের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তুমি আমার ছেলের মতো। সে আমার একমাত্র সন্তান। আমি আর কদিন বল। আমার অবর্তমানে আমার এত টাকা-পয়সা কোনো কাজেই তো লাগবে না।

তিনি থামলেন। কি ভেবে আবার বললেন, জানি, বিমান কোনো দিন বিয়ে থা করবে না। ভগবান ওর মনে যে একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে রেখেছেন সে খবরও তোমার অজানা নয়। তবুও আমার ইচ্ছে সে দেশে ফিরে আসুক, গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করুক। অর্থের অভাবে তাঁর কাজের ব্যাঘাত ঘটবে না।

এর পরের ঘটনা বিস্তারিত বলে লাভ নেই। ডক্টর চাকলাদার দেশে ফিরে এসেছেন। দক্ষিণ শহরতলীতে ওঁদের যে খালি কয়েক বিঘে জমি পড়ে ছিল সেখানে একটি আধুনিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম কিনে আনা হয়েছে। ডক্টর চাকলাদার গভীর মনোনিবেশ সহকারে কাজের মধ্যে ডুবে আছেন। সহকারী প্রশান্ত, ড্রাইভার রামসুজন সিং এবং একটি মাত্র ভৃত্য নিয়ে ডক্টর চাকলাদার তাঁর গবেষণাগারেই থাকেন। মা থাকেন যথারীতি উত্তর কলকাতার নিজ বাড়ীতে। এসব এখন থেকে ছ-সাত বছর আগের কথা।

এত সব পরিবর্তনের মধ্যেও আমার সঙ্গে কিন্তু তাঁর বন্ধুত্ব অটুটই রয়ে গেছে। আমি সাহিত্যের ছাত্র। তাঁর গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে আমার খুব আগ্রহ থাকলেও সে সব সম্বন্ধে আমি তেমন কিছু জানতাম না। তবে সেদিন রাতে ডক্টর চাকলাদারের টেলিফোন পেয়ে পরের রোববার তাঁর গবেষণাগারে হাজির হই। ডক্টর চাকলাদার আমাকে দেখে তো খুবই খুশী। বললেন, এসে পড়েছ সুধীন! তুমি অনেকদিনই আমার গবেষণার বিষয় জানতে চেয়েছ। সত্যিকারের কিছু না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকে সে সম্বন্ধে

তেমন কিছু বলতে চাই নি। আজ তোমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলব বলে ডেকেছি।

বললাম, জানই তো আমি সাহিত্যের ছাত্র। বিজ্ঞানের কোনো জটিল তত্ত্বটত্ত্ব মাথায় ঢুকবে না। খুব সহজভাবেই সবটা বুঝিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ডক্টর চাকলাদার এবং আমার বয়স খুবই কাছাকাছি। আমার পঁয়তাল্লিশ, বিমানের তেতাল্লিশ। উভয়েই অবিবাহিত। কাজেই আমাদের ভেতরে বন্ধুত্বটা 'আপনি'র পর্যায় থেকে বহুদিন আগে থেকেই 'তুমি'র পর্যায়ে এসে গিয়েছিল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া গবেষণাগারেই সেরে নেওয়া হল। ভৃত্য পাঁচু রাঁধে ভালই। খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের বারান্দায় বসে আমরা আলোচনা শুরু করলাম।

বিমান বললেন, তোমাকে বিদঘুটে সব যন্ত্রপাতি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে লাভ নেই। আর এগুলোর বাইরের চেহারার সঙ্গে তোমার তো অনেক দিনের পরিচয়। আজ তোমাকে আমার গবেষণার মূল কথাগুলোই বলছি। তারপরে অবশ্য দু-একটা পরীক্ষা দেখাবো। মূল ব্যাপারটা তাতেই তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই যে চারিদিকে আমরা এত সব পদার্থ দেখছি এরা কত রকম অবস্থায় আছে জান ?

বললাম, জানি বই কি। পদার্থ রয়েছে তিন অবস্থায়—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। এসব তো নীচু ক্লাসের বিজ্ঞান বইতেও লেখা আছে।

বিমান অবাক হয়ে বললেন, তাই না কি ? এখনো এসব লেখা হয় নাকি এদেশের বইগুলোতে ?

জানি, প্রায় বিশ বছর আমেরিকায় কাটিয়েছেন ডক্টর বিমান চাকলাদার। এদেশের পাঠ্য বই সম্বন্ধে তাঁর ধারণা না থাকাটাই স্বাভাবিক। বললাম, যতদূর মনে হয়, আমাদের উঁচুনীচু সব ক্লাসের বইতেই এরকম লেখা হয়।

ডক্টর চাকলাদার বললেন, লেখাটা ভুল, একথা বলছি না। তবে পদার্থের চার অবস্থার কথা লিখলেই ঠিক হত। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা হল প্লাজমা অবস্থা। একটা দেয়াশলাই-এর কাঠি জ্বালালে একটি আগুনের শিখা দেখা যায়। শিখার মধ্যে পদার্থ রয়েছে প্লাজমা অবস্থায়। ওটা কঠিনও নয়,

তরলও নয়, আবার গ্যাসীয়ও নয়। তবে বলতে পার, আমাদের দেশের তুলনায় বিষয়টা আধুনিকই বটে। মাত্র ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী আর্ভিং ল্যাংমুয়ার প্লাজমা কথাটির প্রচলন করেন। বিষয়টা শক্ত মনে হচ্ছে কি ?

বললাম, মোটেই নয়। তবে প্লাজমা অবস্থাটা কি ?

বলছি, শুরু করলেন ডক্টর চাকলাদার, অণু-পরমাণু সম্বন্ধে তোমার ধারণা থাকা স্বাভাবিক। যে কেনো পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় অণু বা মলিকুল। অণুর স্বাধীন অস্তিত্ব আছে—পদার্থের ধর্ম এবং তার অণুর ধর্ম একই। অণু আবার তৈরী হয়েছে পরমাণু দিয়ে। পরমাণুদের অবশ্য স্বাধীন অস্তিত্ব নেই—এরা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে মাত্র। এখন ব্যাপারটা হল এই যে, কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় যে অবস্থাতেই পদার্থ থাকুক না কেন, তা থাকে অণু অবস্থায়। পদার্থের মধ্যে তার সংগঠক অণুগুলো কিন্তু শান্ত ছেলের মত চুপচাপ বসে নেই।—তাদের মধ্যে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি লেগেই আছে। গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে অণুদের মধ্যে চাঞ্চল্য বড় বেশী। প্লাজমা অবস্থায় কিন্তু পদার্থ অণু অবস্থায় থাকেই না।

সাহিত্যের ছুনিয়া নিয়ে আমার কারবার, তবু মন্দ লাগছে না। বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে বললাম, তবে কী অবস্থায় থাকে ?

ডক্টর চাকলাদার হেসে বললেন, সাহিত্যের কারবারীদেরও বিজ্ঞান ভাল লাগে তাহলে ! আনন্দের কথা। যা বলছিলাম, পদার্থ প্লাজমা অবস্থায় কী রূপে থাকে তা বলবার আগে তোমাকে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে একটু বলছি। হাইড্রোজেন ছাড়া যে কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণু গঠিত হয়েছে প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন নামে তিন জাতের মূল কণিকা দিয়ে। প্রোটন পজিটিভ তড়িৎসম্পন্ন, ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত, আর নিউট্রনের মধ্যে কোনো তড়িৎ নেই, অর্থাৎ নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ। ইলেকট্রনের ভর প্রোটনের প্রায় ছুহাজার ভাগের একভাগ, কিন্তু নিউট্রনের ভর প্রোটনের প্রায় সমান। প্রোটন আর ইলেকট্রনের তড়িতের পরিমাণ সমান সমান। এর ফলে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন একসঙ্গে থাকলে উভয়ে উভয়ের তড়িৎকে নষ্ট করে ফেলে, সেরকম অবস্থায় প্রোটন ইলেকট্রন জোড় তড়িৎ-নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। সত্যি কথা বলতে গেলে ঠিক এরকম অবস্থাই ঘটে পরমাণুর মধ্যে।

পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে থাকে নিউক্লিয়াস ; এখানে থাকে প্রোটন আর নিউট্রন। যতগুলো প্রোটন থাকে নিউক্লিয়াসে তার ঠিক সমান সংখ্যক ইলেকট্রন বিভিন্ন পথে ঘুরে বেড়ায় নিউক্লিয়াসের চারদিকে। ফলে সাধারণ অবস্থায় পরমাণুরা তড়িৎ-নিরপেক্ষই থেকে যায়।

আগেই বলেছি, হাইড্রোজেনের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কোনো নিউট্রন নেই। এখানে রয়েছে একটি প্রোটন, আর তার চারদিকে ঘুরছে একটি মাত্র ইলেকট্রন। এক ধরনের হাইড্রোজেন আছে যার নাম ভারী হাইড্রোজেন। এটি হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ। বিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম ডয়টেরিয়াম। এর নিউক্লিয়াসে রয়েছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন, আর চারদিকে ঘুরছে একটি ইলেকট্রন। ডয়টেরিয়াম হাইড্রোজেনের চেয়ে দ্বিগুণ ভারী। এমনিভাবে ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রনের সংখ্যা বেড়ে সবরকম মৌলিক পদার্থের পরমাণু গঠিত হয়েছে।

দীর্ঘ বক্তৃতা শেষে ডক্টর চাকলাদার ফিরে তাকালেন আমার দিকে। বললাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছি। তুমি বলে যাও।

ডক্টর চাকলাদার ভৃত্যকে ডাকলেন। তাকে দুকাপ কফি দিয়ে যেতে বললেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সঙ্গে অন্য কিছু দেবে কিনা। পরমাণু রহস্যের কথা শুনতে ভালই লাগছে। বিষয়টা যে এত সোজা তা প্রকাশ করে বললাম, এখন অন্য কিছুর দরকার নেই।

হো হো করে হেসে উঠলেন ডক্টর চাকলাদার। বললেন, মূল কথাগুলোই তো কেবল বলছি। জটিলতা অনেক আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব বুঝতে গেলে অনেক উচুঁ পর্যায়ের অঙ্ক দরকার হয়।

বললাম, অঙ্ক ছাড়াই তো এসব বেশ বোঝা যায়।

যায় বইকি !—বললেন ডক্টর চাকলাদার, যাক সে কথা, তারপরে শোন।

কফি এসে গিয়েছিল। তাতে চুমুক দিয়ে তিনি আবার শুরু করলেন, এখন ধর, কোনো কারণে যদি পরমাণু থেকে কয়েকটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যায়, তবে তড়িতের ভারসাম্য আর থাকবে না। পরমাণু কণিকাটি তখন পজিটিভ তড়িৎযুক্ত হয়ে পড়বে। এদিকে যে ইলেকট্রনগুলো বেরিয়ে গেল তারা স্বাধীনভাবেও থাকতে পারে বা অন্য কোনো পরমাণুর মধ্যে গিয়ে তাকে

নেগেটিভ তড়িৎসম্পন্নও করতে পারে। পরমাণুর এহেন অবস্থার নাম আয়ন।

পরমাণু গঠনের এ অবস্থাটি মনে রাখলেই পদার্থের প্লাজমা অবস্থার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। প্লাজমা অবস্থায় পদার্থের মধ্যে পজিটিভ তড়িৎযুক্ত আয়ন ও তার সমান সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে ; সঙ্গে অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থার অণুরাও রয়েছে। যেহেতু পজিটিভ এবং নেগেটিভ তড়িতের পরিমাণ সমান সমান, তাই প্লাজমা অবস্থায় পদার্থ তড়িৎ-নিরপেক্ষই থেকে যাবে। আমাদের পরিচিত নিয়ন এবং প্রতিপ্রভ বাতিগুলোর আলোর উৎস হল পদার্থের প্লাজমা অবস্থা। আমাদের পৃথিবীর বুকে পদার্থের প্লাজমা অবস্থার পরিচয় কম পাওয়া গেলেও পৃথিবীর চারদিকে সত্তর থেকে তিনশ কিলোমিটার উঁচুতে যে বায়ুস্তর রয়েছে সেখানে পদার্থ রয়েছে প্লাজমা অবস্থায়। এই বায়ুর স্তরের নাম আয়ন-মণ্ডল।

কফি পান আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভৃত্য এসে খালি কাপ-প্লেট নিয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম কথাগুলো। ডক্টর চাকলাদার বললেন, খুব খারাপ লাগছে কি ?

বললাম, আরে না, না। কিন্তু তোমার কাজটা যে কী তা তো কিছু বলছো না। এ সবই তো অন্যান্য বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার।

ডক্টর চাকলাদার বিজ্ঞানী হলেও মাঝে মাঝে রসিকতা করতে ছাড়েন না। এর পরিচয় আমি আগেও পেয়েছি। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, ধীরে, বন্ধু, ধীরে।

ডক্টর সাধারণতঃ সিগারেট খান না। মাঝে মাঝে সিগারেটে দু-একটা টান দিতে দেখেছি। বললেন, একটা সিগারেট দাও তো। দিলাম, নিজেও একটা ধরালাম। সিগারেটে দু-একটা টান দিয়ে বললেন, তাহলে পদার্থের একটা চিত্র আমরা পেলাম। কিন্তু মুশকিল দেখা দিল বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ আগে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডিরাকের একটি আলোচনাকে ভিত্তি করে। তিনি বললেন, ইলেকট্রনের বিপরীত গুণ সম্পন্ন কোনো কণিকা নিশ্চয়ই কোথাও রয়েছে। এ কণিকার ভর হবে ইলেকট্রনেরই সমান, তবে তড়িৎ হবে পজিটিভ, অর্থাৎ ইলেকট্রনদের বিপরীতধর্মী। কয়েক বছর পরে অবশ্য পাওয়া গেল এ কণিকার সন্ধান। পেলেন পরমাণু-বিজ্ঞানী অ্যাণ্ডারসন।

এ কণিকার নাম দেওয়া হল পজিট্রন বা বিপরীত ইলেকট্রন। পজিট্রন যদি ইলেকট্রনের সংস্পর্শে আসে, তখন কণিকা ও তার বিপরীত কণিকার মিলনে উভয়ই পুড়ে বিলীন হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

ব্যাপারটা বুঝে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। কিন্তু বিস্ময়ের বোধহয় তখনো আমার বাকী ছিল। ডক্টর চাকলাদার বলে চলেছেন, ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক সেগ্রে ও চেম্বারলেন প্রোটনের বিপরীতধর্মী কণিকা আবিষ্কার করে বিজ্ঞান-জগতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তুমি অবাক হবে সুধীন, এই অধ্যাপকদের কাছেই আমি কাজ করেছি দীর্ঘদিন। বিপরীত প্রোটন আবিষ্কারের কয়েক বছর পরেই আমি এঁদের গবেষণাগারে যোগ দিয়েছিলাম।

ডক্টর চাকলাদারকে ভারী উত্তেজিত দেখাচ্ছে। এর পরে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। হয়তো সেদিনের সে সুখস্মৃতির কথা তাঁর মনের ভেতরে এক আলোড়নের তুফান তুলেছে।

—যা বলছিলাম। প্রোটনের সমান ভর কিন্তু বিপরীতধর্মী তড়িৎ অর্থাৎ নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত কণিকাই হল বিপরীত প্রোটন। এরপরে দেখা গেল নিউট্রনেরও বিপরীত কণা আছে। পদার্থের আরও যে সব মৌলিক কণার কথা বিজ্ঞানীদের জানা আছে একে একে তাদেরও বিপরীত কণা আবিষ্কৃত হল। এক কথায় বলা চলে পৃথিবীর যে কোনো পদার্থেরই বিপরীত পদার্থ তৈরি করা আজ সম্ভব। কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছে ভারী হাইড্রোজেনের বিপরীত ভারী হাইড্রোজেন।

কিন্তু তাহলে যে···—মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আমার।

ডক্টর চাকলাদার আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও। বিপরীত পদার্থ যদি তৈরি করা সম্ভব হয় তবে সে সব যখন আমাদের পরিচিত পদার্থের সংস্পর্শে আসবে তখন সেখানে ঘটবে দারুণ বিস্ফোরণ—পদার্থ ধ্বংস হয়ে রূপান্তরিত হবে তা শক্তিতে। সে শক্তির পরিমাণ হবে অসীম—মানুষের কল্পনার বাইরে। আজ পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় না, কয়লার ভাণ্ডারও অফুরন্ত নয়, কিন্তু যদি প্রচুর পরিমাণে বিপরীত পদার্থ তৈরি করা সম্ভব হয়, তবে শক্তির অভাব মিটবে চিরতরে। শিল্প, কৃষি,

এককথায় ভারতবাসী অগণিত জনগণের উন্নত জীবন যাপনের নানা সমস্যা—সব ব্যাপারের সমাধান হয়ে যাবে। আমি সেই চেষ্টাই করছি।

মহাবিশ্বের কোথাও হয়তো এমন জগৎও আছে যার সব কিছুই তৈরি হয়েছে বিপরীত পদার্থ দিয়ে। বিজ্ঞানীরা তার সন্ধানই করে চলেছেন। মহাকাশের সুদূর কোণে হয়তো এক সাধারণ জগৎ এসে হাজির হয়েছে এক বিপরীত জগতের সংস্পর্শে। ব্যস, আর কথা নেই, ঘটবে এক দারুণ বিস্ফোরণ। সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ লক্ষ্য করে বিপরীত জগতের অস্তিত্ব হয়তো একদিন ধরা পড়বে বিজ্ঞানীদের কাছে। এসব অনুসন্ধানের কাজেও পদার্থের প্লাজমা অবস্থার গুরুত্ব অনেকখানি। কিন্তু সে আবার এক আলাদা মহাভারত!

একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না। বললাম, আচ্ছা যদি কোনো বিপরীত দুনিয়া এসে হাজির হয় আমাদের এ পৃথিবীর কাছে, তবে?

কিছু ভাবতে হবে না। একসঙ্গে সব খতম! তবে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার আপাততঃ প্রয়োজন দেখি না। জেমস্ জীন্স্ বলেছেন, দৈবক্রমে একদিন যখন পৃথিবীটার সৃষ্টি, তখন দৈবক্রমেই না হয় এটা খতম হয়ে যাবে অন্য একদিন। তার জন্যে ভাবনার কী আছে!—বললেন ডক্টর চাকলাদার।

এত সহজ একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি শুনে সমস্ত শরীর আমার শিউরে উঠল।

ডক্টর চাকলাদার হঠাৎ বললেন, না, আর নয়। জ্ঞান অনেক দেওয়া হয়েছে। চল, এবারে কিছু দেখবে।

ডক্টর চাকলাদারের সঙ্গে তাঁর বিরাট গবেষণাগারে ঢুকলাম। ছোট বড় নানান যন্ত্রপাতি। বাইরে থেকে এগুলোর চেহারা আমার চেনা। ভেতরে কি আছে না আছে তা আমার মাথায় ঢুকবে না তা ডক্টর চাকলাদারের জানা আছে। সে-সব বাদ দিয়ে তাই তিনি আমাকে একটি যন্ত্রের কাছে নিয়ে গেলেন। যন্ত্রটিতে ক্যামেরার চোখের মত একটা চোখ রয়েছে। সেখানে চোখ রাখতে বলে ডক্টর চাকলাদার একটা সুইচ টিপে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কিছু চোখে পড়ছে?

দেখলাম, খুদে খুদে কতকগুলো আলোকবিন্দু নানাদিকে নানাভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা সীমাবদ্ধ জায়গায় মধ্যে। মাঝে মাঝে কোনো এক জায়গায়

একটি আলোকবিন্দু উজ্জ্বলতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তমধ্যে। হাউইবাজি আকাশে উঠলে যে রকমটি ঘটে অনেকটা সে রকম। একটি আলোর রেখা, তারপরে একটা বিস্ফোরণ ও সব-শেষে তীব্র একঝলক আলো!

ডক্টর চাকলাদার বললেন, আলোর রোশনাইগুলো লক্ষ্য করেছ তো। এ যন্ত্রের মধ্যে প্রোটন ও বিপরীত প্রোটন তৈরি করা হচ্ছে। যখনই একটি বিপরীত প্রোটন তৈরি হয়ে প্রোটনের সংস্পর্শে আসছে, তখনই ঘটছে একটি খুদে বিস্ফোরণ। আলোর রোশনাইগুলো সেই বিস্ফোরণেরই প্রকাশ।

এসব এখন থেকে প্রায় ছয়মাস আগের কথা। কথাগুলো আজ স্পষ্ট মনে পড়ল খবরের কাগজের এই আলোর রোশনাই কথাটির উল্লেখ থেকে। গত কয়েক মাস আমি নানা ঝামেলায় জড়িত ছিলাম বলে ডক্টর চাকলাদারের গবেষণাগারে আমার যাওয়া হয়ে ওঠে নি। তবে টেলিফোনে অনেক সময়ে কথাবার্তা হয়েছে। তাঁর কাজ সম্বন্ধে তেমন কোনো আলোচনা না হলেও এটুকু জেনেছিলাম যে, তিনি তাঁর গবেষণায় সাফল্যলাভের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিশ্ববাসীকে তাক লাগাবার মত কিছু দিতে পারবেন।

নানা রকম চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করতে লাগল। ডক্টর চাকলাদার কি সত্যি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিপরীত পদার্থ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন?

পরের কয়েকদিন খবরের কাগজে নানা ধরনের রিপোর্ট বেরোতে লাগল। কেউ অনুমান করছেন, ডক্টর চাকলাদারের গবেষণার কথা জানতে পেরে কোনো বিদেশী রাষ্ট্র হয়তো তাঁকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। কেউ বলছেন, ঘটনার কয়েকদিন আগে থাকতেই যখন তাঁকে উদ্‌ভ্রান্তের মত দেখাচ্ছিল তখন তিনি হয়তো সংসার ত্যাগ করে হিমালয় অঞ্চলে চিরতরে নির্বাসিত করেছেন নিজেকে। কেউ আবার অন্য ধরণের কথাও বলছেন। তাঁদের ধারণা, ডক্টর চাকলাদার হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মগোপন করেছেন কিছুদিনের জন্যে। তবে ডক্টর চাকলাদারের রহস্যজনক অন্তর্ধান সম্বন্ধে যতরকম অনুমানই খাড়া করা হোক না কেন সঙ্গের জিপগাড়ীখানার কী হল সে-সম্বন্ধে কেউই যুক্তিপূর্ণ কোনো তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারেন নি।

ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ডক্টর চাকলাদারের গবেষণাগারটি তন্ন তন্ন

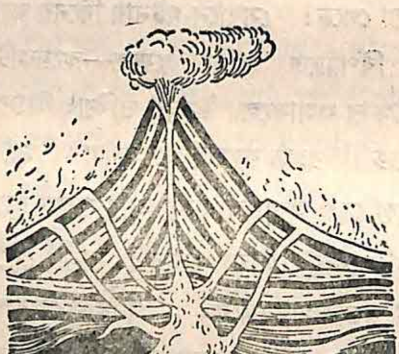
করে পরীক্ষা করা হয়েছে। রহস্য সমাধানের মত কোনো কিছুই হাতে পড়েনি। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল লিখে রাখবার জন্যে যে কাগজপত্তর পাওয়া গেছে তা থেকেও কোনো কিছুর সমাধান হয় নি। নিজের পরিচয় দিয়ে আমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করেছি অনুসন্ধানকার্যের সুবিধার জন্যে। সহকারী প্রশান্ত, ড্রাইভার রামসুজন সিং এবং ভৃত্য পাঁচুও সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। ডক্টর চাকলাদারের অন্তর্ধানের সঙ্গে এদের যে কোনো সংস্রব নেই সে সম্বন্ধে পুলিস কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহ হয়েছেন। বিস্ময়ের কথা, ব্যক্তিগত বড় যে ডায়েরীখানায় ডক্টর চাকলাদার দৈনন্দিন সবকিছুর বিবরণ বিস্তারিত-ভাবে লিখে রাখতেন সেখানা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশান্ত বলছে, ঘটনার আগের দিন দুপুরের পর ডক্টর চাকলাদার তাকে ডেকে বলেছিলেন যে, কয়েকটা বিশেষ ধরনের পরীক্ষা তিনি চালাবেন গবেষণাগারের বাইরে। সঙ্গে কী কী যন্ত্রপাতি নেবেন সে সম্বন্ধে অবশ্য তিনি কিছু বলেন নি। ঘটনার দিন ডক্টর চাকলাদার নিজের হাতেই কয়েকটি ছোটখাটো যন্ত্র গাড়ীতে তুলেছিলেন, প্রশান্ত বা অন্য কারোর সাহায্য নেন নি। টেবিলের ড্রয়ারে ছোট্ট একখানা পকেট-ডায়েরী পাওয়া গেছে। সেখানে ঘটনার দিনের তারিখ এবং তার পরের কয়েকটা তারিখের বিপরীতে লেখা রয়েছে—কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা চালাতে হবে। পরীক্ষার ফলাফলের উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

দিন কেটে যাচ্ছে। রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। ডক্টর চাকলাদারের এই অদ্ভুত অন্তর্ধানের রহস্য ভেদ করা বোধ হয় আর সম্ভব হল না। আমার মনে কিন্তু একটা অদ্ভুত সন্দেহ গোড়া থেকেই দানা বেঁধেছে সেই আলোর রোশনাই-এর খবরটি পড়ার পর থেকেই। আমার কেবলই মনে হয়েছে, এই আলোর রোশনাই-এর সঙ্গে ডক্টর চাকলাদারের অন্তর্ধানের বোধ হয় একটা যোগাযাগ আছে। যে সব বিজ্ঞানী ডক্টর চাকলাদারের গবেষণাগারটি পরীক্ষা করেছেন তাঁদের কাছেও আমি আমার সন্দেহের কথা বলেছি। তাঁরা নামকরা সব বিজ্ঞানী। আমার কথায় তাঁরা কোনো গুরুত্বই দেন নি। সেই তুচ্ছ বা গুরুত্বহীন আলোর রোশনাই-এর খবরের মতই আমার সন্দেহটাও বিজ্ঞানীদের কাছে তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন!

আমার কেবলই মনে হয়েছে, ডক্টর চাকলাদার পর্যাপ্ত পরিমাণে বিপরীত

পদার্থ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এবং তা নিয়ে বিশেষ ধরনের পরীক্ষা করবার জন্যে যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি একাই গিয়েছিলেন ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে দক্ষিণ দিকে। সেখানে কোনো খোলা মাঠে সন্ধ্যার পর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে হয়তো কোনো বিপদ ঘটে থাকবে। ফলে জিপগাড়ী সমেত তিনি তাঁরই সৃষ্টি বিপরীত পদার্থের সংস্পর্শে আসেন। ফল যা হবার তা-ই হয়! বিস্ফোরণ ঘটে—সবকিছু ভস্ম হয়ে পরিণত হয় শক্তিতে। বিজ্ঞানীরা বলবেন, এ যে অসম্ভব! কিন্তু আমি সাহিত্যের ছাত্র। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে কোন্‌টা কতখানি সম্ভব তা আমার পক্ষে বিচার করা অসম্ভব। আমি কল্পনা করতে পারি মাত্র। কিন্তু আমার এ কল্পনা কি নিতান্তই অবাস্তব?

———





অজানা মানুষের সংকেত

সমরজিৎ কর

না—শুধু দুর্ঘটনা বললে সবটা বোধ হয় ভাল করে প্রকাশ করা যায় না। একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সারা পৃথিবীতে যে আতঙ্ক, হতাশা এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোন নজির নেই। সেই সাত দিনে পৃথিবীর সবচাইতে পরাক্রমশালী কয়েকজন নেতা এবং বিজ্ঞানীকে সম্পূর্ণ অভাবিত এক পরিস্থিতির সমাধান খোঁজার জন্য হিমসিম খেতে হয়েছে। পাছে ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ত্রাসের সঞ্চার করে তার জন্য দারুণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে যেন পাগল হওয়ার মত অবস্থা। আর সেই সঙ্গে সম্মুখীন হতে হয়েছে কতকগুলি উদ্ভট ঘটনার। কেন এমন হল, কি ভাবে হল তার সঙ্গে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে সকলে আঁতকে উঠছেন। অথচ সমস্ত কিছুই ঘটে গেল যেন নাটকের মত।

প্রথম সংবাদ এল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরবিশারদ ডঃ জোসেফ ই উইলসনের কাছে। সেদিন রবিবার। সারাদিন বিশ্রামের পর নতুন কতকগুলি তথ্য নিয়ে ডঃ উইলসন আলোচনা করছিলেন তাঁর সহকারী মিঃ হিলের সঙ্গে। ঠিক সেই সময় ঠিক বাজ পড়ার মত তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন এফ. বি. আই অর্থাৎ মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান উপদেষ্টা মিঃ গ্র্যাণ্ট। সারা মুখে তাঁর আতঙ্কের ছাপ। রীতিমত কাঁপছেন তিনি।

—ব্যাপার কি? আপনি সুস্থ তো, মিঃ গ্র্যাণ্ট?

ঠিক অমন ভাবে মিঃ গ্র্যাণ্টকে দেখে বেশ বিচলিত হলেন ডঃ উইলসন।

কোন রকম ভূমিকা না করে মিঃ গ্র্যাণ্ট বললেন, সর্বনাশ! ডঃ উইলসন। আমাদের তিন নম্বর বেস থেকে সমস্ত শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র একের পর এক আকাশের দিকে ছুটতে শুরু করেছে।

যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন ডঃ উইলসন এবং মিঃ হিল তুজনেই।

—তার মানে?—ডঃ উইলসনের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।—তা হলে কি তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল?

—না, না, সে সব কিছুই নয়। ব্যাপারটা রীতিমত গোলমেলে মনে হচ্ছে। —তা হলে?

আসলে যে বেসটির কথা বলা হল সারা পৃথিবীর গোপনীয়তম পাঁচটি বেসের সেটি একটি। সেখানে রাখা প্রত্যেকটি ক্ষেপণাস্ত্রই অত্যন্ত মারাত্মক। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পন্ন একটি করে ইউরেনিয়াম বোমা বসান। তার একটির বিস্ফোরণই চার-পাঁচটা প্রদেশ ধ্বংস করে দিতে পারে। পৃথিবীতে এ অস্ত্রের খবর কেউ রাখে না। এমন কি তাঁদের দেশেও একেবারে ওপর তলার তু'চার জন ছাড়া আর কেউই নয়। একেবারে নিদারুণ পরিস্থিতি ছাড়া সে ক্ষেপণাস্ত্রে হাত দেওয়ার কোন হুকুম ছিল না। আর সে আদেশ যাঁরা জারি করবেন তাঁদের মধ্যে ডঃ উইলসনও একজন।

মিঃ গ্র্যাণ্ট বললেন, আমরা সকলেই খুব ঘাবড়ে গেছি, ডঃ উইলসন। ইতিমধ্যে ওপর মহলের কাছেও কথাটা পৌঁছেছে। কেপ হর্ণের যে গুপ্ত স্থান থেকে ঐ বেসটির ওপর নজর রাখার কথা সেখানকার কর্তা মিঃ ব্রাইট খুব গোপনীয় সংকেতে খবরটা যে পাঠিয়েছেন সে কথা প্রথম আপনিই জানলেন। টেলিফোনে বা বেতারে বিশদ কোন কথাই তিনি বলতে পারেন নি। তাতে গোপনীয়তা ভাঙ্গার সম্ভাবনা ছিল।

—মিঃ ব্রাইটের সংকেতটা কি ছিল সেটাই আগে বলুন, মিঃ গ্র্যাণ্ট।

—এক্‌স জিরো! শুধু এইটুকু।

—একটা দেশকে ধ্বংস করার জন্য এইটুকুই কি যথেষ্ট নয়, মিঃ গ্র্যাণ্ট? ···বিস্ময় এবং হতাশায় ভেঙ্গে পড়বেন যেন ডঃ উইলসন।—আপনারা কখন সংবাদ পান?

—মাত্র পনের মিনিট আগে। আসল ঘটনা প্রথম ধরা পড়ে ঘণ্টা-দুই হল। মিঃ ব্রাইট আপনার সঙ্গেই প্রথম যোগাযোগ করতে বলেন।

—বলেন কি ? একেবারে দুটি ঘণ্টা পার হয়ে গেছে ? আপনার দপ্তরে এ ব্যাপারে আর কোন নতুন তথ্য পেয়েছেন কি ? উত্তেজনার কম্পন ডঃ উইলসনের কণ্ঠে। টেনে টেনে কথা বললেন তিনি, আমার জিজ্ঞাসা, আপনার দপ্তরের কোন এজেন্টের কাছ থেকে পৃথিবীর কোথাও কোন বড় রকমের দুর্ঘটনার সংবাদ কি আপনার কাছে পৌঁছেছে ?

—না।

—না ? একটা বিরাট ভূখণ্ডের লোপ, প্রচণ্ড সমুদ্রঝড় অথবা ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে কয়েক কোটি মানুষের জীবনহানি—আপনি বলতে চান এখনও পর্যন্ত তার কিছুই ঘটে নি ?

—আমরা জানি না।

—আশ্চর্য !

আর তার পরক্ষণেই একের পর এক টেলিফোন আসতে লাগল ডঃ উইলসনের কাছে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান মিঃ গোল্ড রীতিমত আতঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, সর্বনাশ, ডঃ উইলসন। এই মাত্র কেপ কেনেডি থেকে আমাকে জানাল, আমাদের তিন নম্বর রকেট বেসের দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের নাকি কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এখানকার টেলিভিশন প্লেটে— !

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে ডঃ উইলসন বললেন, জানি। উত্তেজনার কোন কারণ নেই। সব ঠিক আছে—বলেই কানেকসন কেটে দিলেন। মনে মনে বললেন, টেলিফোনে এ সমস্ত কথার কোন মানে হয় ? পরক্ষণেই প্রেসিডেন্টের সমর-উপদেষ্টার কাছ থেকে কল এল। ভদ্রলোক এত ঘাবড়ে গেছেন যে প্রথম দিকে ভালভাবে কথাই বলতে পারলেন না।

ডঃ উইলসন বললেন, জানি, আপনি কি বলতে চান। প্রেসিডেন্টকে বলুন সব ঠিক আছে। এ নেহাৎ যান্ত্রিক গোলযোগ।

কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা চলে না ! ডঃ উইলসন মিঃ হিলকে বললেন মিঃ গোল্ডের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করতে। কেপ হর্নে রওনা হতে হবে তক্ষুণি। তিনি যেন রকেট-প্লেনটির ব্যবস্থা করেন। আর মিঃ

গ্র্যান্টকে বললেন, সমস্ত ব্যাপারের গোপনীয়তা যেন এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়। টেলিফোনে বা রেডিওফোনে এ সব নিয়ে কেউ যেন আলোচনা না করেন।

এরপর কেপ কেনেডির এয়ার বেসের পথে পর পর কয়েকটি মোটর গাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটে গেল। ইতিমধ্যে এফ. বি. আই থেকে খবর দেওয়া হয়েছিল এয়ার বেসে যেন কোন সাধারণ কর্মচারী না থাকে। তখন প্রায় রাত নটা। চারদিকের আলো নিভিয়ে দেওয়ায় অন্ধকারে পুরু একটি আস্তরণ সমস্ত কিছু গ্রাস করে ফেলেছিল। ঠিক কারা যে এলেন, কোথায় গেলেন কেউ বুঝতে পারল না। ক্ষেপণাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ ডঃ উইলসন, মিঃ গোল্ড এবং মিঃ হিল এসে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাইলট ক্যাপটেন হেড স্থইচ টিপতেই মাটির নিচের কক্ষ থেকে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল আমেরিকার সবচাইতে দ্রুতগামী প্লেন এক্স-টেন। রকেট ইঞ্জিন চালিত এই প্লেনটির গতিবেগ ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল। এটি খাড়া উপরে উঠে সত্তর হাজার ফুট উঁচু দিয়ে ছুটতে পারে। এই প্লেনে কেপ কেনেডি থেকে কেপ হর্ণের সেই দ্বীপ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ মাত্র দেড় ঘণ্টায় পাড়ি দিলেন তাঁরা। এলেন দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে শেষ প্রান্তে একটি পাহাড়ে দ্বীপ পয়েন্ট ফোর-এ।

লোকালয়-বিহীন, নির্জন দ্বীপ এই পয়েন্ট ফোর। চারদিকে পাঁচিলের মত পাহাড়ে ঘেরা। মাঝখানে তার একটি উপত্যকা। দৈর্ঘ্যে এবং বিস্তারে প্রায় সিকি মাইল। তার অর্ধেক জুড়ে চাঁদোয়ার মত খাটান অত্যন্ত শক্তিশালী একটি রেডিও টেলিস্কোপ আকাশরহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সদা সন্ত্রস্ত। বাকি অর্ধেক জুড়ে খান চারেক একতলা বাড়ী—নানা রকম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা।

ডঃ উইলসনের দল পৌঁছতেই মিঃ ব্রাইট পাগলের মত বলতে লাগলেন, আমার মাথা এবার খারাপ হয়ে যাবে স্যার। আবার, আবার একটি রকেট আকাশে ওড়ার জন্য তৈরী হচ্ছে।

—তার মানে ? এ সব কি যাচ্ছেতাই কাণ্ড !···ডঃ উইলসন বিচলিত হন।

মিঃ ব্রাইটের সঙ্গে সকলে ছুটলেন কনট্রোল রুমে। ক্ষেপণাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে জন পঁচিশেক কর্মী—নির্বাক পুতুলের মত একটি বিরাট ভিসন-প্লেটের দিকে চেয়ে। মিঃ ব্রাইট বললেন, ঐ দেখুন !

সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখতে লাগলেন। প্লেটের পাশের একটি

লালবাতি জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল। অর্থাৎ ক্ষেপণাস্ত্রটিকে সংকেতে নির্দেশ দেওয়া হল প্রস্তুত হতে। তারপরই প্লেটের ওপর ভেসে উঠল আলো আঁধারি ছবি। প্রায় একশ' মাইল দূরের মূল ঘাঁটির একটি পাহাড়ে ভূগর্ভের কক্ষের দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। পরক্ষণেই বিরাট একটি ক্ষেপণাস্ত্রের ডগা যেন মাটির বুক ফুঁড়ে ওপরে উঠতে লাগল—আরও—আরও। শেষে সবটা। অবশেষে সেটি বের হয়ে লাঞ্চিং প্যাড অর্থাৎ যেখান থেকে আকাশে উড়বে তার ওপর এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

উত্তেজিত! সকলে হতভম্ব!!

ডঃ উইলসন দ্রুত জরুরী নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রের সম্মুখে এলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার হতাশা। মনে পড়ল কেপ কেনেডি থেকে নির্দেশ না পেলে নিয়ন্ত্রক যন্ত্র কোন কাজই করবে না। সেখান থেকে বেতার সংকেতে এই যন্ত্রের একটি চাবি খুলে দেওয়া হয়। তখনই মিঃ ব্রাইটের পক্ষে সম্ভব রকেটগুলির নিয়ন্ত্রণ করা। নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

তা হলে কি কোন যন্ত্র বিকল হয়ে গেল?···কথা বললেন মিঃ গোল্ড।

খেঁকিয়ে উঠলেন ডঃ উইলসন, মশায়, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ঐ বিপজ্জনক জিনিসগুলির জন্য আমাদের যে কি পরিমাণ পরিশ্রম এবং নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয়েছে, সে কথা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। অমন একটা কিছু ঘটলে আমরা ঘরে বসেই বুঝতে পারতাম।

মাত্র এক মিনিট! টেলিভিশন পর্দায় পরিষ্কার দেখা গেল বিস্ফোরণ। তারপর ক্ষেপণাস্ত্রটি ছুটে চলল আকাশের বুকে। কিন্তু কোথায়ই বা যাচ্ছে? কার নির্দেশেই বা গেল? এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার জন্য সরাসরি টেলিফোন বা রেডিওফোন কারুরই তো সাহায্য নেওয়া চলে না। সে ভাবে যোগাযোগ করতে গেলে যদি কোন কিছু ফাঁস হয়ে পড়ে? দিশেহারার মত ছুটোছুটি করতে লাগলেন ডঃ উইলসন। মিঃ হিল এবং মিঃ গোল্ডের উপদেশে সকলে আবার ফিরে গেলেন ওয়াশিংটনে। মিঃ ব্রাইটকে বলে গেলেন, তিনি যেন একটু মাথা ঠাণ্ডা হয়ে ব্যাপারটা একটু লক্ষ্য করেন।

পরদিন সাইবেরিয়ার একটি গহন অঞ্চল থেকে কিন্তু একটি গোপন সংবাদ সরবরাহ করলেন গোয়েন্দা দপ্তর। জানালেন, একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেছে

এখানে। ব্যাপারটা খুব গোপনে চেপে রাখা হয়েছে। মস্কোর হোমরাচোমরা মহল রীতিমত উদ্বেগের সঙ্গে ছটফট করছে। এমন একটা কিছু ঘটেছে যার জন্যে এঁদের চর যুক্তরাষ্ট্রে তৎপরতার সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে!

তৃতীয় দিন সংবাদপত্রে একটি আলোড়নকারী সংবাদ প্রকাশিত হল। বৃটেনের অত্যন্ত শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপে নাকি মহাকাশে পর পর আটটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ধরা পড়েছে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন মানমন্দিরের জনৈক দায়িত্বশীল বিশেষজ্ঞ। কারুর নাম প্রকাশ না করে সংবাদদাতা জানাচ্ছেন: গত তিন দিনে মহাকাশের অনেক উর্ধ্বে পর পর আটটি বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। বিস্ফোরণগুলি ঘটেছে মহাকাশের বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রতি ক্ষেত্রে অন্ততঃ হাজার পাঁচেক মাল উর্ধ্বাকাশে। অনুমান করা যাচ্ছে, মহাকাশ থেকে কোন নক্ষত্র বিচূর্ণ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভবতঃ তারই কয়েকটি টুকরো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে এসে পড়ে। জনৈক রুশ বিশেষজ্ঞকে এ ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করতে বললে তিনি নীরব থাকেন। জনৈক মার্কিন বৈজ্ঞানিক বলেছেন, তেমন কিছু নয়। এ নেহাৎ একটি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। কিন্তু প্রখ্যাত ইটালিয়ান জ্যোতির্বিদ নার্কি মনে করেন, মহাকাশে সম্ভবতঃ কেউ পারমাণবিক গবেষণা চালাচ্ছেন।

এই সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীল জগতে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি হল। জনসাধারণের মধ্যে অবশ্য এটা রোমাঞ্চকর সংবাদ ছাড়া আর কোনও জটিল কিছু বলে বিবেচিত হল না। চতুর্থ দিনে সমস্ত আবহাওয়া অফিসে শুরু হল চাঞ্চল্য। এক একটি আবহাওয়া অফিস এক এক রকমের অদ্ভুত সংবাদ প্রকাশ করতে শুরু করল। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া মরুভূমির ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড আগুনের ঝড় বয়ে যাওয়ায় অগণিত মানুষের জীবনহানি হল। এদিকে দক্ষিণ মেরুর কয়েকজন গবেষণাকারী বিজ্ঞানী খবর পাঠালেন সেখানে নাকি হঠাৎ বরফ গলতে শুরু করেছে! আর সত্যি সত্যিই যদি নিয়মিত বরফ গলা চলতে থাকে তা হলে সমস্ত পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরে বন্যা দেখা দেবে। সে বন্যা মহাদেশকেও গ্রাস করতে পারে!

সবচাইতে ভয়ঙ্কর খবর পাঠালেন আফ্রিকার একজন জীব-বিজ্ঞানী। নাম মিঃ কাসেম। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-গবেষণা-কেন্দ্রের অধ্যক্ষকে তিনি

জানালেনঃ তাজ্জব ব্যাপার! জানোয়ারগুলি হঠাৎ ক্ষেপে উঠল কেন? একদল হাতী, একদল গণ্ডার এবং একদল বেবুন নাকি হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে গভীর জঙ্গল ছেড়ে ব্রেজভিলের কাছে একটি শহরে হানা দেয়। তারা জনতা ছত্রভঙ্গ করে। খাবারের দোকানে গিয়ে বেছে বেছে ভাল ভাল খাবার খেয়ে নেয়। বেবুনরা নাকি একেবারে অন্দর মহলে ঢুকে কর্তাদের বিছানা দখল করে কিছুক্ষণ ঘুমিয়েও নেয়। হাতীর দল রেল স্টেশনে এসে গাড়ীতে চড়ার চেষ্টা করেছিল। ফলে স্টেশন ফাঁকা হয়ে যায়। গণ্ডারের দল দলবদ্ধভাবে বিকট শব্দ করতে করতে ঘোরাফেরা করে। তবে মজার ব্যাপার তারা কোন মানুষ বা জীবজন্তুর কোন ক্ষতি করে নি। মিঃ কাসেম শেষে রসিকতা করে বলেছেন, এই জানোয়ারগুলিও কি শেষে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে শুরু করে দিল? নানা রকম আজগুবি সংবাদে কাগজের পাতা ভর্তি হতে লাগল। তার কোনটা রীতিমত ভয়ের। কোনটা কৌতুকের। পাঁচদিনের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত বেতার কেন্দ্র, পত্র-পত্রিকার একমাত্র আলোচ্য বিষয় এ ছাড়া আর কিছুই রইল না।

কিন্তু ছয় দিনের দিন ফ্রান্সের জনৈক বৈজ্ঞানিক একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে বললেন, এই সমস্ত ব্যাপারের কারণ মহাকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ। ইটালীর বৈজ্ঞানিককে সমর্থন করে তিনি জানালেন, আমার বিশ্বাস মহাকাশে পৃথিবীর কোন কোন শক্তি আবার পরমাণু বোমা নিয়ে মেতে উঠেছেন। আর তা যদি হয়, আমরা তাদের নিন্দা করছি। তবে এই ইস্তাহার প্রকাশের পর নানা দেশের নেতারা নানা রকম মন্তব্য করলেও দুটি দেশ কিন্তু সম্পূর্ণ নীরব হয়ে রইল—তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া।

তবু মন্তব্য না করলেও একটা জিনিস সকলে লক্ষ্য করল। মার্কিন এবং রুশ গোয়ান্দার তৎপরতা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। পৃথিবীর যত্র তত্র তারা কিসের উদ্দেশ্যে যেন পাঁতি পাঁতি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এফ. বি. আই-এর খবরঃ রুশ নেতারা নাওয়া খাওয়া ছেড়ে এখন সাইবেরিয়ায় এবং কাস্পিয়ান সাগরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এদিকে ডঃ উইলসনের দল একবার কেপ কেনেডি আর একবার কেপ হর্ণ করেই সারা। মাঝে মাঝে ওয়াশিংটনে জরুরী বৈঠক বসছে। নানা রকমের

আশঙ্কা! অস্ট্রেলিয়ার সেই আগুনের ঝড়ের কারণ জানার জন্য বিশেষজ্ঞ পাঠান হয়েছিল। তাঁরা ফিরে এসে জানালেন, ওটা আকাশের ঐ পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্যই ঘটেছে। আফ্রিকা থেকে মিঃ কাসেমও জানালেন, একটি অদ্ভুব অনুভূতি তিনিও নাকি পাচ্ছেন। কঙ্গোর বাতাসে পারমাণবিক প্রভাব পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ সেই প্রভাবই জানোয়ারগুলির ওপর অমন তাজ্জব কাণ্ড ঘটিয়েছিল। তবে এ তাঁর অনুমান।

তা হলে? ডঃ উইলসনের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে মহাকাশে যাকে তারকাখণ্ডের বিস্ফোরণ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তা সেই ক্ষেপণাস্ত্রবাহিত পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে পাঁচ হাজার মাইল উর্ধ্বাকাশে তাদের চালিয়েই বা কে নিয়ে গেল? আর সবচাইতে বড় প্রশ্ন তাঁদের তো মাত্র চারটে ক্ষেপণাস্ত্র অমন ভৌতিকভাবে পাড়ি দিয়েছে। আর বাকি চারটে এল কোথা থেকে? তা হলে কি—? মিঃ গ্র্যান্ট বললেন, নির্ঘাৎ এ চারটে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র। তা না হয়ে যায়-ই না।

আর সে কথা যে সত্য তা তার পরের দিন ভোরেই প্রমাণিত হয়ে গেল। পরদিন অর্থাৎ সপ্তম দিনে সোভিয়েত পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন বিশেষ দূত দেখা করতে এলেন মিঃ গোল্ডের সঙ্গে। দূতের হাতে জরুরী বার্তা। সেটি পড়েই লাফিয়ে উঠলেন মিঃ গোল্ড। রীতিমত ভড়কে গিয়ে পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা। সেই দূত মিঃ নিকোলাই পপোভিচ বললেন, মাফ করবেন, স্যার। আপনাদেরও যে অমন কাণ্ড ঘটেছে এর প্রমাণ পেয়েই আমাদের বড় কর্তা এই চিঠিটি আপনাকে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা এখন এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যাতে করে আপনারা এবং আমরা উভয়েই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। এর হাত থেকে রেহাই না পেলে বলতে পারেন, কি করে পৃথিবীতে আমরা মাথা উঁচু করে চলব? আমাদের বৈজ্ঞানিকরা জানিয়েছেন আপাততঃ এখানেই শেষ নয়। আমরা সাবাড় হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এমন চলবে।

মিঃ গোল্ড চিঠিটি পড়ে গুম হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরই শুরু হল ব্যস্ততা। মিঃ গ্র্যান্ট শুধু বিরক্তির চোখে মিঃ নিকোলাই-এর দিকে তাকালেন। বোঝা গেল এফ. বি. আই. রাশিয়া থেকে যে তথ্যের কিছুই সংগ্রহ করতে পারে নি, রুশরা তাঁদের দেশ থেকে সে তথ্য পাচার করতে পেরেছে। শুরু হল মার্কিন এবং কয়েকজন রুশ বৈজ্ঞানিক ও পদস্থ কর্মচারীর ছোটাছুটি।

কিন্তু কে জানত, কেপ হর্ণ থেকে মিঃ ব্রাইটই তার সমাধান এনে দেবেন? সেদিন তুপুরের দিকে মিঃ ব্রাইটের চোখে পড়ল ইলেক্‌ট্রোনিক ব্রেনটির ওপরকার লাল আলোটা হঠাৎ যেন নিভে গেল। এ কি রকম হল? সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলেন চার নম্বর রকেট ঘাঁটির সঙ্গে। দেখলেন রকেট নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রটি আবার অকেজো হয়ে গেছে। পাগলের মত ছুটে গেলেন তিনি জরুরী বার্তা পাঠানর যন্ত্রের কাছে। সহকারীদের বললেন, আপনারা লক্ষ্য করুন রকেট ঘাঁটিতে কোন সংকেত আসে কিনা। এরপর মিঃ ব্রাইট কেপ কেনেডিতে ডঃ উইলসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা জানাতেই রকেট-প্লেনে চড়ে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়লেন তাঁরা। ঠিক একই সময়ে সাইবেরিয়ার কোন একটি রকেট-ঘাঁটি থেকেও ঐ একই রকমের সংবাদ এল। কোথায় গেল গোপনীয়তা! প্রাণের ভয়ে সমস্ত ভুলে গিয়ে উভয় দেশই আসন্ন বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে সচেষ্ট হল।

বিকেলের দিকে সাইবেরিয়া থেকে ডঃ উইলসনকে জানান হল, অদ্ভুত একটি বেতার-সংকেত ধরা পড়েছে। ঐ সংকেত হুবহু তাঁদেরই মত। অর্থাৎ যে সংকেত দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র চালনা করা হয়—তাই। কিন্তু ডঃ উইলসনও ততক্ষণ ঐ একই রকমের সংকেত ধরতে পেলেন। অর্থাৎ যে সংকেত দিয়ে তাঁদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলি চালনা করা যায় তাই। লক্ষ্য করলেন, ধীরে ধীরে সমস্ত যন্ত্র থেমে গেল। আর সেই সঙ্গে আর একটি ক্ষেপণাস্ত্র যেন ওড়ার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

কিন্তু কে এই বার্তা প্রেরক?

হঠাৎ মাথার মধ্যে একটি বুদ্ধি গজাল ডঃ উইলসনের। দৌড়ে গিয়ে তিনি রকেট-প্লেনটিতে চেপে নিজেই সেটিকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের সেই গুপ্ত দ্বীপে। পৌঁছতে কয়েক মিনিট সময় লাগল। শুরু হল জীবন-মৃত্যুর লড়াই। একে একে সমস্ত বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ছিন্ন করলেন তিনি। যে রাডার যন্ত্রটি অজ্ঞাত বেতার-সংকেত ধরে ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে চালাচ্ছিল ছোট ছোট ডিনামাইট দিয়ে চূর্ণ করে ফেললেন তাদের। এবার নিশ্চিন্ত। আর কেউ পারবে না তাদের সচল করতে।

নিজের গড়া জিনিস নিজের হাতে ধ্বংস করে পাগলের মত ফিরে এলেন

ডঃ উইলসন। ইতিমধ্যে খবর এল আর একটি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র নাকি আকাশের দিকে চলে গেছে। মিঃ নিকোলাই খবর শুনে তো কেঁদেই ফেললেন।

আর ঠিক সেই সময়ে মিঃ ব্রাইট একটি কাগজ হাতে করে ছুটতে ছুটতে এলেন মিঃ গোল্ডের কাছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, এ দেখুন, কি সর্বনেশে কাণ্ড। মিঃ গোল্ড দেখলেন সেটি একটি জরুরী বেতার বার্তা। পরিষ্কার ইংরেজীতে লেখা : "পৃথিবীবাসীরা, আমরা আপনাদের কোনও কোনও ভাষা এবং বেতার-সংকেত সংগ্রহ করতে পেরেছি। আমরাই এখানে বসে চেয়েছিলাম আপনাদের ভয়ঙ্কর অস্ত্রগুলি ধ্বংস করে ফেলতে যা আপনারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করার জন্য রেখেছেন। তাই এখান থেকেই আপনাদের যন্ত্রপাতির নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নষ্ট করে কৌশলে ঐ সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র মহাশূন্যে এনে ধ্বংস করেছি। ঐ বিপদ্‌জনক জিনিসগুলি ধ্বংস করে আপনাদের সঙ্গে আমরা গিয়ে মিশব, এটাই আমাদের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আপাততঃ তা হল না। ইতি—মহাকাশের কোন এক গ্রহের অধিবাসীরা।"

বার্তাটি পড়েই চমকে উঠলেন ডঃ উইলসন। বিস্ময়ে তাঁর হাত কাঁপতে লাগল। এটা কোথায় পেলেন আপনি?

মিঃ ব্রাইট বললেন, এই মাত্র আমাদের বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে আমাদেরই সংকেতের মাধ্যমে এই বার্তাটি ধরা পড়েছে।

মিঃ হিলের এবার চমকের পালা।—ঠিক এমন ধরণের সংকেত তো দুচারটে আমিই ধরতে পেরেছিলাম। সেদিন বলেও ছিলাম আপনাকে, মহাকাশ থেকে আমরা কাদের যেন বেতার-সংকেত ধরতে পারছি!

মিঃ নিকোলাই বললেন, তা হলে কি—?

মিঃ গোল্ড শুধু ছোট্ট একটি মন্তব্য করলেন : এবার থেকে ব্যাপারটার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। বোঝা যাচ্ছে মহাজগতে আমাদের থেকেও চালাক প্রাণী বাস করে, যারা আমাদের প্রতিটি খবর সংগ্রহ করতে পেরেছে। এমন কি আমাদের ভাষাও!

সকলেই মিঃ ব্রাইটের দেওয়া ছোট্ট কাগজটির দিকে চেয়ে রইলেন।

———



ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী

তিনজন চলেছে। পাহাড় আর জঙ্গল। রাস্তা নেই। সঙ্গের সামান্য বিস্কুট আর শুকনো ফলে কয়দিনই বা চলবে? তাই মরিয়া হয়ে ওরা চলেছে।

ওরা এসেছিল নাগা পাহাড় অঞ্চলে নাগাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে। টুয়েনসাং থেকে ওরা চলেছিল টাকুর দিকে। কিন্তু হঠাৎ ফিজোর অনুচরদের চোখে পড়ে যাওয়াতেই ঘটেছে বিভ্রাট। ভারতীয়দের দেখেই নাগারা ওদের আক্রমণ করেছিল। কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ওরা জঙ্গলের দিকে পালিয়েছিল। কিন্তু কোথায় যে ওরা এখন এসে পড়েছে জানে না। কেউ হিসাব করে বলছে ওরা যাচ্ছে ব্রহ্মদেশের দিকে, কেউ বা বলছে সম্ভবতঃ ফেলুরগড় চামগিরি। এসব জায়গা কাছেই। মোটের উপর অচেনা জায়গায় জঙ্গলে রাস্তা হারালে যা হয় তাই হয়েছে।

সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে—দিনের আলো ধোঁয়াটে হয়ে আসছে। ওদের মনেও ভয় এসে যাচ্ছে। এই জঙ্গলে কি করে রাত কাটান যাবে। বাঘ-ভালুক নির্ঘাৎ সাবড়ে দেবে। নর-মাংসের ভোজ পেলে কি নাগা পাহাড়ের বাঘ খাতির করবে! নাগারাই মাথা কেটে নিতে পারলে আনন্দ পায়—বাঘের ত' কথাই নেই। তাই দিন থাকতে ওরা একটা গুহার খোঁজ করতে লাগল। মিললও একটা। আশ্বস্ত হল ওরা যাহোক রাত্রের একটা আশ্রয় মিলল।

গুহার ভিতর ঢুকতে গিয়েই ওরা থমকে দাঁড়াল। ওটা কি ! কোনোও জানোয়ার নাকি ! পিছিয়ে এলো। তারপর ভাল করে দেখবার জন্য টর্চ জ্বেলে গুহার দিকে ফেলল। কত দিনের জমাট আঁধার সরে গেল আলোর রশ্মি পেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে গুহার ভিতর থেকে মানুষের কাতর কণ্ঠ ভেসে এল। জড়ান জড়ান ইংরেজী ভাষায় কে যেন বলল—কে ওখানে ? যদি মানুষ হও বাঁচাও আমাকে।

আরে বলে কি ! এ ত' মানুষ—ইংরেজ নাকি ! এল কোথা থেকে ? টর্চটা জ্বেলে গুহার ভিতর ঢুকে ওরা দেখল কিম্ভূত-কিমাকার পোশাক পরা একজন মানুষ মাটিতে পড়ে আছে।

ওরা জিজ্ঞাসা করল—তোমার কি সাহায্য দরকার ?

লোকটা বলল—কিছু খাবার আর একটু জল।

যদিও ওদের খাবার আর জল ছিল সামান্যই, তবুও একটা মানুষ চোখের সামনে না খেয়ে মরবে এ ত' দেখা যায় না। ওরা কয়েকখানা বিস্কুট আর একটু শুকনো ফল ওকে দিল। লোকটা খুব আগ্রহের সঙ্গে-ওগুলো খেল—তারপর জল খেল। পরে আস্তে আস্তে উঠে বসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—এটা কোন্ সাল ?

ওরা বলল—১৯৬৪।

লোকটা চমকে উঠল—ওরে বাপরে ! কিন্তু এটা কোন্ জায়গা ? তোমরা কোথাকার লোক ?

ওরা বলল—এটা ভারতের একটা অংশ। নাগাপাহাড়।

লোকটা যেন হতাশ হল—তা হলে আর দেশে যাওয়া হল না !

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লোকটা বলল—তোমরা ত' ইংরেজী জান, ভারত ইংরেজের অধীন।

ওরা বলল—না ভারত এখন আর ইংরেজের অধীন নেই—স্বাধীন হয়েছে।

—তাই নাকি ! তবে কি ইংরেজ যুদ্ধে হেরে গেছে ?

ওরা বলল—না জার্মানী হেরে গেছে। ভারত যুদ্ধের শেষে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সে ত' অনেক দিনের কথা। তুমি ইংরেজ অথচ এসব কিছুই জান না।

লোকটা বিষণ্ণ হাসি হাসল ; বলল—জানব কি করে ? আমি ১৯৪৩ সাল থেকে পৃথিবীর খবর কিছুই জানি না। যাক্ আমি আর বাঁচব

না এটা ঠিক। ভগবানের দয়ায় যখন তোমাদের সাথে দেখা হয়েই গেল—তখন তোমাদের কাছেই সব কথা বলে যাই। তোমাদের হাত দিয়েই আমার আত্মীয়-স্বজনেরা সব সংবাদ পাবে। আমি আমার বাড়ীর ঠিকানাও বুঝি ভুলে গেছি!

ওরা বলল—তুমি কোথা থেকে আসছ?

লোকটি বলল—দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও আমায়।

ওরা বলল—আচ্ছা ভেবে নাও। আমরা একটু আগুন জ্বালি, তারপর তুমি বল আমরা সব লিখে নিচ্ছি।

টর্চের সাহায্যে ওরা কিছু শুকনো পাতা আর ডাল যোগাড় করে সিগারেট লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালল। তারপর সেই আলোতে নোট বই আর পেন্সিল নিয়ে বসল।

লোকটা আস্তে আস্তে বলতে লাগল—ওদের মধ্যে একজন সর্টহ্যাণ্ডে লিখতে লাগল।

—আমার নাম ম্যাথুস—আমি ইংরেজ। সেই ১৯৪৩ সালের কথা। ভীষণ যুদ্ধ চলেছে ইংরেজ ও জার্মানে। আমি ছিলাম আমাদের ডুবো জাহাজ শার্ক-এর নাবিক। আট্‌লান্টিক মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছিলাম। পোর্টল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে আমাদের একটা গুপ্ত ঘাঁটি ছিল জার্মান জাহাজগুলোর চলাচল লক্ষ্য করবার জন্য। ছোট্ট দ্বীপ। কয়েক-দিনের জন্য খাবার জিনিস সমেত সামান্য কয়েকজন সৈন্য এখানে নামিয়ে দেওয়া হত—আবার অল্প কিছুদিন পরেই ওদের নিয়ে গিয়ে অন্য দল রাখা হত।

এমনই একটা দল নিয়ে আমাদের ডুবো জাহাজ চলেছিল। সাবমেরিনে আমরা মোট আঠার জন লোক ছিলাম। জাহাজ তখন জলের উপর দিয়েই চলছিল। হঠাৎ মাথার উপরে এরোপ্লেনের ঘর্ঘর শব্দ। এখানে জার্মান এরোপ্লেন আসাটা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। এরোপ্লেনখানা নেমে এল খানিকটা, তারপর বোমা ফেলার উপক্রম করতেই আমরা ডুব দিলাম। কিন্তু কি বিপদ! সামান্য এগোতেই ভীষণ আওয়াজ। জল তোলপাড়। শার্ক যেন ওলটপালট হয়ে যেতে লাগল। বুঝলাম ডেপ্‌থ্‌ চার্জ হচ্ছে।

প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে গেল। সাবমেরিনের দুই পাশে যে চাপ দেওয়া বাতাস রাখবার ট্যাঙ্ক থাকে—অর্থাৎ যার ভেতরে চাপ দেওয়া বাতাস

ঢুকিয়ে সাবমেরিন ভাসিয়ে তোলা হয়, আবার ডোবানোর সময় ইচ্ছামত চাপ কমিয়ে ডোবানো হয়, অথবা যতটুকু ইচ্ছা জলের নীচে রাখা যায়, সেই ট্যাঙ্কের এক পাশে বোমার আঘাত লেগে ভেঙ্গে গেল। ব্যস্। সঙ্গে সঙ্গে হুড়হুড় করে জল ঢুকে গেল ট্যাঙ্কে। সাবমেরিনের ভেসে উঠবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল। শার্ক চলল গভীর সমুদ্রের তলার দিকে। আতঙ্কে আমাদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সর্বনাশ! সাবমেরিনের কোনও কলকব্জা খারাপ না হলেও ট্যাঙ্কের মধ্যে জল ঢুকে যে পরিমাণ ভারী হয়ে গেছে তাতে সমুদ্রের তলায় গিয়ে ঠেকবেই। তারপর আমাদের উপায়! ঐ বন্ধ সাবমেরিনের ভিতর যতক্ষণ আমাদের আঠার জনের উপযোগী অক্সিজেন থাকবে ততক্ষণ বাঁচব, এরপর দম বন্ধ হয়ে একসঙ্গে সবাই মরে যাব। মরণের চেহারা যেন সামনা-সামনি দেখতে পেলাম আমরা। যুদ্ধে এসেছি, আমাদের জীবন-মরণ সরু সূতোয় ঝুলছে। মরবার জন্য প্রস্তুত হয়েই যুদ্ধে আসে সবাই। কিন্তু এ কেমন মরা—বিকট আর বীভৎস!

সাবমেরিনের মধ্যে এক রকম সরঞ্জাম থাকে। মুখে ডুবুরির মত মুখোশ এঁটে—চাপ দেওয়া বাতাস ভরা লোহার বল পায়ের সঙ্গে বেঁধে সমুদ্রের উপরে ভেসে উঠবার ব্যবস্থা ওগুলো। ব্যাপারটা যদিও বিপজ্জনক তবু নিশ্চিত মৃত্যুর চেয়ে বিপদের ঝুঁকি নেওয়াও ভাল—এই মনে করেই এই ব্যবস্থা।

ক্যাপ্টেন ম্যাক বললেন—এই জাহাজে মাত্র পনেরোটা এই ভাসবার সরঞ্জাম আছে। কারণ, পনেরোজনেরই থাকবার কথা ছিল—শেষ মুহূর্তে আমরা আঠারজন হয়ে গেছি। কাজেই আমাদের মধ্যে পনেরোজন এই সুযোগ নিতে পারবে। বাকী তিনজনকে সাবমেরিনেই থাকতে হবে।

সবার চোখ ছলছল করে উঠল।

কে কে থাকবে বল। আমি ক্যাপ্টেন। এই জাহাজের সবার জীবনের দায়িত্ব আমার হাতে—কাজেই আমাকে থাকতেই হচ্ছে—আর দুইজনে এগিয়ে এস।—বললেন ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেনের পরের দুইজন অফিসার এগিয়ে গেলেন। আমি বললাম—ক্যাপ্টেন ম্যাক, আপনার জীবনের দাম অনেক বেশী। আপনি বেঁচে থাকলে দেশের অনেক উপকার হবে। আমি একজন

সাধারণ সৈনিক, আমার জীবনের বিনিময়ে যদি আপনি রক্ষা পান সেই অনেক ভাল।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন ম্যাক এবং আরও চৌদ্দজন আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে ভাসবার সরঞ্জাম নিয়ে সাবমেরিন থেকে বেড়িয়ে পড়ল—আমরা তিনজন থেকে গেলাম সাবমেরিনের ভিতর। অবশ্য পনেরোজন চলে যাওয়াতে আমাদের বাঁচবার সময়টা বেড়ে গেল। কারণ খাবার এবং অক্সিজেন দুইই কম খরচ হবে।

ক্রমে সাবমেরিন সমুদ্রের তলায় গিয়ে ঠেকল। নিশ্চিত মরণের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের হঠাৎ যেন কেমন মজা লাগল। আমরা দুইজনে গান গাইতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে ও'নীল ছিল ধার্মিক, সে বাইবেল পড়তে আরম্ভ করল।

সমুদ্রের তলায় ত' দিনও নেই, রাত্রিও নেই। শুধু জাহাজের কাচের জানালা দিয়ে বাইরে যাওয়া আলোতে সমুদ্রের জল নড়ছে দেখা গেল। অত গভীরে বিশেষ জলজন্তু নেই, কাজেই বেশী জলজন্তুও দেখা যাচ্ছিল না। আমরা শুকনো ফল ও বিস্কুট খেতে খেতে আলোচনা করতে লাগলাম যে আমরা মরব না, কোনও একটা অদ্ভুত উপায়ে ঠিক বেঁচে যাব। ও'নীল বলল—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আমরা বেঁচেই যাব।

সমুদ্রের নীচে কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে হল কাচের জানালার কাছে কিছু নড়াচড়া করছে। তারপর আর একটু পরে আরও দু' একটা কি যেন দেখা গেল। আকৃতি বোঝা না গেলেও মনে হল বেশ কয়েকটি জন্তু ঘোরাঘুরি করছে। তারপরই জাহাজ দুলে উঠল এবং মনে হল যেন চলছে। কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে আমরা হতভম্বের মত বসে রইলাম।

আমাদের সাবমেরিন বোধ হয় অনেকক্ষণ চলল—তারপর হঠাৎ এক ধাক্কা খেয়ে ঘস্ করে থেমে গেল। সে থামার বেগটা এত প্রবল যে আমরা হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম। আবার টাল সামলে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন মনে হল জানালা দিয়ে পড়া আলোতে যে জলের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল তা যেন দেখা যাচ্ছে না। তার বদলে শুধুই অন্ধকার। বুঝতেই পারলাম না যে সাবমেরিনটাকে জল থেকে তোলা হল, না কি জলেই রইল। এর মধ্যেই জানালার উপর দুপদাপ আওয়াজ হচ্ছে। কিছু যেন নড়াচড়া করছে। সাহস করে একবার দরজা খোলা

হল। দরজা খুলতেই একটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হাওয়া ভিতরে ঢুকল। তাতে কেমন যেন ভ্যাপসা গন্ধ।

ও'নীল চেঁচিয়ে উঠল—জয় ভগবান, আমরা জল থেকে ডাঙ্গায় এসেছি।

আমি বললাম—তা ত' বুঝলাম, কিন্তু এ কোন্ দেশের ডাঙ্গা? এত অন্ধকার কেন?

আস্তে আস্তে আমরা বাইরেটা দেখতে চেষ্টা করলাম। দেখি মানুষের মত হাত-পা মাথাওয়ালা কয়েকটি জন্তু আমাদের দিকে আসছে। তাদের দেহ অদ্ভুত আবরণে ঢাকা। হাতে পায়ে ব্যাঙের হাত-পায়ের মত আবরণ লাগানো। ওরা আসছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর চোখের সামনে হাত উঁচু করে মানুষের মত গলায় কি যেন বলতে লাগল। ওদের ভাষা না বুঝতে পারলেও এটুকু বুঝলাম যে ওরা মানুষ।

ও'নীল বলল—আমরা আফ্রিকায় এসেছি। আর এখন বোধ হয় রাত্রি, তাই এত অন্ধকার।

আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণা ছিল না। শুধু রোমাঞ্চকর উপন্যাসে পড়েছি আফ্রিকার কোনও কোনও অঞ্চলে কিম্ভূত চেহারার মানুষ বাস করে। তারা দুনিয়ার সব খায়—এমন কি মানুষের মাংসও খায়।

ও'নীল বলল—ওরা যখন আমাদের উদ্ধার করেছে তখন ওদের সঙ্গে যাওয়াই উচিত। এখন যদি ওদের সাথে ঝগড়া করি তবে শেষ পর্যন্ত কি ভাল হবে? আমরা ত' সাবমেরিনের মধ্যে চিরকাল থাকতে পারব না। তাছাড়া খাদ্যও ত' দরকার হবে। দেখাই যাক না ওরা কি করে।

তিনজনে তিনটি টমি গান আর টোটা নিয়ে বিস্কুটের থলিটা কাঁধে ফেলে আস্তে আস্তে ডেকের উপরে দাঁড়ালাম।

ওরা সংখ্যায় তখন জন দশেক ছিল—ওরা আমাদের নেমে আসবার জন্য সঙ্কেত করতে লাগল। আমরা একটুখানি পরামর্শ করে নেমে এলাম। ওরা তখন আমাদের হাত ধরল এবং চলতে সঙ্কেত করল। কিন্তু আমরা চলব কি করে! সামনে গাঢ় অন্ধকার, পায়ের তলায় কেমন কাদা-মাখান ছোট ছোট নুড়ি। চলাই দায়। আমরা তখন চেঁচিয়ে বলতে শুরু করলাম—তোমরা দাঁড়াও, জাহাজে আলো আছে, নিয়ে আসি।

ওরা কোনও কথা গ্রাহ্য না করে আমাদের টানতে টানতে নিয়ে চলল।

এইবার ও'নীল বলল—না হে, এটা আফ্রিকা নয়। আফ্রিকার মানুষেরা যাই হোক তারা মানুষ। মানুষ কি করে এত অন্ধকারে পথ চলে? এরা ত' দেখছি অন্ধকারে সুন্দর চলছে। এরা বোধ হয় অন্য দেশের অধিবাসী।

আমি বললাম—পৃথিবীতে কোন্ দেশ আছে যা সব সময়ে অন্ধকার থাকে? তবে কি এটা মেরুপ্রদেশ? মেরুপ্রদেশে শুনি ছয়মাস অন্ধকার।

জন বলল—সেখানে ত' সবকিছু শুনেছি বরফে ঢাকা। এখানে বরফ কোথায়? তাছাড়া আমরা যে পোশাকে আছি তাতে ঠাণ্ডায় জমে যাবার কথা।

আমরা কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না এটা কোন্ দেশ।

ওদের হাত ধরে চলি আর অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ি। চলি আর পড়ি। আমাদের জামা-পোশাক সব কাদামাখা হয়ে গেল। দেখা ত' যায় না কিছুই। শুধু ভিজে জবজবে হয়ে যাওয়াতেই বুঝলাম যে কাদামাখা হচ্ছে। কিন্তু ওরা কেউ পড়ছে না। এমনি করে কতদূর নিয়ে গেল কে জানে! তারপর অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গাতে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণে আমাদের চোখে আঁধারটা কিছুটা সরে আসছিল। কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম না কিছুই। উপর দিকে তাকিয়েও তারা ভরা আকাশ দেখতে পেলাম না। আমাদের ওখানে রেখে ওরা চলে গেল। আমরা পরস্পরকে ডাকাডাকি করে হাতড়ে হাতড়ে এক জায়গায় এলাম। তারপর মাটির উপরে বসলাম।

ও'নীল বলল—সাবমেরিনে ফেরবার উপায় কি? আলো একটা হাতে করেই বেরোন উচিত ছিল।

জন বলল—ওরা গেল কোথায়? যাক্, রাত্রিটা পোহাক, তারপর যা হয় করা যাবে।

হাতড়ে হাতড়ে বিস্কুটের থলি থেকে বিস্কুট বের করে খেতে লাগলাম আমরা। তারপর মাটির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জাগলাম দেখি সেই অন্ধকার রাত্রি শেষ হয়নি।

ও'নীল বলল—ম্যাথুস, জেগে আছ?

আমি বললাম—হ্যাঁ।

ও'নীল বলল—দেখেছ কি দীর্ঘ রাত্রি। শেষ হয় না। তারপর বুঝলাম ও রাত্রির আর শেষ নেই! চিররাত্রির দেশ সেটা। আমাদের হাতে

রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ি ছিল। তাই থেকে বুঝলাম, আঠার ঘণ্টার উপর আমরা সাবমেরিন থেকে নেমেছি। সেই বিদ্‌ঘুটে অন্ধকারে বসে বসে আমাদের মহা বিরক্তি ধরে গেল।

এতক্ষণে আঁধার কিছুটা চোখে সয়ে এসেছিল—আবছা-আবছা বুঝলাম যে ওরা ক'জন এসে দাঁড়াল। ওরা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কিসব বোঝাল—তারপর হাত ধরে নিয়ে চলল। আবার এক জায়গায় নিয়ে এসে দাঁড় করাল।

এইবার ওদের একজন আমাদের চোখে একরকমের ঠুলি পরিয়ে দিল—তাতে আমরা কিছুটা দেখতে পারলাম। স্পষ্ট না হলেও ওদের চেহারা বেশ বোঝা গেল। একেবারে মানুষ। সেই ব্যাঙের মত জোড়া জোড়া হাত-পাওয়ালা পোশাক নেই। তবে শ্যাওলাজাতীয় পোশাক দিয়ে দেহ ঢাকা। পায়ে শুকনো কোঁচকানো কিসের চামড়ার জুতোর মত কিছু। কিন্তু বিরাট লম্বা-চওড়া দেহ। যেখানে আনল আমাদের, সেখানটা অপেক্ষাকৃত শুকনো। কাদা নেই। একটা উঁচু জায়গার উপরে আরও বেশী লম্বা-চওড়া দুজন বসেছিল। তারা আমাদের দিকে চেয়ে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে লাগল। আমরাও ইংরেজীতে অনেক কিছুই বললাম। মোটের উপর চেঁচামেচি হল বিস্তর, কিন্তু কথা বোঝা গেল না কিছুই।

এর পরের ঘটনা হল—আমরা ঐ অন্ধকারের দেশে রয়ে গেলাম। কতদিন কে জানে। ক্রমে ক্রমে আমরা ঐ ঠুলি ছাড়াই চোখে দেখতে পেতাম।

তোমরা বোধ হয় জান, আমাদের চোখে যেখানটায় দেখবার জিনিসের ছায়া পড়ে তার নাম হল রেটিনা। ঐ রেটিনাতে দুই রকমের কোষ আছে। এক হল রড (Rod), অন্য হল কোন (Cone)। রড দরকার হয় অন্ধকারে দেখতে—কোন দরকার হয় আলোতে দেখতে। মানুষের চোখে কোন সক্রিয় বলে মানুষ আলোতে দেখতে পায়। তবে রডও থাকে বলে অল্প অন্ধকারেও দেখতে পায়। পাখীদের চোখে রড নেই বলে ওরা অন্ধকারে দেখতেই পায় না। আবার পেঁচাদের চোখে খালি রড থাকে বলে আলোতে কিছুই দেখতে পায় না। প্রকৃতির বিধানে অন্ধকারে থাকতে থাকতে আমাদের চোখের রডগুলোও বোধ হয় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাই ঐ অন্ধকারে আমরা বেশ দেখতে শুরু করলাম।

আমাদের সাবমেরিনটাকে ওরা ভেঙ্গে ফেলেছিল। কাজেই ওটার

কাছে আর যেতে পারিনি। ওখানে থাকতে থাকতে আমরা ক্রমে ওদের ভাষাও বুঝতে লাগলাম। ওদের অদ্ভুত খাবারই খেতে লাগলাম। আগুন ওদেশে নেই। ওদেশে আলো নেই বলে ওদের চোখে বোধ হয় কোন ছিল না। তাই আলোতে ওরা দেখতে পেত না। মাঝে মাঝে ওরা দল বেধে একটা কিম্ভূত পোশাক পরে চলে যেত। কিছুদূর গেলেই সমুদ্রের তলা। সাঁতার দেবার সুবিধার জন্য ব্যাঙের মত জোড়া হাত-পাওয়ালা একরকম দস্তানা আর মোজা পরত। মুখে থাকত এক রকমের মুখোশ—ঐ মুখোশের বলে ওরা অনেকক্ষণ সমুদ্রের জলের মধ্যে থাকতে পারত। মুখোশ কি দিয়ে যে তৈরী তা আমরা বুঝতে পারিনি। অনেকক্ষণ পরে বিরাট বিরাট সামুদ্রিক মাছ এবং জন্তু ধরে আনত। তারপর পাথর এবং সামুদ্রিক জন্তুর হাড়ের তৈরী ধারাল অস্ত্র দিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে ওটাকে ফেলে দিত একটা কুণ্ডে।

ঐ কুণ্ডটা ছিল বিচিত্র। ওর লোনা জল সব সময়ে গরম থাকত। ঠিক টগবগে গরম না হলেও হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। অনেকক্ষণ পর ঐ মাছ বা জন্তুটাকে তুলে আনত—তারপর ঐসব বড় চেহারার সর্দার দুইজন কেটে কেটে সকলকে ভাগ করে দিত। তাই খেত সকলে। এছাড়া সামুদ্রিক শ্যাওলাও সিদ্ধ করে খেত।

যাই হোক ঐ কুণ্ডে সিদ্ধ মাংস নরম এবং লবণাক্ত হত। প্রথম প্রথম ঘেন্না হলেও আমরাও পরে ঐ খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ঐ রাজ্যে বড় জোর একশত মানুষ বল, কি দৈত্য বল আছে। স্ত্রী পুরুষ দুই-ই আছে। ঘরবাড়ী গাছপালা কিছুই নেই। আকাশও নেই মাথার উপরে। সামান্য কয়েক ফুট—ধর পঁচিশ কি ত্রিশ ফুট উপরেই ছাদের মত। গোটা রাজ্য জুড়ে ঐরকম পাথর আর মাটির ছাদ। পায়ের তলাতেও তাই। শুধু সমুদ্রের তলার কাছে ভেজা ভেজা কাদামাটি। এক অদ্ভুত অন্ধকারের রাজত্ব।

কতদিন যে আমরা ওখানে ছিলাম জানি না।

ও'নীল বলত—এটা পাতালপুরী নিশ্চয়ই, কারণ সমুদ্রের তলায় যখন এসেছি। কিন্তু পাতাল হলেও বাতাস আসবার রাস্তা নিশ্চয়ই আছে। না হলে ওরা বা আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি কি করে? কাজেই বাতাস যখন আছে তখন নিশ্চয়ই উপরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগও আছে। চল আমরা চেষ্টা করি—ঐ রাস্তা খুঁজে নিয়ে এ দেশ থেকে বেরিয়ে যাই।

প্রস্তাবটা সকলেরই মনোমত হল। তারপর থেকে আমরা এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলাম বাতাসের রাস্তার খোঁজে। কিন্তু খুঁজে আর পাই না।

একদিন কথায় কথায় ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা এখানে বাতাস আসে কোন্ দিক দিয়ে ?

ওরা ত' আশ্চর্য হয়ে গেল ! বাতাস ! সেটা আবার কি ?

বুঝলাম যে বাইরের পৃথিবীর সাথে ওদের পরিচয় নেই, কাজেই বাতাস কি তা বোঝা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরা ইংরেজী ভাষায় বাতাস বলছি, তা ওদের বোঝান যাবেই বা কি করে।

এখানে এত কম লোক কেন ?—জিজ্ঞাসা করাতে ওরা একদিন বলল যে মাঝে মাঝে ছাদ ভেঙ্গে পড়ে, আর বহু লোক মারা যায়, তাই ওদের লোকসংখ্যা কমে যাচ্ছে।

যাই হোক আমাদের খোঁজার বিরাম রইল না। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একদিন সন্ধান মিলল। একটা জায়গায় এসে দেখা গেল উপরের দিকে সুড়ঙ্গের মত কি দেখা যাচ্ছে—আর সেখান দিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বোঝা গেল এই জায়গা দিয়েই উপরের পৃথিবী থেকে বাতাস আসছে। কিন্তু সুড়ঙ্গের মধ্যে উঠি কি করে ?

ও'নীল বল—দাঁড়াও, আমি একটু উপরে উঠে দেখি, কি করা যায়।

ও'নীল সুড়ঙ্গের গা থেকে বের হওয়া পাথরগুলোর উপরে পা রেখে উপরেরগুলো ধরে ধরে সন্তর্পণে উপরে উঠতে লাগল। হঠাৎ ও'নীলের আর্ত চিৎকারে উপরে তাকিয়ে দেখি, ও দু'হাতে একটা পাথর ধরে ঝুলছে আর ওর পায়ের তলায় একটা বিরাট পাথর নড়বড়ে হয়ে খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তারপরেই একটা বিরাট পাথর দুম্ করে খসে পড়ল—আর সেই ফুটো দিয়ে বেগে জল বেরিয়ে আসতে লাগল—আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল গুরু-গুরু শব্দ। দেখতে দেখতে শব্দ বিকট হয়ে উঠল। তারপর যেন প্রলয় শুরু হল—দুম্-দুম্ শব্দে ছাদ ভেঙ্গে পড়তে লাগল ; লোকের আর্তনাদ, আসন্ন মৃত্যুর হতাশা সব মিলিয়ে আমরা দুজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করব কোন্ দিকে যাব ভাবছি এমন সময় জলের তোড় এসে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলল। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে ভাসিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সাবমেরিনের নাবিক আমি, সাঁতারে সুদক্ষ। কোথায় যাচ্ছি জানি না, শুধু সমস্ত চেতনা দিয়ে

নিজেকে ভাসিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সঙ্গীরা কোথায় গেল খোঁজ নেওয়াও যেমন সম্ভব ছিল না, ভাববারও অবকাশ ছিল না। কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে জানি না—হঠাৎ আলোর চমকে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এতদিনকার অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখ আলোতে এমন ধাঁধিয়ে গেল যে বুঝতেই পারলাম না কি হল বা কোথায় এসেছি। পরে বুঝতে পারলাম যে জঙ্গল-ঘেরা এক ঝরণার মুখে এসে পড়েছি। হাত-পা আমার অবশ হয়ে গেছে—কোনও রকমে হাতড়ে হাতড়ে ঝরণার কিনারায় এসে পড়লাম। অবশের মত পড়ে থাকলেও মনে হতে লাগল যে, পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছি। তারপর পাঁচ-ছয়দিন ধরে অনাহারে শুধু জল খেয়ে এই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি পথ পাবার আশায়। ভাগ্যক্রমে তোমাদের সাথে দেখা হল। আমি আর বাঁচব না। জলের তোড়ে পাথরের আঘাত খেয়ে খেয়ে আমার সর্বাঙ্গে ঘা হয়ে গেছে। সেগুলোতে পচন ধরে গেছে। সর্বাঙ্গে ব্যথা—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, দেহ ক্ষীণ হয়ে গেছে। যাই হোক তোমরা ইংলণ্ডের কোনও কাগজে এই ঘটনা প্রকাশ করো। আমার বাড়ীর লোকেরা তাহলে বুঝতে পারবে কি ঘটনা হয়েছিল। দুঃখ রইল জীবনে ফিরেও দেশে যেতে পারলাম না। আর একটা দুঃখ এই, ওরা যে কোথা থেকে এসে সমুদ্রের অভ্যন্তরে বসবাসের এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল সেটাও অস্পষ্টই রয়ে গেল। এই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ভেসে এলামই বা কি ভাবে তাও এক মস্ত রহস্য!···

ভারতীয় তিনজন তার কথা নিবিষ্ট হয়ে শুনল; ওকে সান্ত্বনা দিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ওকে বাঁচাতে পারল না। ওরা তাকে ঝরণার পাশে পাথর চাপা দিয়ে কবর দিল। তারপর ফিরে এসে ওরা সম্পূর্ণ ঘটনা ইংলণ্ডে জানিয়ে দিল।

লণ্ডন জার্নালে ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে এই ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ ঘটনা পড়ে ম্যাথুসের স্ত্রী-পুত্র ভারতে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করেছিল। ওর দেহটা ইংলণ্ডে নেবার ইচ্ছাও করেছিল, কিন্তু সে জায়গা খুঁজে বের করা ওদের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি।



খোলার আগে রেজিষ্টার্ড খামখানা আরেকবার দেখে নিল সুব্রত। খামে কলকাতার নামী ব্যাঙ্কের ঠিকানা। ওই ব্যাঙ্কের সঙ্গে তো তার কোনো লেনদেন নেই। খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করলো। ছোট্ট চিঠি। 'ডাঃ কে, এম, ভঞ্জের একটি লকারের ব্যাপারে অবিলম্বে আপনার ব্যাঙ্কে আসা বিশেষ প্রয়োজন।' চিঠির তারিখ ২০শে মার্চ। অর্থাৎ, ঠিক দশ দিন আগের।

টেবিলের ওপর চিঠিখানা মেলে ধরে আবার পড়লো সুব্রত। ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক। ডাঃ ভঞ্জের লকারের সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে ওরা তো ডাঃ ভঞ্জের ডাক শোনার জন্যই এতদিন আগ্রহে দিন গুনেছে। এই কি সেই ডাক! বন্ধু অশোকের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে বেরিয়ে পড়লো সুব্রত। ঘড়িতে বেলা এগারোটা।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন ডাঃ ভঞ্জ। বছর পনেরো আগে সুব্রতদের পাড়াতেই থাকতেন। ইস্কুলে বাবার সহপাঠী ছিলেন। কলেজে ছাড়াছাড়ি হয়। ডাঃ ভঞ্জ ভর্ত্তি হলেন মেডিক্যাল কলেজে। সুব্রতর বাবা প্রেসিডেন্সিতে।

ছেলেবেলায় পেটের অসুখ হলে বাবা ওকে নিয়ে যেতেন ডাঃ ভঞ্জের

চেম্বারে। পেটে খোঁচা দিয়ে ডাঃ ভঞ্জ বলতেন, 'অ্যাঁ! আবার পেট খারাপ। পেটটা এবার কাটতেই হবে। নইলে অসুখ সারবে না দেখছি।'

ভয়ে সিঁটিয়ে যেতো সুব্রত। বাবার সঙ্গে আর যেতেই চাইতো না ওর চেম্বারে।

বাবা মারা যাবার পরই হঠাৎ পাড়া ছেড়ে উধাও হলেন ডাঃ ভঞ্জ। পৈত্রিক বাড়ি বিক্রি করে পাড়ি দিলেন বিদেশে। তারপর বছর দশেক আর কোনো খবরই ছিল না তাঁর। ইতিমধ্যে মারা গেছেন সুব্রতর বাবা। সুব্রতও ভুলে গিয়েছিল ডাঃ ভঞ্জের কথা।

এক রবিবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গেছে সুব্রত আর অশোক। বছর তিনেক আগের কথা। রিকুইজিশনের বই নিয়ে টেবিলে বসে খাতা খুলে অশোকের সঙ্গে নোট নিচ্ছিল সুব্রত। হঠাৎ কানের কাছে শুনলো, 'সুব্রত না?'

মুখ ফিরিয়ে দেখলো সুব্রত। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। বেশ পাকানো চেহারা। দাড়ি-গোঁফ কামানো শক্ত মুখ। ব্যাক-ব্রাশ করা কাঁচা-পাকা চুল। বয়স ষাটের দিকেই। পুরু লেন্সের ওদিকে হাসি হাসি চোখ, 'কী চিনতে পারছ না তো?'

সত্যিই চিনতে পারেনি সুব্রত।

মুখ টিপে হাসলেন ভদ্রলোক, 'আজকালকার ইয়াংম্যানদের মেমারি বড় পুওর!'

'না, মানে···।' লজ্জা পায় সুব্রত।

'পেটের অসুখ সেরেছে তোমার? না কি পেট কাটতে হবে?'

পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সুব্রতর মুখ। 'কাকাবাবু, আপনি···।'

'তবু ভালো, চিনতে পেরেছ। তারপর, কী করছ এখন?'

'ন্যাশনাল মেডিক্যালে পড়ছি। সেকেণ্ড ইয়ার।' 'আই সী!' ডাঃ ভঞ্জের দু-চোখে বিস্ময় আর খুশির আলো, 'ইউ আর গোয়িং টু বি এ ডক্টর। বাঃ!' সুব্রতর কাঁধে হাত রাখলেন, 'খুব খুশি হয়েছি, দেশের জন্যে আমরা আরো ডাক্তার চাই। কী পড়ছ ওটা?'

সুব্রতর বইটা কাছে টেনে নিলেন, 'বাইয়োলজির বই দেখছি। কোন্ সাবজেক্ট পড়ছ?'

'এম্বামিং।'

'আই সী!' বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন ডাঃ ভঞ্জ। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'মমি সম্বন্ধে ইন্টারেস্ট আছে তোমাদের? যদি দরকার হয়, এই সাবজেক্টে আমার কাছে হেল্প পাবে।'

বই মুড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ডাঃ ভঞ্জ। বললেন 'চলো ক্যানটিনে, চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে। এখানে অসুবিধে।'

অশোককে দেখিয়ে উঠে দাঁড়ালো সুব্রত। বললো, 'কাকাবাবু, এ আমার সহপাঠী এবং বন্ধু, অশোক দাশ।'

অশোকের হাতটা টেনে নিলেন ডাঃ ভঞ্জ, 'খুশি হলুম।'

ক্যানটিনে নিজেই কুপন কেটে তিনজনের চা-টোস্ট নিয়ে এলেন। ওদের আপত্তি শুনলেন না। হেসে বললেন, 'কী মনে করেছ, বুড়ো হয়ে গেছি! জানো, এখন আমি ইয়াংম্যান অফ্ সিক্সটি টু।'

চায়ে চুমুক দিয়ে সুব্রত জিজ্ঞেস করলো, 'বিদেশ থেকে ফিরলেন কবে, কাকাবাবু?'

'বছর পাঁচেক আগে।'

'এখনো প্র্যাকটিশ করেন?'

'না, না। রিসার্চ করি নিজের ল্যাবরেটরিতে।'

'কী নিয়ে রিসার্চ করেন?' জিজ্ঞাসা করলো অশোক।

'ঐ যে তোমরা পড়ছিলে—এম্‌বামিং। অ্যানসিয়েণ্ট থেকে মর্ডান মেথড অফ এম্‌বামিং।'

নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো ওরা দু-জন। এম্‌বামিং নিয়ে এদেশে কেউ রিসার্চ করতে পারে তা ভাবতে পারেনি ওরা। বিশেষ করে একজন সিনিয়র ডাক্তার।

'খুব অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে।' পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে এগিয়ে ধরলেন ডাঃ ভঞ্জ, 'কোন্নগরে বাড়ি করেছি। নতুন অনেক কিছু দেখতে পাবে।'

কার্ড হাতে নিয়ে সুব্রত বললো, 'নিশ্চই যাবো। কবে যাবো বলুন?'

উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ ভঞ্জ। মনে মনে হিসেব করে বললেন, 'সামনের রোববারের আগে কিন্তু তোমাদের সময় দিতে পারবো না।'

'বেশ তো, রোববার বিকেলেই যাবো আপনার ল্যাবরেটরিতে।'

ডাঃ ভঞ্জের কোন্নগরের ল্যাবরেটরি সত্যিই একটা ছোটখাটো

মিউজিয়াম। দু-তিনখানা ঘর জুড়ে কাচের কাসকেটে বা খোলা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে নানা জাতের পশুপাখি—টিয়া, বুলবুলি, দাঁড়ে বসা সাদা কাকাতুয়া। পশুর মধ্যে কুকুর, বিড়াল, বানর থেকে একটা লেপার্ডের বাচ্চা পর্যন্ত। ডাঃ ভঞ্জ জানালেন, এ সব তাঁর নিজের হাতে ট্যাক্সিডার্ম করা। তার মানে ট্যাক্সিডারমিস্টের ট্রেনিং আছে তাঁর।

ল্যাবরেটরি ঘুরে দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এলো। বেয়ারা নিয়ে এলো চায়ের সরঞ্জাম। চায়ের সঙ্গে অমলেট, পেস্ট্রি, আপেল, আঙুর। জলযোগ পর্ব মন্দ হলো না।

চা-টা খেয়ে পাইপে তামাক ভরে ইজিচেয়ারে আরাম করে বসলেন ডাঃ ভঞ্জ। তাঁর পেল্লায় অ্যালসেসিয়ানটা পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো।

পাইপে আগুন দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মমি সম্বন্ধে তোমরা কিছু জানো?'

'তেমন কিছু নয়।' বললো সুব্রত।

'অশোক, তুমি?'

অশোক হেসে বললো, 'আমাদের দু-জনের জ্ঞান একই রকম!

পাশের টেবিল থেকে একটা ইংরেজি বই নামিয়ে আনলেন ডাঃ ভঞ্জ। পাতা উলটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক কতদিন আগে প্রাচীন যুগের মানুষ মমি, মানে মৃতদেহ সংরক্ষণের কথা ভাবে, জানো তো?'

সুব্রত জবাব দিলো, 'ছ-হাজার বছর আগে মিশরের রাজা শিঅপসের রাজত্বকালে মানুষের মনে মৃতদেহ সংরক্ষণের কথা জাগে।'

'কিন্তু মৃতদেহ সংরক্ষণের কথাটা তাদের কেন মনে এলো জানো?'

'জানি, কাকাবাবু। প্রাচীন মিশরের পুরোহিতরা প্রচার করতো মৃত্যুই মানুষের শেষ অবস্থা নয়। দেহবিমুক্ত আত্মারা আবার ইহলোকে ফিরে আসবে। পুনরুজ্জীবন ঘটবে মরদেহের।'

'রাইট। ঠিক সেই কারণেই সে যুগের মানুষ মৃতদেহ মমি করে রাখতো।'

অশোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা মমি কি শুধু মিশরেই পাওয়া গেছে?'

'এই ভুল ধারণা অনেকেরই আছে।' হেসে বললেন ডাঃ ভঞ্জ, 'কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে নানারকম মমি পাওয়া

গেছে। সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃতদেহ মধু দিয়ে মমি করা হয়েছিল। রোমসম্রাট নীরোর স্ত্রী পোপ্পেটয়ার মরদেহও মমি করা হয়েছিল। আফ্রিকার উত্তরে ও দক্ষিণে সব জায়গাতেই মমি পাওয়া গেছে। ইথিওপিয়ায় মরদেহ প্রথম প্রচণ্ড রোদে শুকানো হতো। তারপর জীপসাম ঘষে মমি করা হতো। মেক্সিকোর পাহাড়ের গুহায় শুকনো বাতাসে রেখে দেয়া এক রকম মমি পাওয়া গেছে। সব জায়গায় ওই একই উদ্দেশ্যে মমি করা হয়েছিল। আত্মা ফিরে এসে আবার মরদেহে আশ্রয় নেবে।'

নতুন করে পাইপ ধরিয়ে ডাঃ ভঞ্জ বললেন, 'অনেকেই মনে করে মমির ব্যাপারটা প্রাচীনকালেই খতম হয়ে গেছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরেই তৈরি হচ্ছে মমি। এ নিয়ে গবেষণার আজও শেষ হয়নি। আসলে মৃত্যুতেই সব কিছুর শেষ, সে কথা মানুষ ভাবতে চায় না।'

সুব্রত জিজ্ঞেস করলো, 'পরের যুগেও কি মিশরের মতো একই উপায়ে মমি করা হতো?'

বইয়ের পাতায় ঝুঁকে ডাঃ ভঞ্জ বললেন, 'না। ইউরোপের নানান দেশে বিভিন্নভাবে মরদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন নানান বিজ্ঞানী। বিচিত্র ছিল তাঁদের পন্থা।'

বাইরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসছে। বেয়ারা হরিসাধন সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে গেল। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ডাঃ ভঞ্জ বললেন, 'এর পরের দিন তোমাদের আর এক ধরনের মমির কথা বলবো। আমার গবেষণার সবচেয়ে বড় বিষয় সেই ধরনের মমি, যা নিয়ে অতীতের মানুষ ভেবেছে, এ যুগের মানুষও ভাবতে শুরু করেছে। তবে আমাদের দেশে এ নিয়ে এখনো কোনো গবেষণা আরম্ভ হয়েছে কিনা জানি না।'

সুব্রত উঠে দাঁড়ালো, 'পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে আপনি মমি দেখেছেন?'

'মমি দেখতে আমি গ্রীস, রাশিয়ার সাইবেরিয়ায়, মাঞ্চুরিয়া অবধি গেছি। মেক্সিকোও বাদ দিইনি। কিন্তু কোন্ দেশের মমি সবচেয়ে নাড়া দিয়েছে জানো?'

'মিশর?' অশোক বলে উঠলো।

'নো, মাই ডিয়ার বয়, নো। ···কিছুতেই আমি ভুলতে পারছি না মাঞ্চুরিয়ার গ্লেসিয়ার মমির কথা।' উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ ভঞ্জ, 'আজ আর

সময় নেই। একটা কাজ বাকি আছে। সারারাত হয়তো ঘুমাতে পারবো না। আচ্ছা, গুড নাইট।'

দিন কয়েক পরই ওরা আবার বসলো ডাঃ ভঞ্জের মুখোমুখি। তাঁর ল্যাবরেটরিতেই। ডাঃ ভঞ্জ পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'জানো, মমির কথা তোমাদের শুনিয়েছি শুধু এ কথাই বোঝাতে, মানুষ চায় এই দেহেই অমর হতে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। রোগ বা মহামারী তারা জয় করবে কি করে? মৃত্যু সেই পথেই আসে। আসলে এই মৃত্যুকেই মানুষ জয় করতে চায়। সেটাই আসল উদ্দেশ্য।'

থামলেন ডাঃ ভঞ্জ। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আমি একটা খুব নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছি, যে কথা দুনিয়ায় আর কেউ জানে না, যে গবেষণার জন্যে আমি আমার সর্বস্ব, এমন কি আমার জীবন পর্যন্ত দিতে রাজি আছি।'

ওদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন ডাঃ ভঞ্জ। দু-জনের কাঁধেই হাত রাখলেন, 'সত্যি বলতে কি, আমার এই সিক্রেট রিসার্চের জন্য তোমাদের অ্যাকটিভ হেল্প আমার দরকার। যা নিয়ে আমি রিসার্চ করছি, জেনে রাখো, তাতে যদি সাকসেসফুল হই, সারা দুনিয়ায় সাড়া পড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, আমার সাকসেসের ওপর নির্ভর করছে গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ মানুষের আয়ু। কিন্তু আমার কার্যপদ্ধতি জানাজানি হয়ে গেলে অনেক দিক থেকেই বাধা আসবে। তাই খুব গোপনে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে।'

একটু থেমে, ওরা কিছু বলার আগেই ডাঃ ভঞ্জ বললেন, 'সব কিছু জানার আগে তোমাদের ডেফিনিট ওয়ার্ড দিতে হবে, চতুর্থ কোনো ব্যক্তি যেন না জানে আমাদের গবেষণার কথা।'

অশোকের দিকে একবার তাকিয়ে সুব্রত বললো, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কাকাবাবু, আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি।'

'থ্যাঙ্কস। মেনি থ্যাঙ্কস।' উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ ভঞ্জ। স্টিল আলমারি থেকে নামিয়ে আনলেন খান দুই মোটা বই। প্রথম বইখানা খুলে বললেন, 'সব কিছুর আগে আমাদের মমির কথাতেই আবার ফিরে আসতে হবে। মৃত্যুর পর আত্মা ফিরে যাতে ফের দেহে বাসা বাঁধতে পারে, সেই আশাতেই দেহ মমি করা হতো। আমি কিন্তু যে মমির কথা বলবো এখন, তা এক নতুন ধরনের মমি। মাঞ্চুরিয়ায় দেখেছি।'

ওদের সামনে বইয়ের একটা ছবি মেলে ধরলেন, 'লুক। চারিদিকে বরফের স্তূপের মধ্যে শোয়ানো রয়েছে কফিনের সারি। এই সেই গ্লেসিয়ার মমি। বহির্মঙ্গোলিয়ার তুষারাবৃত অঞ্চলে এগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। কাঠের তৈরি পাহাড়-প্রমাণ সমাধিকক্ষে আলাদা আলাদা চেম্বারে। এইরকম হিমায়িত মমি দেখা গেছে শুধু বরফের স্তূপের মধ্যে।'

'কী অবস্থায় পাওয়া গেছে মমিগুলো?' অশোক প্রশ্ন করলো।

'শুনলে অবাক হবে, তাদের দেহকোষ এখনো সম্পূর্ণ অবিকৃত।'

'স্ট্রেঞ্জ!' সবিস্ময়ে বলে উঠলো সুব্রত, 'হাজার বছর পরেও!'

'ইয়েস, মাই বয়। কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য ব্যাপার হলো···।' আরেকখানা বইয়ের পাতা উল্টে বার করলেন একজোড়া কুকুরের ছবি, 'এই কুকুর দুটোকে চিনতে পারো?'

মাথা নাড়লো ওরা দু-জনেই।

'পুনর্জন্ম হয়েছে এদের।' হাসলেন ডাঃ ভঞ্জ, 'বুঝতে পারলে না তো! তবে তোমরা না জানলেও পৃথিবীর অনেকেই চেনে রাশিয়ার এই বিখ্যাত কুকুর দুটিকে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা হিমাঙ্কের অনেক নিচের তাপমাত্রায় এই কুকুর দুটিকে অচেতন করে রেখে তাদের ছবি টি-ভি-তে দেখিয়েছেন। এই সময় ওদের দেহে প্রাণের কোনো সাড়া ছিল না। এক সপ্তাহ পর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এনে ফের এদের বাঁচিয়ে তুলেছেন। জ্ঞান ফিরে পেয়েই এরা আবার ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। সে ছবিও টি-ভি-তে দেখানো হয়েছে।'

বই বন্ধ করে পাইপে নতুন তামাক ভরে আগুন দিলেন ডাঃ ভঞ্জ, 'এ থেকে আমরা কী জানতে পারি, অশোক?'

অশোক বললো, 'এই ধরনের ব্যাপার কিছুদিন আগে আমিও একটা বইতে পড়েছি, কাকাবাবু। মেরু অঞ্চলের কার্প জাতের মাছ শীতে হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রায় বরফের মধ্যে জমাট হয়ে থাকে। এদের দেহে জীবনের কোনো চিহ্নই থাকে না। গ্রীষ্মে ফের বরফগলা শুরু হলে এরা বেঁচে উঠে জলে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করে।'

পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ডাঃ ভঞ্জ বললেন, 'আচ্ছা, এবার ভেবে দেখো, মানুষকেও যদি এখন মাসের পর মাস ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেওয়া যেতো, তাহলে কী হতো? তার অতি হিমায়িত দেহে প্রাণের কোনো স্পন্দন

থাকতো না। রাশিয়ার ওই কুকুর দুটোর মতো। পরে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এনে ফের তাকে বাঁচিয়ে তোলা হতো।'

'তা সম্ভব হলেও মানুষের কী লাভ তাতে কাকাবাবু?' প্রশ্ন না করে পারলো না অশোক।

'মেডিক্যাল স্টুডেন্ট হয়ে এ কথা কি করে বললে তুমি!' ডাঃ ভঞ্জ অবাক।

সুব্রত তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, কাকাবাবু।'

নিজের মনে কিছুক্ষণ পাইপ টানলেন ডাঃ ভঞ্জ। তারপর বললেন, 'আসল ব্যাপার কি জানো, বিজ্ঞান আজ অনেক উন্নতি করেছে। পঁচিশ বছর আগেও যে রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না, আজ তার অব্যর্থ চিকিৎসা হচ্ছে। কিন্তু দুনিয়ার সব রোগেরই কি সফল চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে?'

অশোক বললো, 'না কাকাবাবু। যেমন, ক্যান্সার, লিউকোমিয়া, আরথ্রাইটিস্, হৃদরোগ....।'

ডাঃ ভঞ্জ বললেন, 'কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ, একশো, দুশো বা পাঁচশো বছর পর কোনো রোগই আর চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইরে থাকবে না।'

'আপনি কি বলতে চান, বুঝেছি কাকাবাবু।' উত্তেজিত অশোক বলে উঠলো, 'এ কালের কোনো দুরারোগ্য রুগীকে অতি হিমায়িত অবস্থায় যদি সুদীর্ঘকাল রক্ষা করা সম্ভব হয়, তবে ভবিষ্যতে যখন ওই সব রোগের চিকিৎসা সম্ভব হবে, তাদের প্রাণ ফিরিয়ে এনে, রোগ নির্মূল করে, তাদের ফের বাঁচিয়ে তোলা যাবে।'

'ইয়েস, মাই বয়।' চিৎকার করে উঠলেন ডাঃ ভঞ্জ, 'ইউ আর হাণ্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট।'

সুব্রতও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'তা হলে বলছেন এ যুগের প্রায় মৃত মানুষকে দুশো বা চারশো বছর পর সুস্থ সবল করে ফের বাঁচিয়ে তোলা যাবে? সে হবে দারুণ ব্যাপার! এ যুগের মানুষ কয়েকশো বছর পরের নতুন যুগের মানুষের মধ্যে ফের চলে-ফিরে কাজ করে বেড়াবে।'

অশোক বলে উঠলো, 'এই নিয়ে এখনই একটা মজার গল্প লিখে ফেলতে ইচ্ছে করছে কাকাবাবু।'

ওদের উৎসাহে সাড়া দিলেন না ডাঃ ভঞ্জ। বেদনার ম্লান ছায়া নেমে এলো ওনার মুখে। মাথা নিচু করে বললেন, 'জানো, মাত্র পনেরো বছর বয়সে মাকে আমি হারাই। রাত তিনটের সময় দিদি ছুটে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বলে ওঠে, 'ওরে মা আর নেই। সেদিন···সেদিন···'

দু-হাতের তালুতে মাথা রাখলেন ডাঃ ভঞ্জ, 'সেদিন মনে হয়েছিল, ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখছি। রাত্রে আমাদের দুই ভাই-বোনকে শোবার আগে দুধ খাইয়ে গেছেন তিনি। আমাদের সেই মা আর নেই! হতে পারে না। কিছুতেই না। দিদির সঙ্গে ছুটে গিয়ে দেখি, মায়ের বিছানা ঘিরে দাঁড়িয়ে বাবা, কাকা, ডাক্তারবাবু। বিছানায় শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন মা। যেন স্বপ্ন দেখে হাসছেন! বিছানায় মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো দিদি।'

একটু থেমে ফের ভারি গলায় ডাঃ ভঞ্জ বললেন, 'তখন বুঝিনি। ডাক্তারি পড়ে পরে বুঝেছি, হার্টের করোনারি আর্টারির রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে স্ট্রোক হয়েছিল মায়ের। তখন যদি তার বডি মাত্র কয়েক ঘণ্টা প্রিসার্ভ করা সম্ভব হতো, তাহলে একটা মাত্র বাই-পাস অপারেশনেই মাকে আবার বাঁচিয়ে তোলা যেতো। কিন্তু তখন তো বডির ক্লিনিক্যাল ডেথ ঠেকানোর কোনো উপায়ই জানা ছিল না। তাই দেহের সমস্ত যন্ত্র অটুট থাকা সত্ত্বেও একটি মাত্র ধমনীর অবরোধের জন্যে মাকে অসময়ে হারালাম। সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠে আচমকা মায়ের মৃত্যুসংবাদে বুক যে টনটন করে উঠেছিল, সে যন্ত্রণার কথা জীবনে কোনোদিন ভুলিনি। আরো বড় হয়ে ভেবেছি, মরদেহকে অতি হিমায়িত করে তাতে আবার প্রাণ ফিরিয়ে আনার গবেষণায় মানুষকে সফল হতেই হবে। নইলে মেডিক্যাল সায়েন্স অসম্পূর্ণ থাকবে।'

উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ ভঞ্জ, 'জানো, আসলে মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের চিরাচরিত ধারণাই আজ বদলাতে চলেছে। বার্ধক্য, জরা, এসব কথা একদিন অভিধান থেকেই মুছে যাবে। মৃত্যু মানে হবে দৈহিক যন্ত্রের সাময়িক বিকলতা। রুশ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, গাড়ি পথে ব্রেক ডাউন হলে তাকে সারিয়ে যেমন আবার আগের মতো চালু করা যায়, মানুষের কোনো একটা বিকল দেহ-যন্ত্রকেও একই ভাবে সারিয়ে ফের চালু করা যাবে। তাঁদের মতে যে কোনো মানুষের স্বাভাবিক আয়ু দেড়শো বছর হওয়া উচিৎ।'

ডাঃ ভঞ্জের আশ্চর্য হিমঘরটা সেদিনই প্রথম দেখলো ওরা। এমন কিছু একটা এই জগতে থাকতে পারে, একদিন আগেও ওরা বিশ্বাস করতে পারতো না। সেই আশ্চর্য হিমঘরের নিচে সারি সারি ছোট-বড় ভল্টে পাশাপাশি শোয়ানো রয়েছে নানা প্রাণীর দেহ। ছ-মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত শোয়ানো রয়েছে সেগুলো হিমাঙ্কের নীচে। ডাঃ ভঞ্জ মাঝে মাঝে ভল্ট খুলে দেখেন ক্লিনিক্যালি কী অবস্থায় আছে ওরা!

ডাঃ ভঞ্জ এগিয়ে গেলেন একটা মাঝারি আকারের দুধ-সাদা ভল্টের দিকে। স্টিলের ঝকঝকে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে খুলে ফেললেন ডালাটা। আচমকা এক ঝলক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা দিল ওদের চোখে-মুখে। ভল্টের ভেতর উঁকি দিয়ে ওরা অবাক হয়ে দেখলো, ভেতরে পাশ ফিরে শোয়ানো রয়েছে একটা পূর্ণ বয়স্ক বানর। চোখ দুটো বোজানো। প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই তার দেহে।

ওদের দিকে তাকিয়ে ডাঃ ভঞ্জ বললেন, 'আজই এর বেঁচে ওঠার দিন। এসো, আমাকে সাহায্য করো তোমরা।'

নানান প্রক্রিয়ায় বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে অনেক কিছুই করলেন ডাঃ ভঞ্জ বানরের দেহে। ওরাও তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করলো। দারুণ উদ্বেগে কাটলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর রুদ্ধশ্বাসে দেখলো ওরা, খুব মৃদু মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে বানরের। প্রথমে খুব অনিয়মিত, তারপর প্রায় স্বাভাবিক ভাবে। স্টেথোস্কোপে বানরের হৃদস্পন্দন শোনা গেল। যেন দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠলো। বেশ কিছুক্ষণ পর চার পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টাও করলো। প্রথমে পারলো না। কাঁপতে লাগলো সারা দেহ। তখনি তাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে দিয়ে ডাঃ ভঞ্জ একটা স্টিমুল্যাণ্ট ইনজেকশন দিলেন। এবার সত্যিই উঠে দাঁড়ালো বানরটা। ব্রাণ্ডি মেশানো গরম দুধ লাল জিভ বার করে চুকচুক করে খেয়ে নিল। স্ট্রেচারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বানরটাকে বেঁধে রেখে চেম্বারের দিকে পা বাড়ালেন ডাঃ ভঞ্জ। ল্যাবরেটরির দরজার সামনে প্রিয় অ্যালসেসিয়ানটাকে আদর করে বললেন, 'জানো অশোক, এই লুসিকেও আমার কোল্ড চেম্বারে একমাস রেখেছিলাম।'

শুধু শুনলে এসব কথা হয়তো বিশ্বাস করা শক্ত হতো ওদের। এখন আর অবিশ্বাস করার কোনো উপায় নেই।

ডাঃ ভঞ্জের প্রতি শ্রদ্ধায় সমস্ত মন ভরে গেল ওদের।

পরের রোববারই আবার ওরা ডাঃ ভঞ্জের বাড়িতে গেল। ওদের দেখেই হরিসাধন ছুটে এলো, 'ডাক্তারবাবুর কোনো খবর জানেন আপনারা ?'

'কেন, উনি কি বাড়িতে নেই ?'

'না, দাদাবাবু।' বলে উঠলো হরিসাধন, 'আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, উনি নেই। বোধহয় কোথাও চলে গেছেন।'

'সে কি ! তোমাকে কিছু বলে যায়নি ?' জিজ্ঞেস করলো অশোক।

'না। অন্য সময় কোথায় যাচ্ছেন, বলে যান। এবার কিছুই বলেন নি।'

কিছুই অনুমান করতে পারলো না অশোক-সুব্রত।

অশোক জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা হরিসাধন, ডাক্তারবাবুর চালচলনে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলে ?'

'ঠিক বলতে পারছি না বাবু। তবে রাতে যখনই উঠেছি, দেখেছি হয় উনি কাজ করছেন, না হয় পায়চারি করছেন।'

ব্যাপারটা শুধু বিস্ময়কর নয়। রীতিমতো রহস্যজনক।

'থানায় খবর দিয়েছ ?'

'না, দাদাবাবু।' অসহায়ভাবে ঘাড় নাড়লো হরিসাধন।

অশোক সুব্রত দু-জনেই একসঙ্গে ছুটলো স্থানীয় থানায়। তারপর লালবাজারেও। না, কোথাও কোনো খবর নেই !

কোথায় যেতে পারেন ডাঃ ভঞ্জ ? ভাবতে বসলো ওরা ! শেষে হরিসাধনের কাছেই শুনলো, এর আগেও অনেকবার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছেন ডাঃ ভঞ্জ। মাসের পর মাস কোনো খবর পাওয়া যায়নি তাঁর। কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো ওরা। হরিসাধনকে সঙ্গে নিয়ে লিভিংরুমে খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। দেখা গেল, জিনিসপত্র কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাননি ডাঃ ভঞ্জ। সুটকেশ, বেডিং—সব কিছু ঠিক আছে।

আচমকা সুব্রতর নজরে পড়লো, হ্যাঙারে ঝোলানো ডাঃ ভঞ্জের কোটের পকেটে একটা লম্বা খাম উঁকি দিচ্ছে। খামটা হাতে নিয়ে ওরা অবাক ! খামের ওপর ওদের দু-জনেরই নাম। ডানদিকের ওপরের কোণে লেখা, 'হাইলি কনফিডেনশিয়াল।'

খামের মুখ ছিঁড়ে ফেললো সুব্রত, 'ডিয়ার সুব্রত-অশোক, আমার খোঁজ ক'রো না। যে পথে পা বাড়িয়েছি, তা বড় দুর্গম। তবে সাধনার সিদ্ধির জন্যে কোনো পথই আমার কাছে কঠিন নয়। অনুরোধ, আমার

গবেষণার কাজ তোমরা দু-জনেই চালিয়ে যেও। আমার ল্যাবরেটরি তোমাদের জন্যে খোলা রইলো। ল্যাবরেটরি ও হরিসাধনের জন্য পাঁচ হাজার টাকার 'বিয়ারার' চেক রইলো এই সঙ্গে। আবার যখন আমার ডাক আসবে তোমাদের নামে, তখন কিন্তু তাড়াতাড়ি সাড়া দিও। তখন ফের দেখা হবে। তোমাদের জন্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।

ইতি—

ডাঃ ভঞ্জ।'

চিঠির সঙ্গে পিন দিয়ে আটকানো চেক।

ডাঃ ভঞ্জের অনুরোধ বা নির্দেশ অমান্য করেনি ওরা। মাঝে মাঝেই ডাঃ ভঞ্জের ল্যাবরেটরিতে গেছে। কাজ করেছে। ডাঃ ভঞ্জের লেখা তারিখ মতো এক একটা প্রাণীকে তাদের দীর্ঘদিনের হিম-ঘুম থেকে জাগিয়েছে। নতুন করে বাঁচিয়েছে তাদের। প্রতি সপ্তাহে হরিসাধনেরও খরচ দিয়েছে ওরা। মাসের পর মাস কেটে গেল। বছরও ঘুরে গেল। ডাঃ ভঞ্জের কুকুর লুসি প্রভুর শোকেই হয়তো বা বছর খানেকের বেশি বাঁচলো না। মাঝে মাঝে ওদের মনে সন্দেহ হয়েছে, হিমালয়ের কোনো দুর্গম অঞ্চলে চলে যাননি তো উনি! গিরিগুহায় অনেক সাধুসন্ত যোগ ও ধ্যান বলে বিস্ময়করভাবে শত শত বছর অক্লেশে বেঁচে থাকতে পারেন। তাঁদের সেই যোগশক্তির রহস্যের সন্ধানেই হয়তো তিনি কোনো দুর্গম অঞ্চলে যাত্রা করেছেন।

ব্যাঙ্কে পৌঁছাতেই নির্দিষ্ট অফিসার কাপবোর্ড থেকে একটা ফাইল বার করে জানালেন, তাঁদের ব্রাঞ্চে ডাঃ কে, এম, ভঞ্জের নামে একটা একাউণ্ট আছে।

সুব্রতর মনে পড়লো এই ব্যাঙ্ক থেকেই দু-বছর আগে ডাঃ ভঞ্জের দেওয়া চেক ভাঙিয়েছে ও।

অফিসার বললেন, 'আমাদের এই ব্রাঞ্চে ডাঃ ভঞ্জের একটা লকারও আছে।'

সুব্রত ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলো, 'ডাঃ ভঞ্জের কোনো খবর জানেন আপনারা?'

অবাক মুখে তাকালেন ভদ্রলোক, 'কেন! ওনার কি কোনো খবর পাচ্ছেন না আপনারা?'

'না। বছর দুই উনি নিরুদ্দেশ।' সুব্রত জানালো।

'স্ট্রেঞ্জ!' দুঃখ প্রকাশ করে অফিসার বললেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। দু-বছর আগে উনি আমাদের কাছে ওনার লকারের নিজস্ব চাবি জমা দিয়ে, স্পেশাল এক ইন্সট্রাকশন দিয়ে গেছেন, জীবিত বা মৃত যে অবস্থাতেই উনি থাকুন না কেন, দু-বছর পূর্ণ হলেই ওনার লকারের কনটেণ্টস আপনাকে হ্যাণ্ডওভার করতে। সেইজন্যই ডেকেছি আপনাকে।'

অবাক হলো সুব্রত। ডাঃ ভঞ্জ তাঁর লকারের সম্পত্তি সুব্রতকে লিখে দিয়ে গেলেন! কিন্তু কেন? তাহলে কি ডাঃ ভঞ্জ সত্যিই বেঁচে নেই!

সুব্রতকে নিয়ে ব্যাঙ্কের আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বারে নেমে গেলেন অফিসার। নম্বর মিলিয়ে লকার খুললেন।

কী আছে লকারে? সোনা বা নোটের গোছা। না, সে সব কিছু নয়। শুধু একটা ব্রাউন রঙের খাম। কী আছে খামে? উইল? হাতে নিয়ে দেখলো সুব্রত খামের ওপরে লেখা, 'কনফিডেনশিয়াল।'

ব্যাঙ্কের অফিসার ডাঃ ভঞ্জের অফিস ফোলডারটা খুলে দেখালেন। বললেন, 'ডাঃ ভঞ্জের ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন ছিল, লকারটা যেন ২৫শে থেকে ২৮শে মার্চের মধ্যে খোলা হয়। সেই হিসেব মতো আমরা আপনার বাড়ির ঠিকানায় রেজিস্টার্ড চিঠি পোস্ট করেছি ২০শে মার্চ। আপনি আসতে দেরি করার জন্যেই সময়ের হিসেব ঠিক রাখা গেল না।'

সুব্রত বললো, 'কয়েকদিন কলকাতায় ছিলাম না।'

অফিসার হেসে বললেন, 'তার জন্যে নিশ্চয়ই আমাদের দায়ী করবেন না আপনি!'

বাড়ি ফিরেই খামখানা খুলে ফেললো ওরা। না, উইল-টুইল কিছু নয়। একখানা চিঠি। কিন্তু কি এমন দামী চিঠি, যা লকারে রাখা হয়েছিল! যা দু-বছর আগে সুব্রতকে দেওয়া নিষেধ ছিল। সুব্রত চিঠিখানা মেলে ধরতেই টেবিলে ঠক্ করে পড়ল একটা চাবি। সাধারণ চাবি। চিঠিটা ডাঃ ভঞ্জেরই হাতে লেখা—

'সুব্রত/অশোক,

তোমাদের আগেই জানিয়েছি, আবার আমার দেখা পাবে তোমরা। সেই সময় এসেছে এখন। এতদিন তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, আমি বেঁচে আছি কিনা। সত্যি বলতে কি, আমি নিজেও জানি না আমি বেঁচে আছি কিনা।'

এই পর্যন্ত পড়ে অশোকের মুখের দিকে তাকালো সুব্রত। ওরা হতবাক। কোথায় আছেন এখন ডাঃ ভঞ্জ? কিন্তু যেখানেই থাকুন, এ কেমন কথা, তিনি নিজেও জানেন না, বেঁচে আছেন কিনা!

রুদ্ধশ্বাসে চিঠির বাকি অংশ পড়লো ওরা, 'তোমরা আমাকে দেখতে না পেলেও, দূরে কোথাও যাইনি আমি। তোমাদের কাছেই রয়েছি। খুব কাছেই।……'

তাহলে কি……ভয়ঙ্কর এক সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো ওরা।

ডাঃ ভঞ্জ লিখেছেন, 'আমার ল্যাবরেটরির হিমঘরের ঠিক নিচেই আরেকটি গোপন হিমঘর আছে। ওপরের ঘরের দক্ষিণ দিকের দেয়ালে একটা বইয়ের র‍্যাক দেখেছ। র‍্যাক সরালেই দেওয়ালে একটা চাবির গর্ত ও সুইচ দেখতে পাবে। এই খামের মধ্যে যে চাবিটা আছে, সেই চাবি ঘুরিয়ে সুইচ টিপলেই উত্তর দিকের একটা কাঠের পাটাতন নেমে যাবে নিচে। মাটির নিচের গড়ানে পথ বেয়ে তোমরা নেমে যাবে নিচে। সেখানেই সেই পাতাল হিমঘর। ছু-বছর আগে বাগানের অন্য এক গোপন পথ দিয়ে এই ঘরে ঢুকেছি আমি। এই ঘরেরই একটা হিমায়িত ভল্টের মধ্যে রয়েছে আমার অচেতন দেহ। ওষুধের ক্রিয়ায় আমার দেহ অচেতন হবার পর ভল্টের ঢাকনা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বন্ধ হয়ে গেছে।

হিমঘুম সম্বন্ধে আমার সুদীর্ঘ গবেষণার কথা জানো তোমরা। পৃথিবীর মানুষের রোগমুক্ত দীর্ঘ জীবনের জন্যে আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছি। এই বিপজ্জনক গবেষণায় অপরের জীবনের কোনো ঝুঁকি আমি নিতে চাইনি। তাই নিজের সামান্য জীবনকেই এই অসামান্য কাজে নিয়োগ করেছি স্বেচ্ছায়।'

সুব্রত ও অশোক এখন বেশ বুঝতে পারলো, কেন ডাঃ ভঞ্জ ব্যাঙ্ককে ছু-বছর বাদে চিঠিখানা ওদের হাতে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গবেষণার জন্যে নিজের অচেতন দেহ ঠিক ছু-বছর অতি হিমায়িত পদ্ধতিতে রাখতে চেয়েছেন তিনি।

চিঠির শেষে ডাঃ ভঞ্জ লিখেছেন,'……নার্ভাস হয়ো না, মাই বয়েজ। তোমাদের হাতে নির্ভর করছে আমার জীবন-মৃত্যু। সেই সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নবযুগ।

যে মেথডে একদিন তোমাদের সামনে বানরের হিমায়িত দেহে প্রাণের সঞ্চার করেছি, সেই একই উপায়ে তোমরা আমার দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনবে। চিকিৎসা বিদ্যায় এতদিনে তোমরা নিশ্চয় অনেক দূর এগিয়েছ। আশা করি, কোনো অসুবিধা হবে না।

২৯শে মার্চের মধ্যে অবশ্যই আমার ভল্টের ঢাকনা খুলবে। কারণ, ৩০শে মার্চ ভল্টের যন্ত্রপাতি আপনি বন্ধ হবে। উইশ ইউ অল সাকসেস—ইতি।'

চিঠিখানা হাতে নিয়ে ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠলো সুব্রত, 'আজ ৩০শে মার্চ। অশোক, ইস্‌.......!' দু-হাতে মাথার চুল খামচে ধরলো সুব্রত, 'একটা দিন.......মাত্র একটা দিন আগে চিঠিখানা পেলে ডাঃ ভঞ্জকে আমরা বাঁচাতে পারতাম।'

সুব্রতর হাত থেকে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিয়ে অশোক বললো, 'সুব্রত, চিঠিতে লেখা আছে ৩০শে ভল্টের মেশিন বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কখন বন্ধ হবে লেখেননি তো। এমনও হতে পারে, মেশিন এখনো হয়তো চালু আছে। চল, এখনই আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

ট্যাক্সি নিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটলো ওরা।

ল্যাবরেটরির ঘরের মেঝের লাল কার্পেট সরাতেই বেরিয়ে পড়লো কাঠের পাটাতন। বইয়ের র‍্যাকের পেছনের দেয়ালে চাবি ঘুরিয়ে সুইচ টিপতেই মোটরের মৃদু শব্দের সঙ্গে ধীরে ধীরে পাটাতন ঝুলে গেল নিচে। মিশে গেল দেয়ালের গায়ে। উন্মুক্ত হয়ে গেল নিচের মৃদু আলোকিত ঘর। গড়ানে পথে নিচের ঘরে নেমে গেল ওরা। মাঝারি সাইজের গোটা ঘরটাই মাটির নিচে। কোনো জানালা নেই। উত্তর দিকে শুধু একটা দরজা। বাগানের দিক থেকে কোনো সুড়ঙ্গ পথে হয়তো এর সঙ্গে যোগ আছে। ওই দরজা দিয়েই ডাঃ ভঞ্জ শেষবারের মতো এই ঘরে ঢুকেছিলেন।

ঘরের মাঝ বরাবর বড় সাইজের সাদা ফ্রিজের মতো একটা ভল্ট লম্বা টেবিলের ওপর শোয়ানো। ওপরে স্টিলের ঢাকনা। ভল্টের পাশেই একটা চাকা লাগান স্ট্রেচার।

ভল্টের সামনে থমকে দাঁড়ালো ওরা। সুব্রত কান পেতে শুনলো, না, কোনো যান্ত্রিক শব্দ শোনা যাচ্ছে না ভল্টের ভেতর থেকে। তার মানে স্তব্ধ হয়ে গেছে ভল্টের হিমকরণ মেশিন! বুকের ভেতরটা টনটন

করে উঠলো ওর। এতদূরে এমন আশা করে ছুটে এসেও ডাঃ ভঞ্জকে বাঁচাতে পারবে না ওরা !

ভল্টের গায়ের তাপ পরীক্ষা করে অশোক বললো, 'ভল্টের হিমকরণ মেশিন খুব বেশিক্ষণ বন্ধ হয়নি। ভল্টের গা এখনো বেশ ঠাণ্ডা। জলীয় বাষ্পও লেগে রয়েছে। মেশিন বড়জোর আধঘণ্টা আগে বন্ধ হয়েছে। মনে হয়, ভেতরের টেম্পারেচার এখনো একই আছে। আয় সুব্রত, খুলে দেখি আমরা।'

ভাববার আর সময় নেই। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। ভল্টের হ্যাণ্ডেল ঘোরালো অশোক। কিন্তু সহজে নড়ানো গেল না। দীর্ঘদিনের অব্যবহারে আর জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে জং ধরে গেছে নিশ্চয়। শেষে প্রাণপণে চাপ দিতেই হ্যাণ্ডেলটা একটা মৃদু শব্দ তুলে ঘুরে গেল।

এবার·······এবার কী দেখবে ওরা ঢাকনা খুলে? উত্তেজনায় বেড়ে গেল ওদের হৃদপিণ্ডের আস্ফালন !

না, মিথ্যে নয়, সত্যিই ভল্টের ভেতর শুয়ে রয়েছেন ডাঃ ভঞ্জ। এতদিনের অদর্শনের পরেও চিনতে অসুবিধা হলো না ওদের। কিন্তু চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলো না ওরা। দুটো হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে শুয়ে রয়েছেন ডাঃ ভঞ্জ। হিমশীতল দেহে প্রাণের সামান্য মাত্র সাড়াও নেই। চোখের চশমার লেন্সে পুরু হয়ে জমে রয়েছে তুষার। পরনে সাদা ট্রাউজারস, বুশশার্ট।

কয়েক পলকের জন্যে বুঝি সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল ওরা। হুঁশ ফিরে পেয়ে চটপট কাজে লেগে পড়লো। ভল্টের ভেতর থেকে ডাঃ ভঞ্জের দেহ দুজনে ধরাধরি করে পাশের স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল। তারপর প্রাণ ফিরিয়ে আনার যত রকম উপায় ওরা শিখেছিল ডাঃ ভঞ্জের কাছে, সব কিছুই একে একে প্রয়োগ করলো। যেমনটি একদিন ডাঃ ভঞ্জ নিজের হাতে করে দেখিয়েছিলেন, অচেতন বানরের দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনার সময়।

শ্বাসরোধী ব্যগ্রতা নিয়ে ওরা দুজনে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলো ডাঃ ভঞ্জের দেহে চেতনা ফিরে আসার দুরন্ত আশায়। বার বার প্রচণ্ড আগ্রহে ঝুঁকে পড়তে লাগলো ডাঃ ভঞ্জের মুখের ওপর। এক সময় রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলো অশোক, 'দেখ····দেখ সুব্রত, ডাঃ ভঞ্জের নিঃশ্বাস পড়ছে।'

অসহ্য উত্তেজনায় দেখলো ওরা সত্যিই মৃদু নিঃশ্বাস পড়ছে ডাঃ ভঞ্জের।

সুদীর্ঘ দু-বছর পর আবার পৃথিবীর বাতাসে শ্বাস নিচ্ছেন উনি। দারুণ বিস্ময়ে দেখলো ওরা, খুব ধীরে ধীরে খুলে গেল ওনার দু-চোখের পাতা। চোখে ঘোলাটে চাউনি। কিছুই যেন চিনতে পারছেন না। ডাঃ ভঞ্জের চোখ থেকে খুলে চশমার লেন্স দুটো ভালো করে পরিষ্কার করে ফের চোখে পরিয়ে দিয়ে ডাকলো সুব্রত, 'কাকাবাবু, আমরা....আমরা....সুব্রত ....অশোক। কিছু বলবেন?'

ডাঃ ভঞ্জের পাণ্ডুর ঠোঁট দুটো যেন একবার থরথর করে নড়ে উঠলো। ওদের মনে হলো কী যেন বলতে চাইছেন উনি। কী যেন খুঁজছেন।

'কাকাবাবু....কাকাবাবু....কিছু বলবেন, কাকাবাবু?'

দ্বিতীয়বার ঠোঁট দুটো আর নড়লো না। ঘোলাটে চোখের পাতা আবার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল সব কিছু। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওরা দু-জনেই আবার হার্ট ম্যাসাজ করে শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। স্টিমুল্যাণ্ট ইনজেকশন দিল। সেই সঙ্গে ইলেকট্রিক শক দিতেও ভুললো না। কিন্তু আর প্রাণের সাড়া ফিরে এলোনা ডাঃ ভঞ্জের দেহে। তাঁর এতদিনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল। শেষবারের মতো নাড়ী পরীক্ষা করল সুব্রত। না, আর কোনো সাড়া নেই।

ডাঃ ভঞ্জের ঠাণ্ডা হাতটা তাঁর বুকের ওপর নামিয়ে রেখে সুব্রত বললো, 'আমরা হেরে গেলাম অশোক। আমরা হেরে গেলাম। পারলাম না কাকাবাবুকে বাঁচাতে।....হি ইজ....ডেড।'

একপাশে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করতে থাকলো দুই বন্ধু!





গুলডেনবাগের যুদ্ধ

শিশিরকুমার মজুমদার

প্রতুলের দাদা এবারে পরমবীর চক্র পেয়েছেন। ফ্রণ্টে তার একার সাহসে, আমাদের বিরাট জয় হয়েছিল। এ সম্মান তাই।

ছুটির সকালে রেঁস্তরায় বসে তা নিয়েই আমরা গজালি করছি। প্রতুল বলল, 'আমার দাদা একার চেষ্টায় ব্রীজটা উড়িয়ে দিয়েছিল বলেই না শত্রুপক্ষ পালাবার সুযোগ না পেয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল।'

ব্যাপারটা খুবই সত্যি, আর তার জন্য আমাদের সবারই গর্ব। রাতুল জিজ্ঞাসা করল, 'তোর দাদা কবে আসছেন রে? একবার পায়ের ধুলো নেব।'

'তা নাও, তবে ওঁর দাদার নাম কি মেজর আর, এন, রয়? সিক্স্থ্ রেজিমেণ্ট স্যাপার্স এণ্ড মাইনার্স-এর অফিসার?' হঠাৎ আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে কে যেন ওদিকের টেবিল থেকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ফিরে তাকিয়ে দেখি মাঝবয়সী একজন প্যাণ্ট সার্ট পরা ভদ্রলোক একলা একটা টেবিলে বসে চা খাচ্ছেন। আমাদের সবাইকে তাকাতে দেখে হাতের কাপ নামিয়ে রেখে বললেন, 'হ্যাঁ আমিই জিজ্ঞাসা করেছি, কারণ তোমরা ওই যে বললে না, ব্রীজ ভাঙ্গার কথা, তাই। তা ব্রীজটা উনি ভাঙ্গলেন কিভাবে? ডিনামাইট চার্জ করে? না কি অন্য কোনও উপায়ে?'

মনে মনে প্রতুল বোধ হয় একটু চটেই ছিল। কারণ ওর দাদার নাম আর, এন, রয় নয়। তা ছাড়া উনি আছেন আর্টিলারীতে। কামান দেগেই ব্রীজটা উনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন বোধ হয়। তা-ই সম্ভব, তবে সে বিষয়ে আমরা কেউ-ই ততটা নিশ্চিন্ত নই। প্রতুল কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, 'মেজর রয়কে আমি চিনি। যতদূর জানি এলাইড আর্মিতে তার মত ব্রীজ ভাঙ্গার এক্সপার্ট আর অন্য কেউ ছিল না। যেখানেই ব্রীজ সমস্যা দেখা দিত, ডাক পড়ত মেজর রয়-এর, সঙ্গে অবশ্যই তল্পিবাহক হয়ে যেতে হত এই অধমকে, অধমের নাম ডি, কে, রুদ্র। গোটা ফ্রণ্টে রয় আর ডি, কে'র নাম জানত না এমন তো কেউ বড় একটা ছিল বলে জানি না। জেনারেল আইসেনহাওয়ারও একবার নিজে এই অধমের পিঠ চাপড়ে দিয়ে সাবাস বাহাদুর বলেছিলেন।' কথার শেষে ভদ্রলোক পিঠের একটা বিশেষ জায়গা বহু কসরৎ করে হাত ঘুরিয়ে দেখালেন। বললেন, 'জান, এখনও কালে-ভদ্রে ওই বিশেষ জায়গাটাতে আমি একটা অদ্ভুত অনুভূতি বোধ করি। আইসেনহাওয়ার বলে কথা!'

প্রতুল থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোন যুদ্ধের কথা বলছেন? আমার দাদা তো গত বছরের যুদ্ধে পরমবীর চক্র পেয়েছেন। আইসেনহাওয়ার কে?'

প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক হাসলেন। চায়ের কাপ তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিলেন। বললেন, 'ভুল আমারই, পরমবীর চক্র কথাটা আমার শোনা উচিত ছিল। ওসব তো আজকালকার ছেলেছোকরাদের ব্যাপার, আমাদের সময়ে বৃটিশ আর্মিতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ছিল ভিক্টোরিয়া ক্রশ, সোজা কথায় ভি, সি। তাই পাবার জন্য লোকে ভয়ঙ্কর সব দুঃসাহসের কাজ করে বসত। আইসেনহাওয়ার এলাইড আর্মির সুপ্রিম কমাণ্ডার ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। এলাইড আর্মিটার্মি যাই বলা হোক না কেন, আসলে ইংরেজদের সঙ্গে আমেরিকানদের কেমন যেন একটা মন কষাকষি ছিল। ভয়ংকর যুদ্ধ চলেছে, জার্মানরা ভীষণ ভাবে চেপে ধরেছে, ইংরেজ ফিল্ড মার্শালরা বললেন, এ অবস্থায় নালার ডানদিক থেকে পাল্টা আক্রমণ করলে সুবিধা হবে। তা শুনে, সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান জেনারেলরা সবাই এক জোটে বলে বসল, না, আক্রমণ শুরু করতে হবে বাঁ দিক থেকে। ব্যাস, যুদ্ধ যেন ওখানেই শুরু হয়ে গেল। খবর

গেল জেনারেল আইসেনহাওয়ারের কাছে, সব শুনে তিনি কিছুক্ষণ কান চুলকে বললেন, আমেরিকান জেনারেলরা যখন বলেছেন আক্রমণ আরম্ভ করতে হবে বাঁ দিক থেকে তখন তাই শেষ কথা। এমনই চলত।' এত কথা এক সঙ্গে বলে ভদ্রলোক একটু থামলেন। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'অবশ্য এর ব্যতিক্রম একবারই হয়েছিল। আর সেই ব্যতিক্রমের নায়ক ছিলেন মেজর আর, এন, রয়, আর……আর এই শর্মা ডি, কে, রুদ্র।'

ভদ্রলোক এত সব কথা বলে একদম চুপ করে গেলেন। শুধু ওঁর মুখের মুচকি হাসি আমাদের যেন রাগিয়েই দিল। আরে, এত আজে বাজে কথা কে শুনতে চায়, আসলে কি হয়েছিল তা তো বলে দিলেই সমস্যা চুকে যায়। তা না, শুধু মুচকি হাসি!

রামু থাকতে না পেরে বলল, 'থামলেন যে? ব্যতিক্রম কি হয়েছিল তা তো বলবেন। কি করেছিলেন মেজর আর, এন, রয়? আমাদের আলোচনার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

মুখে তেমনি হাসি ধরে রুদ্র মশাই বললেন, 'যা বলেছি তা তো মন দিয়ে শোনো নি, তাই অমন প্রশ্ন করলে। সম্পর্ক ওই ব্রীজ, তোমাদের আত্মীয়টিও ব্রীজ ভেঙ্গে কি যেন চাকা উপহার পেয়েছিল, আর আমার গল্পের নায়কও ওই ব্রীজ ভেঙ্গেই ভি, সি, পেয়েছেন। তবে দুইয়ের মাঝে ফারাক বোধ হয় কয়েক হাজার কিলোমিটার, আর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশটা বছরের। সে আর কি।'

বেশ রাগ করেই পরিমল বলল, 'অতশত বুঝি না, আপনার মেজর কি করেছিলেন শুনি? তিনি কি গোটা ব্রীজটা নিজের হাতে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে ভেঙ্গেছেন। তা-ই যদি হবে তো হাতুড়িটা কত বড় ছিল! বাজে কথা না বলে সে গল্পই বলুন শুনি।'

রুদ্র মশাই একটুও রাগ করলেন না। খালি চায়ের কাপটা একবার নেড়ে এদিক ওদিক চাইলেন। তা দেখে প্রতুল চেঁচিয়ে বলল, 'ওরে কেষ্টা, এখানে একটা ডবল হাপ্ আর দুপিস্ চিনি টোস্ট দিয়ে যা, জলদি। এবারে বলুন শুনি আপনার মেজর কিভাবে ব্রীজটা ভাঙ্গলেন।'

বেজায় খুশি হয়ে রুদ্র মশাই নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'এ ঘটনা ঘটেছিল ফ্রান্সে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। এদেশের মত ওদেশের ব্রীজগুলো ইট পাথরের তৈরি নয় যে হাতুড়ি ঠুকে ভাঙ্গা যাবে। খাঁটি

স্টিলে তৈরি ব্রীজ, যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া, আর অসাধারণ মজবুত। ভাঙ্গতে হলে আরও মজবুত ব্যবস্থা চাই। আর আমাদের মেজর রয়ের ব্যবস্থাটাই তেমনি পাকা।' বলে ভদ্রলোক একটু থামলেন।

কেষ্ট ওর সামনে চা টোস্ট নামিয়ে দিয়ে গেল। খুশি মনে সেদিকে তাকিয়েই উনি বললেন, 'তাহলে তোমাদের গোড়া থেকেই বলি। বুঝতে সুবিধা হবে। এক পাড়াতেই থাকতাম আমরা দুজনেই। রয় আর আমি। বয়সে অল্প কিছু ছোটই হবে ও। তবে বিদ্যায় ছিল সবার সেরা। তখনই চারিদিকে রটে গেছিল, কালে-ভদ্রে একটা কেউকেটা হবে ও। রাতদিন বাড়ির ছাদে কি যেন সব নিয়ে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত গোপনে, তা নিয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে শুধুই মুচকি হাসত। ওদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকতাম আমরা। আর ছাদের একটা চিলে ঘরেই ছিল আমার আস্তানা। মাঝের পাঁচিলটা বেশ উঁচু, তাই ও যে ওর ছাদে রাতদিন কি করছে তা বুঝতে পারতাম না। শুধু থেকে থেকে নানান ধরণের সব শব্দ শোনা যেত ওর ছাদে। অদ্ভুত সে সব শব্দ যেন আমার মনের মধ্যেও নানান অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি করত। জি-জি-জি শব্দ উঠলে দেখতাম কাক চিল পাখিগুলো সব তল্লাট ছেড়ে পালাচ্ছে। বিজ-বিজ-বিজ শব্দ উঠলে মনে হত ও যেন আমাকেই রাগাবার জন্য ইচ্ছা করে ওই শব্দ তুলছে। ছুটে গিয়ে ওকে ঘা কতক লাগিয়ে দিলে কেমন হয়! কিন্তু ওতো পাড়ার সেরা ছেলে, তেমন কিছু করলে, আমাকেই পাড়া ছাড়তে হবে। কিন্তু ওই অদ্ভুত শব্দগুলোর কি মানে? রাতদিন ধরে অমন বিশ্রী শব্দ তুলে কি পরীক্ষা করছে ও!'

'চূড়ান্ত হল একদিন, বিকাল চারটে থেকেই ও ছিল ওর ছাদে। সেদিন শব্দ উঠল চাপা রিঁ-রিঁ করে। সে শব্দ এমনই যে কাক চিল পায়রাগুলো তো সব পালিয়েই গেল, আমাদের পোষা মিনি বিড়ালটাও হঠাৎ ওঁয়াও করে একটা বিকট আওয়াজ তুলে তিনবার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ল্যাজ তুলে ছাদের কার্নিশ বেয়ে কোথায় যে পালাল তা কে জানে। আমারও মনে হতে লাগল, আমিও তিন ডিগবাজী খেয়ে কোথাও ছুটে পালাই। কিন্তু কিছু করার আগেই শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। না, না, শব্দ থেমে গেলে তো চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এ যেন না শোনা কি এক শব্দের নিস্তব্ধতা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিল, তা এমনভাবে যে

অসুস্থ বোধ হতে লাগল। চমকে তাকিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড! দুবাড়ির মাঝের দেওয়ালের মাঝ বরাবর একটা বিশেষ জায়গায় চড়বড় চড়বড় করে আওয়াজ উঠছে, আর ইঁট সিমেণ্ট বালি ফুলে ফেটে যাচ্ছে। ঝর ঝর করে সব খসে পড়ে মুহূর্তে সেখানে একটা গোল ফুটো দেখা গেল। আমি ভাবলাম, ব্যাপারটা কি তা উঁকি দিয়ে দেখব। কিন্তু তার আগেই ফুটোর সামনে বরাবর আমাদের বাড়ির ছাদের ঘরের কার্নিশের খানিকটাও বিশ্রী আওয়াজ তুলে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল। আমার তো চোখ কপালে ওঠার মত অবস্থা। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে দেখলাম, কি সর্বনাশ, দেওয়ালের ফুটো এবং ছাদের কার্নিশ, দুয়ের লাইন বরাবর গলির ওপাশের বসুদের বাড়ির ছাদের ঠাকুর ঘরের দেওয়ালে চড়বড়ে আওয়াজ উঠে ইঁট বালি চুন খসে একটা বড় ফুটো হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বসুবাড়ির গিন্নীমা, কে র‍্যা অল্প্পেয়ে আমার মন্দিরের দেওয়াল ভাঙ্গলে, বলে ছাদে বার হয়ে আসতেই রায় বাড়ির ছাদে ওঠা সেই নিস্তব্ধ-শব্দটা হঠাৎ যেন থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হল লাইন ধরে ভাঙচুর। আমার মাথা ঘুরে গেল। এ তো তা হলে ও বাড়ির ওই নিস্তব্ধ-শব্দের সঙ্গেই এই সব ভাঙ্গচুরের যোগ আছে! কিন্তু তা কি করে হবে? যে শব্দ কানেই শোনা যায় না, তা কি ছুঁড়ে মারা যায়? কিছু ছুঁড়েই তো কিছু ভাঙ্গতে হবে।'

রাতুল বলল, 'শব্দ আবার নিস্তব্ধ হয় নাকি? কি যা তা বলছেন।'

উনি বললেন, 'হয়, যে শব্দ কানে শোনা যায় না, তা-ই হল নিস্তব্ধ-শব্দ।' বলে কি যেন কিছুক্ষণ ভেবে আবার বলতে আরম্ভ করলেন।

'ছুটলাম রায়দের বাড়িতে। ছাদের ঘরে যখন ওর মুখোমুখি হলাম, ও তখন গালে হাত দিয়ে বসে কি যেন সব নক্সা মন দিয়ে দেখছিল। এক নজরে দেখে মনে হল ওগুলো বোধহয় রেডিও বা টিভির নক্সা। মুখ তুলে আমাকে দেখে ও বেশ ঘাবড়েই গেল যেন। আমিও তা দেখে বেশ রাগের ভান করে বললাম, এসবের মানে কি শুনি?'

'আমার কথা শুনে ওর তো মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তবুও জোর করে মুখে অবাক হবার ভাব এনে বলল, কি বলছেন আপনি, তা তো বুঝলাম না!'

'আমি রাগ বাড়িয়ে বললাম, আপনাদের নিজেদের বাড়ির দেওয়াল বা অন্য কারও ঠাকুর ঘরের দেওয়াল নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।

আমি জানতে চাই কোন্ সাহসে আপনি আমার ছাদের ঘরের কার্নিশ উড়িয়ে দিলেন শুনি? জানেন, আমি ক্ষতিপূরণ চেয়ে কোর্টে যেতে পারি।'

'ও আমতা আমতা করে বলল, আপনার ছাদের ঘরের কার্নিশ ভাঙ্গল, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে কি তা তো বুঝলাম না।'

'আমিও থতমত খেয়ে বললাম, আলবাত সম্পর্ক আছে। আপনার বানানো শব্দ রিঁ-রিঁ-রিঁ, না, না, থেমে যাওয়া বিশ্রী নিস্তব্ধ-শব্দের সঙ্গে ছাদের ঘরের কার্নিশ ভাঙ্গার খুব সম্পর্ক আছে। আপনি ওই নিস্তব্ধ শব্দ ছুঁড়েই আমার ঘরের কার্নিশ ভেঙ্গেছেন। শুধু আমার ঘরের কার্নিশ কেন, আপনাদের নিজেদের ছাদের দেওয়ালে ফুটো করেছেন, ফুটো করেছেন বসুদের গিন্নীমার ঠাকুর ঘরের দেওয়ালও। বাড়ির গিন্নীমাকে আপনার খবরটা জানিয়ে দেব ভাবছি।'

'এত সব কথা বলে আমি কিন্তু তখন ঘামছি। কি জানি, ও যদি বলে বসে, মশাই পাগল হলেন নাকি? নিস্তব্ধ-শব্দ ছুঁড়ে বাড়ির দেওয়াল ভেঙ্গেছি আমি? কেন, ওই শব্দ কি কামানের গোলা, না কি? তাহলে কি জবাব দেব? কেন যে বোকার মত এখানে এলাম।'

'ওর কিন্তু বসু বাড়ির গিন্নীমার কথা শুনে মুখ একেবারে আমসী হয়ে গেছে। সে মুখে হাসি এনে বলল, আরে বসুন, বসুন। চা আনতে বলি। চা খেতে খেতে কথা বলা যাক।'

'শুনে আমি তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ও বলল, এ সবের মধ্যে আবার বসু বাড়ির গিন্নীমাকে ডাকছেন কেন? তিনি তো কিছুই বুঝতে পারবেন না। তবে কথা দিচ্ছি, মিস্ত্রী ডেকে গোপনে আপনার ঘরের কার্নিশ মেরামত করে দেব। কথা দিন, এসব কথা নিয়ে আর কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা করবেন না।'

'আমি তো মনে মনে শিউরে উঠলাম, ব্যাপার কি? এ তো দেখছি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বার হয়ে পড়ল। তা হলে তো নিস্তব্ধ কামান দাগার ব্যাপারটা তত মিথ্যা নয়। কিন্তু তা-ই বা কি করে সম্ভব?'

'চা এল। আমি ওকে পাকা কথা দিলাম। ও আমাকে ওর গোপন পরীক্ষার সব কথা খুলে বলল। সবটা যে তার বুঝলাম, তা নয়। যা বুঝলাম, তা হল—শব্দ, তরঙ্গ সৃষ্টি করে। আমাদের কানের পর্দায় ঢেউ উঠে সে শব্দ আমরা শুনতে পাই। কান সব শব্দ-তরঙ্গ ধরতে

পারে না। যে শব্দ-তরঙ্গ কানে ধরা পড়ে না সে শব্দ আমরা শুনতে পাই না। এতো গেল মানুষের কথা। এখন বৈজ্ঞানিকরা যন্ত্রের সাহায্যে এমন শব্দ-তরঙ্গ তুলছেন, যা কানে না শোনা গেলেও তার সূক্ষ্ম তরঙ্গ তার যাত্রাপথে এমনই কম্পন সৃষ্টি করছে যার সামনের ইঁট কাঠ সিমেণ্ট সুরকিতে তৈরি সব বাধাই তুচ্ছ। এমন কি লোহালক্কড়ও বাধা হবে না!'

'আমার দুহাত ধরে ও বলল, দেখুন সত্যি বলছি, ইঁট কাঠ ভাঙ্গার জন্য আমি পরীক্ষা করছি না। আমিও চাই এমন শব্দ-তরঙ্গ তুলতে যার কম্পনের সামনে লোহালক্কড়ও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। আজ সে কাজে আমি প্রায় সফল হয়েছি। এখন আমি লোহালক্কড়ের দিকে হাত বাড়াতে পারি।'

'বেশ কিছুক্ষণ ওর কথাগুলো আমি ভাবলাম। দেওয়াল ফুটো হয়ে আমার ঘরে ছাদের কার্নিশ ভেঙ্গে না পড়লে ওকে আমি ঠিক পাগল ভাবতাম। কিন্তু এখন তো আর তা ভাবা যায় না। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না, শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে লোহালক্কড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে ও পৃথিবীর কোন্ উপকারটা করবে। কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসল। আমি বললাম, বেশ, আপনার কথা নয় আমি মেনে নেব। কিন্তু তার আগে গোটা কতক ব্যাপার আমাকে বুঝে নিতে হবে।'

'ও বলল, বেশ তো বলুন, আপনি কি জানতে চান?'

'আমি বললাম, একদিন আপনার ছাদে বিচিত্র এক শব্দ উঠতেই আমার পোষা এক ঝাঁক পায়রা বাসা ছেড়ে সেই যে উড়ে পালাল আর এমুখো হল না। ব্যাপার কি? কদিন আগে আবার সব বিদঘুটে আওয়াজ উঠতেই চার পাশের কাক চিল চড়াই পাড়া ছাড়া হয়ে গেল, তারই বা মানে কি? আর আজ, কিছুক্ষণ আগে আপনার ছাদে আওয়াজ উঠতেই মেনি বিড়ালটা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ল্যাজ তুলে পালাল, ও— ও আর ফিরবে না বুঝছি, কেন? তাছাড়া তার পরেই আমারই মনে হল তিন ডিগবাজী খেয়ে আমিও যে দিকে খুশি ছুট লাগাই। এমনই বা হল কেন? তারপরই তো শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল ফুটো হয়ে ছাদের কার্নিশ ভেঙ্গে আপনার নিস্তব্ধ-শব্দের কামান বসু বাড়ির গিন্নীমার ঠাকুর ঘরের দেওয়াল ফুটো করল। উনি র্যা র্যা করে তেড়ে উঠতেই না আপনার হুঁস ফিরে এল। এ'সবই বা হল কি করে? সব খুলে বলতে হবে।'

'ও বেশ কিছুক্ষণ মাথা চুলকে বলল, ধরা যখন পড়েই গেছি তখন আপনাকেই সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। তবে ওই শর্ত, কাউকে এখন বলবেন না।'

'কথার শেষে পাশে রাখা একটা বিশাল পেটমোটা স্যুটকেশ কাছে টেনে এনে তার ডালাটা আস্তে খুলে ফেলল ও। অবাক হয়ে দেখলাম তার ভিতরে তারের জটের ছয়লাপ। মাঝে মধ্যে দু-চারটে অন্য আর কি সব যন্ত্র বসান। এক পাশে একটা ছোট হাতল, ঠিক যেন দম দেবার জন্য রাখা। বাক্সটার ডালায় ছোট একটা চোঙ্গের মত যন্ত্র বসান। তার গায়েও তার জড়ান, কল বসান। কি একটা চাবি টিপে দিতেই চোঙ্গটা আস্তে মুখ তুলে বাক্স থেকে একটু উপরে উঠে এক দিকে মুখ করে থামল।'

'ও বলল, এই হল আমার কল। আপনি যার নাম এই মাত্র দিলেন নিস্তব্ধ-শব্দের কামান। বেশ তা-ই না হয় হল এর নাম। এই যে হাতলটা দেখছেন, এটা ঘোরালে ভিতরে হাই ভোল্টেজ কারেণ্ট তৈরি হবে, তা দিয়েই যন্ত্রটার সব কাজ হবে। চাবিগুলো দেখছেন, বোতামগুলো দেখছেন, এগুলো টিপেই এ যন্ত্র দিয়ে আমি আমার খুশি মত কাজ করাতে পারব। এতদিন কোন শব্দ-তরঙ্গ কম্পনের কি ফল তাই আমি পরীক্ষা করছিলাম। লাল বোতামটা টিপলে যে শব্দ-তরঙ্গ কম্পন উঠবে তাতে টিকটিকি, আরশোলা, ইঁদুরের উপরে এমন প্রভাব পড়বে যে তারা জায়গা ছেড়ে পালাবে। হলুদ বোতামে পালাবে কাক চিল পায়রা পাখির দল। সবুজ বোতামটা টিপলে বোধ হয় আশেপাশের সব মানুষরাই ঘর ছেড়ে পালাবে। আর ওই নীল বোতামটি টিপলে যে কি হয় তা তো আপনি নিজেই দেখেছেন। এখন বাকি কালো বোতামের নিস্তব্ধ-শব্দ-তরঙ্গ কম্পন সৃষ্টি করাটাই। ওটা করতে পারলেই আপনার নিস্তব্ধ-শব্দের কামান তার পুরো রূপ পাবে।'

'ও থামল। আমি বললাম, বেশ আমি না হয় মুখ বন্ধ করেই থাকব। তবে এখানে, এই পাড়ার মধ্যে আপনি যদি ভুলেও কোনদিন কালো বোতাম টেপেন তো চারদিকের লোহালক্কড় ভেঙে গিয়ে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটবে তা কি ভেবেছেন ?'

'ও বলল, আমি আজই রাতের গাড়িতে গজবপুর চলে যাচ্ছি। গাঁয়ে শেষ পরীক্ষা চালিয়ে ফিরব ক'দিনের মধ্যেই। তারপর যন্ত্রটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করা যাবে।'

'এর কদিন পরেই কাগজে পড়লাম গজবপুরের ওদিকে এক গোপন মিলিটারী ক্যাম্পে সন্ত্রাসবাদীরা গোপন আক্রমণে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে। সরকার সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। বুঝলাম, এ কাণ্ড কার। সে রাতেই ফিরে এল ও। উস্কোখুস্কো চুল, হাতে ধরা সেই সুটকেশটা। মুখ শুষ্ক, চোখ লাল। আমাকে দেখেই চুপি চুপি বলল, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আমি তো জানতাম না ওখানে কোনও গোপন মিলিটারী ক্যাম্প আছে। ওদের সব লোহার যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্র চুরমার হয়ে গেছে। আমি কালো বোতাম টিপে সেই অতি সূক্ষ্ম নিস্তব্ধ-শব্দ-তরঙ্গ কম্পন সৃষ্টি করতে পেরেছি। এবারে ধরতে পারলেই আমার ফাঁসি হবে।'

'তখন দেশ স্বাধীন হয়নি। ঘোর যুদ্ধ চলেছে জার্মানদের সঙ্গে ইংরাজ-আমেরিকানদের। জার্মানদের অবস্থা কাহিল। ফ্রান্সের মধ্যে দিয়ে ইংরাজ আমেরিকানরা ঢুকে পড়েছে। পিছন থেকে হু হু করে এগিয়ে আসছে রাশিয়ানরা। আমি বললাম, প্রাণ বাঁচানোর সহজ উপায় হচ্ছে যুদ্ধে যোগ দেওয়া। চলুন আমরা যুদ্ধে যোগ দি। তাতে অন্তত সন্ত্রাসবাদী বলে আর ধরা পড়ব না। আমার ভয়, ওকে ধরলে কি আমাকেও ছাড়বে ইংরাজ গোয়েন্দারা? কিছু না করেও শুধু শুধু ফাঁসি যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

'যোগ দিলাম স্যাপার্স আর মাইনার্স দলে। ভাবলাম কি না সব কাণ্ড করতে হবে। ও হরি, ওরা যুদ্ধের জঞ্জাল সাফ করার দল। ফ্রান্সে তখন যুদ্ধের জঞ্জালের পাহাড় জমা হয়েছে, তাই আমাদের সোজা চালান দেওয়া হল ওখানে। ওর সঙ্গে ওর সেই সুটকেশটা, ওটা ও তো কোথাও রেখে যেতে পারে না। ওটা সঙ্গে থাকাই নিরাপদ।'

'ফ্রান্সের যে ইংরাজ সেনাপতির কাছে আমাদের হাজির করা হল তার নাম শুনে তো আমাদের আক্কেল গুড়ুম। জেনারেল গবেট আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে হুঙ্কার ছাড়লেন। শুরু হয়ে গেল ফ্রান্সের যুদ্ধের ময়লা সাফ করার কাজ। এলাইড আর্মি হুড়মুড় করে এগিয়ে চলেছে, পিছন পিছন আমরা জেনারেল গবেটের বাহিনী জঞ্জাল সাফ করতে করতে। সঙ্গে আমি আর রয়, আর রয়ের সঙ্গে তার সেই সুটকেশ। ওটা যে কিভাবে কখন কাজে লাগাব তা আর আমরা ভেবেই পাচ্ছিলাম না।'

'এমন সময় সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা ঘটল। আমরা তখন গুলডেনবার্গের ব্রীজের ধারে ক্যাম্প করে আছি। এদিকে আমরা, ওদিকে বহু কিলোমিটারের মধ্যে কেউ নেই। বড় বড় সেনাপতিরা নক্সা পেতে অঙ্ক কষে দেখেছেন ওদিকে কোনও ভয় নেই।'

'একদিন মাঝ রাতে কান ফাটা প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে চার দিকে আগুনের মাঝে আমরা লাফিয়ে উঠে দেখলাম হাজারে হাজারে জার্মান সৈন্য ব্রীজের ওদিক থেকে কিলবিল করে এগিয়ে আসছে ব্রীজের দিকে। সামনে ওদের হাল্কা কামানের সার, আর ট্যাঙ্ক! সর্বনাশ, ব্রীজ পার হয়ে এদিকে আসা মানে তো গোটা এলাইড্ আর্মির পিছনে আক্রমণ করা। তা হলে তো সব তছনছ হয়ে ভণ্ডুল হয়ে যাবে। জেতা যুদ্ধে হেরে যাবে ইংরাজ-আমেরিকানরা।'

'জেনারেল গবেট কোমরের বেল্ট আঁটতে আঁটতে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগালেন, ওঁর মুখে তখন খাঁটি ভারতীয় বুলি, আগে বাড়ো আগে বাড়ো, জলদি রোকো, জলদি রোকো।'

'রোকো তো, কিন্তু রুখবে কি দিয়ে? শাবল-বেলচা-গাঁইতি দিয়ে? ব্রীজ পাহারা দিচ্ছিল যে সব লালমুখো জোয়ানগুলো, তারা তো 'ও মাই গড' বলে হাতের বন্দুক ফেলে সোজা তাঁবুর আড়ালে লুকাল। জেনারেল গবেটও এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন যখন, আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম, স্যার হুকুম হয় তো গোটা জার্মান দলটাকে আমরা দুজনেই রুখে দিতে পারি। তবে কথা দিন, পরে যেন আমাদের ধরে ফাঁসি না দেওয়া হয়।'

'সাহেব তো হাঁ। বললেন, চাপে পড়ে আমারই মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তোমাদের দুজনের দেখছি খারাপই হয়েছে।'

'আমরা বললাম, না হুজুর তা নয়। ওদিকে জার্মানরা ব্রীজের ধার পর্যন্ত চলে এসেছে। পাকা কথা দিন এখুনি, নইলে....'

'সাহেব দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, বহুত খুব। কথা দিলাম। জার্মানদের হাতে না মরলে, পরে তোমাদের ফাঁসি নয়, কোর্ট মার্শাল হবে। তার দেরী আছে, এখন কি করতে হবে বল।'

'ওঁর হাত ধরে আমি সামনের একটা কামানের গোলার গর্তে লাফিয়ে পড়লাম। রয় স্যুটকেশটা খুলে চোঙ্গের মুখটা জার্মানদের দিকে করে দিল। আমি প্রাণপণে যন্ত্রের হাতলটা ঘোরাতে লাগলাম। সঙ্গে

সঙ্গে একটা চাপা শব্দ উঠল, বিজ-বিজ-বিজ-বিজ। রয় হাত বাড়িয়ে একটা বোতাম টিপে দিল। কয়েক সেকেণ্ড বাদে ওদিকের গোটা জার্মান বাহিনীর সব জোয়ানরা যাকে বলে পাঞ্জাবের ভাঙ্গাড়া নাচ তাই শুরু করে দিল। হাতের অস্ত্রগুলো ওরা একবার এদিক একবার ওদিক করে সে কি নাচ! জেনারেল গবেট তো চাপা গলায় 'ও মাই গড' বলে টিপ করে পেছনে হেলে পড়ে গেল। তবে খাঁটি গোরার প্রাণ তো, তার উপরে ভারতের মাটিতে সবাইকে দাবড়েই জেনারেল হয়েছেন, তাই তখুনি উঠে বসে বড় বড় চোখ করে সামনের অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলেন।'

'মিনিট পাঁচেক ভাঙ্গাড়া নাচ নাচাল ওদের রয়। তারপরই আর একটা বোতাম টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা আওয়াজটা বদলে গিয়ে চোঙ্গের সামনের দিকে সেই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ-শব্দ তরঙ্গ ছুটে যেতে লাগল। যে বিরাট ট্যাঙ্কটা সবার সামনে হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছিল, মুহূর্তে বুম করে আওয়াজ তুলে খই ফোটার মত সেটা ফুটে গেল। ভিতর থেকে ধোঁয়া আর আগুন বার হতে লাগল। রয় তা দেখে বললে, হাতল আর একটু জোরে ঘোরান তো।'

'আমি দ্বিগুণ জোরে হাতলে মোচড় দিতেই অবিশ্বাস্য কাণ্ড সব ঘটল! জার্মানদের হাতের বন্দুক, পিস্তল, অটোমেটিক গান থেকে আরম্ভ করে আশপাশের যত কামান, গাড়ি, যত ট্যাঙ্ক, সবই বুম্ বুম্, কট্ কট্, করে একের পর এক খই ফোটার মত ফুটে যেতে লাগল। এমন কি বাছাদের প্যাণ্টের লোহার বকলসগুলোও ফুটে গিয়ে সে যা হল, তা আর বলা যায় না। ওরা লড়বে কি। প্যাণ্ট সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।'

'জেনারেল সাহেব মহা খুশি হয়ে বললেন, সাবাস বেটা, আউর থোড়া কুছ কর, ওহি ব্রীজঠো উড়ায় দেও। তব বেটা লোগ আর ইধার আনে পারেগা নেই।'

'রয় বলল, ও আর এমন বেশী কথা কি সাহেব। তবে ব্রীজ ভেঙ্গে শেষে ফ্যাসাদে পড়ব না তো? ওদিকে তো ফাঁসির দড়ি তৈরি হয়ে আছে।'

'জেনারেল সাহেব বললেন, গুল্লি মারো ফান্সি উন্সি কো, হামারা হুকুম ব্রীজ উড়াও।'

'রয় বলল, আরও একটু জোরে হাতলে মোচড় দিন তো। ও ব্রীজ তো ভারি ব্রীজ, হাওড়ার ব্রীজই উড়ে যাবে না! দিন প্রাণপণে জোরসে মোচড়।'

'কলে জোরে মোচড় দিতেই সারা শরীর কেমন যেন করতে লাগল। সে অল্প কিছুক্ষণের জন্য। চারদিক কাঁপিয়ে হুড়মুড় করে গোটা ব্রীজটা তালগোল পাকিয়ে জলের মধ্যে ভেঙ্গে পড়ল। জল যা ছিটকাল, তাতে আমাদেরও জামা ভিজে গেল। জেনারেল আবার 'ও মাই গড' বলে বসে বসেই ঢিপ করে পড়ে গেলেন। মাথায় জলটল দিয়ে সুস্থ করতে হল তাকে।'

ভদ্রলোক থামলেন। শূন্য কাপটাতে হাতের সিগারেটের শেষটুকু ফেলে বললেন, 'তাই বলছিলাম, আপনার দাদা কিসে ব্রীজটা ভাঙ্গলেন? এমনি কামান দেগে, নাকি নিস্তব্ধ-শব্দের কামানে? আজকাল নানান দেশে শব্দ নিয়ে নানান পরীক্ষা হচ্ছে। ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র বার হল বলে।'

প্রতুল এসব কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'যন্ত্রটার কি হল শেষ পর্যন্ত?'

'সে তো অন্য কথা।' বললেন রুদ্রমশাই, 'ওই একটা কাণ্ডের জন্যই জার্মানরা শেষ পর্যন্ত হারল। রয় পেল ভি, সি, সঙ্গে আইসেনহাওয়ারের পিঠ-চাপড়ানি। আর পেল প্রমোশন। সাধারণ থেকে এক ধাক্কায় মেজর। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল আমার সঙ্গে। আমি গোটা যুদ্ধ যুদ্ধের জঞ্জাল সাফ করে পেনসন পেলাম, কিন্তু ও যে ওর নিস্তব্ধ-শব্দের কামান নিয়ে কোথায় গেল, তার আর খোঁজ পেলাম না। বোধ হয় সরকারের এটা একটা প্রচণ্ড গোপন অস্ত্র। যেখানে সেখানে যখন তখন এর ব্যবহার করা হবে না। তাই অস্ত্র সমেত ও গায়েব। আর আমি কোথাও কোন যুদ্ধে ব্রীজ ভাঙ্গার কথা শুনলেই রয়-এর খোঁজ করি। যেমন আজও করেছি। কিন্তু সব বৃথা, কে জানে, কোথায় আছে ও এখন।'

আমাদের সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে উনি উঠে পড়লেন। বললেন, 'আজ চলি। পরে আবার দেখা হবে আশা করি।'



বনমোরগের বাসা

সঙ্কর্ষণ রায়

"হ্যালো জিয়োলজিস্ট।"

চমকে উঠলাম আমি। নির্জন বনের মধ্যে পাথর পরীক্ষা করছিলাম। জায়গাটি ঘাটশিলার পশ্চিমের একটি পাহাড়। পাহাড় চিরে বেরিয়ে এসেছে নালা। নালার ধারে পাথরের স্তূপ থেকে পাথর ভেঙ্গে লেন্সের সাহায্যে তাঁর মধ্যে তামার লক্ষণ ফুটে উঠেছে কি না বোঝার চেষ্টা করছি। আমার ধারে কাছে কেউ কোথাও আছে বলে মনে হয় নি, কাজেই এই ডাক শুনে অবাক হই। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি যে খাকী পোশাক-পরা একজন য়ুরোপীয়ান বৃদ্ধ এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পেছনে। আমাকে চমকে উঠতে দেখে তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, "ভয় পেয়ো না, আমি ই, এফ, ও, মারে, এই সিংভূমের বনের মধ্যে আমার কয়েকটা খনি আছে। রাখা মাইন্‌স ও কেণ্ডাডিতে আমার বাংলো আছে। এখন আছি রাখা মাইন্‌সের বাংলোতে। আমার সঙ্গে আছে আমার মেয়ে।"

"এখানেও আপনাদের খনি আছে বুঝি ?" আমি প্রশ্ন করি।

"না।" মারে জবাব দিলেন, "এখানে মহুয়াবন পরীক্ষা করছি।"

"মহুয়াবন পরীক্ষা করছেন ! মহুয়াবনের মধ্যে পরীক্ষা করার মত কিছু আছে নাকি ?"

"আছে বই কি। এস আমার সঙ্গে, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মারেকে অনুসরণ করে পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠতে থাকি। পেরিয়ে যাই কুরচি ও বনসীম লতার ঝোপ। তারপর পাহাড়ের কোলে এমন একটি জায়গায় পৌঁছাই যেখানে ঘন ঘাস কার্পেটের মত আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে। এই ঘাসের আবরণ ফুঁড়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে অনেকগুলো মহুয়াগাছ।

সময়টা হল মার্চ মাসের শেষ। মহুয়াগাছের পাতা ঝরা ও ফুলফোটার সময় এটা। সব পাতা ঝরে গিয়ে প্রত্যেকটি গাছ ফুলে ভরে গিয়েছে। ফুল ফুটতেই ঝরে পড়ছে। ঝরা মহুয়াফুল গাছের তলায় যেন আঁচল বিছিয়ে রেখেছে।

"দেখেছ তো কত মহুয়াফুল!" মারে উত্তেজিত স্বরে বললেন, "অজস্র ফুল জমেছে, অথচ এখানকার ভাল্লুকরা তা স্পর্শও করছে না। জানো, নিশ্চয়ই যে এ বনে অসংখ্য ভাল্লুক আছে, ভাল্লুকের ভয়ে চিতাবাঘ, এমন কি বাঘও এখানে ঘেঁষতে সাহস পায় না। সেই ভাল্লুক এই মহুয়াবনে ফুল খেতে আসছে না, এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হতে পারে!"

"ঠিক বলেছেন, খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার।" আমি বললাম, "কারণ মহুয়াফুল ভাল্লুকের প্রিয় খাদ্য।"

"এই পাহাড়ের আশেপাশে অবশ্য আরও মহুয়াবন আছে, ভাল্লুকরা সেখানেই ভিড় করছে। ভাল্লুকরা এখানকার মহুয়াফুল স্পর্শও করছে না, কেন ওদের এই বাছবিচার? ভাল্লুক শুধু নয়, হরিণ খরগোস বুনো শুয়োর কেউই আসে না এখানে। এমন কি সাপ ও মেঠো ইঁদুরদেরও দেখা পাই না। পাখিরাও আসে না।"

"কেন?" আমি প্রশ্ন করি।

"জানি না।" মারে জবাব দিলেন, "তবে জানার চেষ্টা করছি। গত সাত দিন ধরে এখানে ক্যাম্প করে আমার মেয়ে ও আমি বোঝার চেষ্টা করছি, পশু-পাখি-সরীসৃপরা সকলেই এ জায়গাটি এড়িয়ে চলছে কেন।"

"এখনকার জল বিযাক্ত নয় তো? ভাল্লুকরা এখানকার মহুয়াগাছের ফুল খায় না, তার কারণ হয়তো এই যে এখানকার মহুয়াফুল বিষিয়ে আছে।"

"আমরা তাই ভেবেছিলাম। এখানকার মহুয়াফুল ও জল বিষাক্ত কি না পরীক্ষা করার জন্য আমাদের পোষা একটি মোরগকে এখানকার মহুয়াফুল ও জল খাইয়েছি। কিন্তু তাতে তার কোন ক্ষতি হয় নি।"

"এমনও তো হতে পারে যে মোরগের বিষ হজম করার ক্ষমতা আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন মারে। আমার মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বললেন, "এ সম্বন্ধে তোমার কি কিছু জানা আছে? মানে, বিষ খেয়ে মুরগী বা মোরগের হজম করার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন্ বইয়ে পড়েছ তুমি?"

"না, কোন বইয়ে পড়ি নি।" আমি জবাব দিলাম, "তবে সেদিন একজন পরমাণু বিজ্ঞানী হিরোসিমা-নাগাসাকির ওপরে পরমাণু বোমা বর্ষণের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে পারমাণবিক বিস্ফোরণে সবচেয়ে কম ক্ষতি-গ্রস্তদের মধ্যে মোরগ ও আরশুলার কথা বলেছিলেন।"

"বলো কি!" মারে লাফিয়ে ওঠেন।

মারের সঙ্গে সঙ্গে সামনের ফাটলের মধ্যে কি একটা লাফিয়ে ওঠে।

ফাটলটির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "ঐ ফাটলের মধ্যে কে বা কারা আছে বলে মনে হচ্ছে। একেবারেই কোন জীব-জন্তু নেই এখানে, তাতো নয়!"

এক দৃষ্টে লতাঝোপ দিয়ে ঢাকা ফাটলটির দিকে তাকিয়ে থেকে মারে বললেন, "জ্যান্ত কিছুই হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত এ তল্লাটে জীবিত কোন কিছুরই দেখা পাইনি! লাফাচ্ছে, অথচ চোখে দেখা যাচ্ছে না। দাঁড়াও, যাতে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে তার ব্যবস্থা করছি।"

ব'লে মারে তাঁর কাঁধে ঝোলানো শট্-গানটি তুলে ঐ ফাটলের দিকে তাক করে গুলি করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ জাগে, ফাটলের ওপরে লতাঝোপের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে চার পাঁচটা বন-মোরগ।

আমি বললাম, "এই ফাটলটা তা হ'লে বনমোরগের বাসা। যেখানে আর কোন পশুপাখি ভুলেও পা দেয় না, সেখানে বাস করে বন-মোরগের পাল। এরা নিশ্চয়ই এখানকার জল ও মহুয়াফুল খায়। আপনার পোষা মোরগের মত এই বনমোরগগুলো বিষ খেয়ে হজম করছে...."

"ইউরেকা।" মারে চিৎকার করে উঠলেন।

মারের শট্-গানের আওয়াজ শুনে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মেয়ে। তিনি অবাক হয়ে মারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শট্-গান দিয়ে গুলি করে এত আহ্লাদ কেন তোমার। কিছু শিকার করেছ বলে তো মনে হচ্ছে না!"

"শিকার না করলেও আবিষ্কার করতে চলেছি।" মারে চিৎকার করে ওঠেন, "টাটানগর থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে আসি, তারপর দেখতেই পাবে......একটু ধৈর্য ধর...."

"কিন্তু তোমার তো এখানে থাকা চলবে না।" আমার মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে মারে বললেন, "এখনই চলে যাও...."

মারের মেয়ে বললেন, "লাঞ্চের সময় হ'ল, ইনি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে গেলে পারতেন।"

"না না।" মারে চিৎকার করে বলেন, "লাঞ্চ নয়। শোন ছোকরা, লাঞ্ছিত যদি না হতে চাও, এখনই পালাও......."

পালালাম। মোসাবনী-টাটানগরের সড়ক দিয়ে মাটিগাড়া গ্রামের দিকে যেতে থাকি। ওখানে একটি পরিত্যক্ত বাংলোর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে এখানকার বনে পাহাড়ে ভূতাত্ত্বিক গবেষণা চালাচ্ছি।

মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় একটা জীপ এসে দাঁড়াল আমার পাশে। জীপ থেকে নেমে এলেন ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থার জিয়োলজিস্ট বসন্তরাও খেদকর। আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, "হ্যালো জিয়োলজিস্ট, তোমাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে! হাতি তাড়া করেছে নাকি?"

"হাতি নয়, মারে সাহেব তাড়া করেছেন।" আমি জবাব দিলাম, "এই পাশের পাহাড়ে ক্যাম্প করে আছেন তিনি তাঁর মেয়েকে নিয়ে।"

"ব্যাপার কি বলো তো?" বসন্তরাও উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

ব্যাপারটা খুলে বলি আমি বসন্তরাওকে। সব কথা শুনে মারে সাহেবের মত তিনিও চিৎকার করে উঠলেন, "ইউরেকা।"

বসন্তরাওয়ের মুখের দিকে হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, "আপনিও ইউরেকা বলছেন! কিসের জন্য বলছেন? মারে তো ওখানে আট দশদিন ধরে ক্যাম্প করে আছেন, কিন্তু আপনি

ওখানে পা-ও দেন নি। কথায় বলে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি, আপনারও তাই হয়েছে দেখছি।"

বসন্তরাও বললেন, "তোমার কমনসেন্স প্রয়োগ করলে তুমিও ইউরেকা বলতে। অন্য সব জীবজন্তু পশুপাখি যা সইতে পারে না, অথচ বনমোরগ বা গৃহপালিত মোরগ-মুরগী যা অনায়াসে হজম করে ফেলছে তা হ'ল তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিও-য়্যাকটিভিটি। হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঐ দুটি শহরের মোরগ ও মুরগীদের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারে নি। অতএব আমার ধারণা পাশের ঐ পাহাড়ে তেজস্ক্রিয় ধাতু য়ুরেনিয়াম ও থোরিয়াম আছে পাথরের সঙ্গে মিশে। তা থেকে বেরিয়ে আসা তেজস্ক্রিয়তা ওখানকার মাটি-জল-ফুল-ফলকে বিষিয়ে দিয়েছে। তাই ওখানে বনের পশু-পাখিরা যায় না, মহুয়াগাছের তলায় পড়ে থাকা ফুল ভাল্লুক বা অন্য কোন প্রাণী স্পর্শও করে না। মারে-সাহেব টাটানগর থেকে তাঁর যন্ত্র নিয়ে আসবেন বলছিলেন না? তিনি তাঁর যন্ত্র নিয়ে আসার আগে আমার যন্ত্র বসাব ওখানে, এই দেখ, আমার গাড়িতেই আছে আমার যন্ত্র।"

বলে খেদকর গাড়ির পেছনে রাখা একটি বাক্স থেকে তুলে আনলেন বাক্স আকারেরই একটি যন্ত্র। ওটাকে হাতে নিয়ে তিনি বললেন "চল তোমার বন-মোরগের বাসায়, মানে পাহাড়ের গায়ের ঐ ফাটলের কাছে।"

বন-মোরগের বাসায় গিয়ে বনমোরগের দেখা মেলে না। হয় তারা পালিয়েছে, নয়তো ফাটলের একেবারে ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে। খেদকর ফাটলের মুখে যন্ত্রটি রেখে বললেন, "এই যন্ত্রটি কি বুঝতে পারছ তো? এটা হচ্ছে গাইগার-মূলার কাউণ্টার, যা দিয়ে তেজস্ক্রিয়তা মাপা হয়।"

আমি বললাম, "এই ফাটলের ওপরে যন্ত্রটা বসালেন কেন? আপনি কি মনে করেন যে এই ফাটলের মধ্যে তেজস্ক্রিয় ধাতু লুকোনো আছে?"

"আমি মনে করি যে ফাটল পাথরের স্তর ভেদ করে তেজস্ক্রিয় য়ুরেনিয়ামের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। আমার অনুমান যে ভুল নয়, তার প্রমাণ এখনই দিচ্ছি..."

ব'লে গাইগার-মূলার কাউণ্টারটির সুইচ্ টিপে দেন খেদকর।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে ওঠে যন্ত্রটি, নড়ে ওঠে ডায়ালের ওপরে তার

কাঁটা। দেখতে দেখতে কাঁটাটি চূড়ান্ত মাত্রায় গিয়ে পেঁছায়, সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে সোচ্চার হ'য়ে ওঠে তেজস্ক্রিয়তা-সূচক শব্দ।

যন্ত্রটির সঙ্গে সঙ্গে খেদকর ও আমি দুজনেই উত্তেজিত হয়ে উঠি। খেদকর বললেন, "মারের আবিষ্কারটা আমরাই মেরে দিলাম, কি বল? এখানে য়ুরেনিয়াম আছে···"

ইতিমধ্যে মারে এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের পেছনে। আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখোমুখী হতেই তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার আগেই তোমরা আবিষ্কারটা করে ফেললে!"

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "যাতে একাই আবিষ্কারটা করতে পারি আমি তার জন্য তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমার মেয়ে তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি লাঞ্চের বদলে তোমাকে লাঞ্ছনা দিলাম। সে যাই হোক, যার দ্বারাই এই আবিষ্কারটা হয়ে থাকুক, ভূবিজ্ঞানী হিসাবে একে স্বাগত জানাই। চল আমার ক্যাম্পে, ভুট্টাপোড়া ও হরিণের মাংস দিয়ে এই আবিষ্কারকে সেলিব্রেট করব····"

সিংভূমের জঙ্গলে য়ুরেনিয়াম আবিষ্কার খুবই চমকপ্রদ ব্যাপার, কারণ বড় বড় ভূবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে সিংভূম জেলায় য়ুরেনিয়াম নেই।





ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বাবা যখন মাকে বললেন, 'এখন তো মিঠুয়াদের স্কুল ছুটি, চল, মাসখানেকের জন্য সবাই মিলে ঘুরে আসি বীরভূম থেকে—', তখন মিঠুয়ার খুব আনন্দ হয়েছিল।

কারণ ধুলো, কালি, ধোঁয়া, লোডশেডিং, যানবাহনের জটিলতা—সব মিলিয়ে কলকাতার জীবন ক্রমে এক ঘেয়ে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া মিঠুয়ার বেশির ভাগ বন্ধুরাই এখন কলকাতার বাইরে। তাই স্কুলের এই একমাস ছুটি কলকাতায় একলা কীভাবে কাটাবে ও। তার চেয়ে বরং বীরভূমের খোলামেলা উদার পরিবেশে সময়টা কাটবে ভালো।

মিঠুয়ার বাবা এগরিকালচারাল অফিসার। তাই বাবার অফিসের কাজে মাসখানেকের জন্য সিউড়ি শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে এক এগরিকালচার ফার্মে গিয়ে উঠল ওরা সবাই। ওরা মানে বাবা, মা, দিদি পরমা ও মিঠুয়া। দিদি পরমা কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী।

সেই এগরিকালচার ফার্মের ভেতরে সুন্দর ছবির মতো বাংলো। দু'টো শোবার ঘর, রান্নাঘর, ডাইনিং রুম, বাথরুম। কলের জল অবশ্য নেই, কিন্তু জলের জন্য রয়েছে বাঁধানো কুঁয়ো, কুঁয়োর জল টলটলে পরিষ্কার। এই জল খেয়ে কদিনেই ক্ষিদে বেড়ে গেল অনেক। বেশ বড় আকারের ফার্ম। সেখানে কত রকমের তরিতরকারি যে চাষ হচ্ছে, তা না দেখলে

বিশ্বাস করা শক্ত। এগরিকালচার ফার্মের ইনচার্জ মিঃ পাল সেদিন বিকেলে মিঠুয়া আর পরমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো ফার্মটা দেখাচ্ছিলেন। এই ফার্মে ফলানো বিরাট সাইজের শালগম দেখে মিঠুয়া আর পরমা তো দারুণ অবাক। এত বড় শালগম ওরা কেউ কোনদিন চোখেই দেখেনি। শুধুই কি শালগম,—ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, মটরশুঁটি, বেগুন, টমেটো যা ফলেছে, তা দেখলে মন ভরে ওঠে। ফার্মের তাজা তরকারি, কী স্বাদ তাতে। পরমা তেমন কিছু রান্নাবান্না শেখেনি, তবু সেদিন ত্বপুরে পরমার রান্নাই অমৃত মনে হচ্ছিল।

ফার্মের বাইরে চারপাশে ধানক্ষেত। ধান পেকে হলুদ হয়ে গেছে। তাই মাঠে মাঠে ধান কাটা চলছে, ভোর থেকে রাত পর্যন্ত।

মিঠুয়ার সারাদিন কাটে জঙ্গলে মাঠে ঘুরে। কখনো ফার্মের কর্মীদের সঙ্গে থেকে সব্জি ফলানোর খুঁটিনাটি শেখে, নয়তো ধান ক্ষেতে গিয়ে চাষীদের ধানকাটা দেখে, আবার কখনো বা জেলেরা মাছ ধরবার জন্য জাল ফেললে ছুটে চলে যায় পুকুর পাড়ে। বাবা ব্যস্ত থাকেন ফার্মের নানা ধরনের কাজে, মা থাকেন রান্নাঘরে অথবা বারান্দায় বসে রোদ পোহান। আর পরমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে মিঃ পালের মেয়ের সঙ্গে। ওখানেই কেটে যায় অনেকটা সময়। তখন বনে-বাঁদাড়ে একা একা বেড়ায় মিঠুয়া।

সেদিন বিকেলে একটা টিলার মাথায় ঘাসের ওপর হাত পা মেলে সটান হয়ে শুয়ে ছিল মিঠুয়া। মাথার ওপরে ঘন নীল আকাশ, বিকেলের পড়ন্ত রোদ। শুয়ে শুয়েই দেখতে পাচ্ছিল গরুর গাড়িতে কাটা ধান চাপিয়ে ঘরের দিকে ফিরছে চাষীর দল। অর্জ্জুন গাছের নিচে নরম সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে চোখ বুজে এলো মিঠুয়ার।

বেশ খানিকক্ষণ পর হঠাৎ কীসের শব্দে যেন ঘুম ভেঙ্গে যায় মিঠুয়ার। চোখ কচলে উঠে বসে দেখে মিঠুয়া, ওর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এক সবুজ পরী। কোন পরীকে আজ পর্যন্ত নিজের চোখে দেখে নি, পরীদের কথা যা বইতে পড়েছে, আর আঁকা ছবি দেখেছে, তা দেখে একে পরী বলেই মনে হলো। দেখতে অবিকল যে কোন সুন্দরী মেয়ের মতো, শুধু কাঁধের সঙ্গে লাগানো ত্ব'টো সবুজ পাখা। পরীর শরীরে জড়ানো সবুজ রংয়ের পোষাক। পোষাকটা বাঙ্গালী মেয়ের শাড়ি নয়, অনেকটা জাপানী মেয়েদের কিমোনোর মতো। চোখের এত সামনে পরীকে দেখে মিঠুয়া তো দারুণ অবাক। ওর ধারণা ছিল পরীরা নিতান্তই কল্পনার জগতের

মানুষ, কিন্তু তাদেরও যে চোখ দিয়ে দেখা যায়, ইচ্ছে করলে হাত দিয়ে ছোঁয়াও যায়, একথা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না মিঠুয়া।

ওকে দেখে হাসল সবুজ পরী। সবুজ পরীকে এত কাছে দেখে শুধু অবাক নয়, সত্যি বলতে কি, একটু ভয়ও পেয়েছিল মিঠুয়া, কিন্তু পরীর মিষ্টি হাসিতে মিঠুয়ার মনের ভয় গলে জল হয়ে গেল।

পরীর মিষ্টি হাসির উত্তরে কিছু নিশ্চয়ই বলা দরকার। কিন্তু পরীর সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলবে ভেবে পেল না মিঠুয়া। পরীরা কি বাংলা ভাষা বোঝে, না বলতে পারে? নাকি ইংরেজী, জাপানী, চীনা, ফরাসী অথবা জর্মন?

কিন্তু মিঠুয়া কিছু বলবার আগেই সবুজ পরী পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'তোমার নাম তো মিঠুয়া, তাই না—?'

মিঠুয়া তো অবাক। এ এক আশ্চর্য পরী, শুধু মিঠুয়ার ভাষা নয়, নামটা পর্যন্ত নিমেষে জেনে ফেলেছে।

সবুজ পরী আগের মতোই অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে বলে চলে, 'তুমি অবাক হচ্ছ আমি তোমার ভাষা, নাম জানলাম কী করে, তাই না! আসলে আমরা তো পরী, তাই এই পৃথিবীতে কোথায় কে রয়েছে, কী হচ্ছে, তার সব হদিস পেয়ে যাই।' 'তুমি কি এই পৃথিবীতেই থাক, নাকি অন্য কোথাও? তোমার নাম কি? তোমার বাবা-মা-ভাই-বোন আছে?' এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে হাঁপাচ্ছিল মিঠুয়া।

মিঠুয়ার কথা শুনে অল্প কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সবুজ পরী, তারপর একটু যেন দুঃখের স্বরে বলল, 'আমি কিন্তু পরী নই, অনেকটা তোমাদের মতোই মানুষ। তবে পৃথিবী নয়, অন্যগ্রহের মানুষ। কিন্তু সেখান থেকে বেরোতে হলো আমাকে। অনেক দুঃখে কষ্টে তোমাদের গ্রহে এসেছি, আসতে হয়েছে।' পরীদেরও যে দুঃখ আছে, তাদেরও যে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়, একথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল মিঠুয়া। মনে মনে খানিকটা সহানুভূতিও বোধ করল সবুজ পরীর জন্য।

তাই বিষণ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করে মিঠুয়া, 'কেন, কেন তুমি আমাদের এই পৃথিবীতে এলে নিজের ঘর বাড়ি দেশ ছেড়ে? তোমার বাবা-মা কি তোমার জন্য ভাববে না, কষ্ট পাবে না!'

মিঠুয়ার কথা শুনে সবুজ পরী হাসল। কিন্তু সে হাসি বড় দুঃখের।

করুণ গলায় বলল সবুজ পরী, 'আমার বাবা-মা বোধহয় আর বেঁচে

নেই। ওদের বড় কঠিন অসুখ হয়েছে। ডাক্তাররা ওদের জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের গ্রহে তৈরি হয় যত রকমের ওষুধ, তা' সব খাইয়েও বাবা-মাকে সুস্থ করে তোলা যাচ্ছে না—।'

উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করে মিঠুয়া, 'কেন, কী এমন শক্ত অসুখ করেছে তোমার বাবা মায়ের—?'

'সে অসুখের নাম বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। তোমাদের পৃথিবীতে তো এখনো সেই রোগ হয় নি। তবে হবে নিশ্চয়ই একদিন। পৃথিবীর যা অবস্থা দেখছি, তাতে হয়তো আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সে রোগ দেখা দেবে এখানে।' 'সত্যি!' শংকিত গলায় বলে মিঠুয়া।

সবুজ পরী বলে চলে, 'আমার বাবা-মায়ের হয়েছে আসবুজা অসুখ। এই অসুখ হয় যদি দীর্ঘদিন মানুষ সবুজ তরিতরকারি না খেতে পায় তবেই। জান তো, আমার বাবা-মা গত দশ বছর কোন সবুজ তরিতরকারি খায় নি। আমিও খাই নি। তবে আমার বয়েস কম, তাই এখনো রোগে ধরে নি আমাকে। কী বলব তোমাকে আমাদের গ্রহের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে। বাতাসে অক্সিজেন মাঝে মাঝে এত কমে যায় যে তখন আমাদের পরে নিতে হয় অক্সিজেনের মুখোশ। কলকারখানার ধোঁয়ায়, আবর্জনায় নদী পুকুরের মাছ মরে গেছে। মাটির উর্বরা শক্তি এত কমে গেছে, যে মাটিতে আর কোনরকম চাষবাস করা যাচ্ছে না। কিন্তু বলো, কারখানায়, ল্যাবরেটরিতে তৈরী করা খাবার খেয়ে মানুষ কতদিন সুস্থ থাকতে পারে!'

পরীর কথা শুনে খুবই বিষণ্ণ বোধ করে মিঠুয়া। কী করে সবুজ পরীকে সাহায্য করা যায়, সে কথাই ভাবতে থাকে। ও বলে, 'আমার বাবা এগরিকালচারাল অফিসার। আমাদের ফার্মে অনেক তরিতরকারি আছে। নেবে তুমি? যত খুশি, তুমি নিয়ে যাও—।' মিঠুয়ার কথায় পরীর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ, পৃথিবী থেকে টাটকা সবুজ তরিতরকারি নিয়ে যাবার জন্যই তো এসেছি। গ্রহের ডাক্তাররা বলেছেন, 'পৃথিবী থেকে যদি টাটকা সবজি নিয়ে বাবা-মাকে খাওয়াতে পারি, তাহলে হয়তো ওঁরা এবারের মতো বেঁচে যাবেন। চল, যাই তোমার সঙ্গে। দেখি, তোমাদের ফার্মের তরকারি খাইয়ে যদি বাবা-মাকে বাঁচাতে পারি—।'

সবুজ পরী আর মিঠুয়া দুজনে একসঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। পৃথিবীর

মাটি সবুজ পরীর অপরিচিত, তাই সবুজ পরী ঠিক যেন হাঁটতে পারছে না, অনেকটা উড়ে চলেছে রাস্তার ওপর দিয়ে।

এদিকে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পাড়াগেঁয়ে জায়গা, ইলেকট্রিকের আলো নেই। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় চলতে কিছুটা অসুবিধে হচ্ছে। মিঠুয়া রাস্তার ওপর একবার হোঁচট খেতেই সবুজ পরী কী যেন করল, সুইচ অন করার মতো খুট করে একটা শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে সামনের রাস্তাটা যেন আলোয় ভরে গেল। মিঠুয়া তাকিয়ে দেখে, সবুজ পরীর সারা শরীর নীলাভ আলোয় ঝকঝক করছে।

ফার্মের কাছাকাছি আসতেই সবুজ পরী বলল, 'আমি এই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি। তুমি বরং এই থলেটা নিয়ে—'

সবুজ পরীর হাত থেকে থলেটা নিয়ে মিঠুয়া পা টিপে টিপে এগলো ক্ষেতের দিকে। ও ভাবছিল, অন্ধকারের মধ্যে কী করে ক্ষেত থেকে তরকারি তুলবে? কিন্তু সবুজ পরীর দেওয়া থলেটার ভেতর থেকেও হালকা আলো বেরিয়ে আসছে। ফলে আশেপাশের খানিকটা জায়গা বেশ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষেতের ভেতর থেকে বেশ কিছু বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি আর টমেটো তাড়াতাড়ি তুলে ফেলল। বলা যায় না, কেউ দেখে ফেললে হয়তো বকবে ওকে। কিন্তু এত তরিতরকারি তুলে ফেলে একটু চিন্তায় পড়ে। সবুজ পরীর দেওয়া থলেটা বড়ই ছোট, এর ভেতরে কি এত সব জিনিস ধরবে? কিন্তু এটা এক আশ্চর্য ম্যাজিক থলে। এর ভেতরে চারটি বাঁধাকপি, তিনটি ফুলকপি, এক ডজন ওলকপি, আর চার-পাঁচ কেজির মতো টমেটো এটে গেল অনায়াসেই। তবুও যেন আরো অনেকটা জায়গা থেকে গেল থলের ভেতরে। শুধু তাই নয়, এতসব জিনিস ভরবার পরও থলেটা সেই আগের মতোই হালকা, ফুরফুরে। তরকারি ভরা থলেটা নিয়ে মিঠুয়া ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো আগের জায়গায়। কিন্তু মিঠুয়া অবাক, কেউ তো সেখানে নেই। অথচ—। এবার হাতের থলের দিকে তাকায়, যেটা ওকে দিয়েছিল সবুজ পরী। কিন্তু তাকিয়ে দেখে, সবুজ পরীর দেওয়া থলে তো নয়, সেটা ওদের নিজেদেরই থলে।

মিঠুয়া বিষণ্ণ হয়ে ভাবে, তবে কি এতক্ষণ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিল? অথচ তাই বা কী করে সম্ভব! সবুজ পরীর বাবা-মায়ের আসবুজা অসুখের ব্যাপারটা কিন্তু মিঠুয়াকে ভাবিয়ে তুলল।



১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ খৃষ্টাব্দ

অনাদি নাথ দাঁ

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই নিভা তাদের ভিডিও মনিটরটি চালিয়ে দিল। মনিটরের পর্দাটি মৃদু আলোয় ভরে উঠতে নিভা দেখল গত সন্ধ্যের কি একটা খেলার ফলাফল দেখাচ্ছে। নিভা মনিটরের শব্দটা কম করে দিল। পাছে তার স্বামী দীপক বা ছেলে বিল্টুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। পর্দায় আস্তে আস্তে ফুটে উঠল, "সুপ্রভাত, আজ সোমবার ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০১ খৃস্টাব্দ।"

নিভা তাড়াতাড়ি পোষাক বদল করে নিল। আজকাল, সে প্রায় কিছুই রান্না করে না, ব্রেকফাস্ট ত' নয়ই। তাদের ফ্লাটবাড়ীর অন্য সকল আবাসিকদের মত ফ্লাটবাড়ীর ডাইনিং হলে গিয়ে সে কিছু পুষ্টিকর খাবার খেয়ে নিল। কিছু পুরানো ধাঁচের লোকজন এবং ভোজন রসিকরা ছাড়া এখন কেই বা বাড়ীতে রাঁধে? কাপড় কাচা বা ডিস ধোওয়ার মেসিনের মত রান্নার 'কুকিং রেঞ্জ'টিও এখন আর ব্যবহার হয় না—এগুলিতে অনেক বেশী বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হয়।

ব্রেকফাস্ট সেরে অল্প হেঁটে নিভা তাদের কার-পার্কে পৌঁছাল। এখানেই ফ্লাটের সকলের গাড়ী পর পর দাঁড়িয়ে আছে। নিভার গাড়ী রাখার জায়গায় তার নামটি সুন্দর করে লেখা আছে, নিভা লক্ষ্য করল যে গাড়ীর ড্যাশবোর্ডে ছোট্ট, সবুজ আলোটি জ্বলজ্বল করছে। নিভা নিশ্চিন্ত

হল—গাড়ীর ব্যাটারী সারা রাতে পুরোপুরী চার্জ হয়ে গেছে। পেট্রলের বদলে নিভার গাড়ীটি চলে ব্যাটারীতে। দিনে গাড়ী চলতে ব্যাটারীর যা শক্তি ক্ষয় হয়, সারারাত চার্জ হলে ব্যাটারীটি আবার তা' ফিরে পায়। নিভার কাজের জায়গা ২০ কি. মি. দূরে। একটা বড় শহরের বাসিন্দে হিসেবে এ দূরত্ব প্রায় কিছুই নয়।

দীপক ফ্লাটের জানালা থেকে লক্ষ্য করল নিভা তার গাড়ীটি বার করে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। আড়মোড়া ভেঙ্গে দীপক একটি পুষ্টিকর পানীয় খেয়ে নিল। এইবার কাজে বসতে হবে। দীপক একটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর খবরের কাগজগুলিকে তাকে 'স্টোরি' বা লেখা দিতে হয়। তার নিজের পড়াশুনোর জায়গায় গিয়ে দীপক ভিডিওয় সকালের মূল খবর বা হেড্‌লাইন জানার সুইচ্‌টি টিপে দিল।

পর্দায় একের পর এক হেড্‌লাইন আসতে শুরু করল। "শ্রীলঙ্কায় তামিল বিদ্রোহ" খবরটি দীপকের পছন্দ হল। ভিডিওর চাবি টিপে এই খবরটির সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য চাইল। প্রয়োজনমত পয়েণ্টগুলি টুকে নিয়ে দীপক দেখল শ্রীলঙ্কার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া দরকার। প্রযুক্তিকে ধন্যবাদ, এর জন্য দীপককে আর প্লেন ধরে শ্রীলঙ্কা ছুটতে হবে না। টেলিফোনে মন্ত্রীকে বাড়ীতেই পাওয়া গেল এবং যেহেতু এখনকার টেলিফোনে অপর প্রান্তের গ্রাহকের কেবল গলার স্বর শোনা নয়, তার চেহারাও দেখা যায়, তাই এই দূরদর্শী টেলিফোনে একটা ছোটখাটো ইণ্টারভিউ নিতে দীপকের কোন অসুবিধা হল না। শ্রীলঙ্কা সমস্যা নিয়ে দীপকের আগেও কিছু কিছু বিষয় নোট করা ছিল। ভিডিওর পর্দায় সেগুলিকে আর একবার দেখে নিয়ে দীপক তার লেখা লিখতে শুরু করল। লেখা বলতে হাতে লেখা নয়, দীপক টাইপ করার সঙ্গে সঙ্গে লেখাটি ভিডিওর পর্দায় ফুটে উঠতে লাগল।

পাণ্ডুলিপি তৈরী এখন অনেক সহজ সাধ্য হয়েছে—আর পাতার ওপর কাটাকুটি করতে হয় না। অপছন্দ শব্দ বা বাক্য টাইপ মেসিনের চাবি টিপে পর্দা থেকে মুছে ফেলে তার জায়গায় নতুন শব্দ বা বাক্য বসিয়ে দেওয়া যায়। প্রয়োজনমত প্যারা বা লাইন সাজানো, হরফ ছোট বড় করা, ইত্যাদি চাবি টিপে করে ফেলা যায়।

লেখাটা যখন দীপকের পছন্দসই হল, তখন তার কম্‌পিউটারকে

দীপক নির্দেশ দিল লেখাটি সরাসরি তার ওপরওয়ালা সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিতে। এর জন্য তাকে ডাক বা তারঘরে ছুটতে হল না। কম্পিউটার যন্ত্র তারের মাধ্যমে তার লেখাটি পাঠিয়ে দিল সম্পাদকের ভিডিওর পর্দায়। পছন্দ হলে তিনি লেখাটি তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গ্রাহক সংবাদ-পত্রের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

কাজ শেষ করে দীপকের মনটা বেশ হাল্কা হল। এইবার একটু ঘরকন্নার দিকে নজর দেওয়া দরকার। দীপক কম্পিউটারকে বাড়ীর কি কি কাজ করতে হবে জিজ্ঞাসা করল। কম্পিউটার জানাল যে ফ্লাট পরিষ্কার করার জন্য অল্প কিছু পরে ভাড়া করা রোবট আসবে। আজকের ডাকে চিঠিপত্র কি এসেছে? চিঠির বাক্স আজকাল উঠে গেছে। ইলেক্ট্রনিক ডাক ব্যবস্থায় চিঠিপত্র আজকাল ঘণ্টায় ঘণ্টায় কম্পিউটারের মাধ্যমেই আদান-প্রদান হয়। ভিডিও পর্দায় দীপক দেখল যে মাত্র কয়েকটি বিল এসেছে, টাকা দিতে হবে। কম্পিউটারকে তার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রয়োজনমত টাকা পাওনাদারদের হিসাবে জমা দেবার নির্দেশ দিয়ে দীপক বেরিয়ে পড়ল।

নিভা যখন তার কর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছাল, তখন সকালের শিফ্‌ট সবে শুরু হচ্ছে। নিভা তার বসার ঘরে গিয়ে দেখল যে রাতের শিফ্‌টের কর্মী—একটি ছোট্ট কী বোর্ডে টাইপ করে কারখানায় প্রধান কম্পিউটারকে জানাচ্ছে যে তার কাজ শেষ, এবার নিভা এসে তার কাজ বুঝে নিচ্ছে। ঘরটিতে দ্বিতীয় কোন প্রাণী নেই, আছে কেবল এক রাশ যন্ত্রপাতি ও মিটার। নিভার কাজ মিনিট পনেরো অন্তর মিটারগুলি ঠিকমত রীডিং দিচ্ছে কি না, পরীক্ষা করে দেখা ও সেই তথ্য মূল কম্পিউটারকে জানানো। রীডিং-এ কোন গণ্ডগোল থাকলে কম্পিউটার নিভাকে কি করতে হবে, তার নির্দেশ দেবে।

একবার নিভা বাড়ীর কথা ভাবতে ভাবতে নির্দিষ্ট সময়ে মিটার রিডিং নিতে ভুলে গেছিল। একটু পরেই তার সিটের সামনের ভিডিও পর্দায় তার এই গলতির কথা জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠতে দেখে নিভার হুঁস হল। তাতেও যদি তার হুঁস না ফিরত, তাহলে লাউড্‌ স্পীকার মারফৎ নির্দেশ আসত, যাতে তার পাশের ঘরের কর্মীরা এসে দেখতে পারে কি গণ্ডগোল হয়েছে।

নিভা যখন বাড়ী ফিরল, তখন দীপক বা বিল্টু কেউই বাড়ী নেই।

বিল্টুকে নিয়ে নিভার আজকাল চিন্তা হয়। ওর স্কুল শেষ হতে আর এক বছর বাকী, কিন্তু ওর আর পড়তে ভাল লাগছে না, একটা চাকরি খুঁজছে। এখন বিল্টু কোথায় গেছে জানার জন্য নিভার মন চঞ্চল হল। বিল্টু কিছু জানিয়ে গেছে কি না দেখতে নিভা তার কম্‌পিউটারের চাবি টিপল। পর্দায় ফুটে উঠল, "লক্ষ্মী মা, ভেবো না। স্কুলে আজ রিহার্সাল আছে। ফিরতে বিকাল হবে।"

পূজা আসছে। নিভা দেখল স্বামী ও ছেলের জন্য উপহার কেনার এইটেই ভাল সময়। নিভাদের শহরের একটা মস্ত সুবিধে হচ্ছে এর সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি বাড়ী একটি কেন্দ্রীয় কম্‌পিউটার ও দূর সংযোগ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। এই যোগাযোগ কিন্তু তামার তারের মাধ্যমে নয়—কাঁচতন্তুর মধ্য দিয়ে আলোক তরঙ্গ এই শহরে বার্তাবহনের কাজ করছে। এর প্রাথমিক খরচ কিছুটা বেশী, কিন্তু একবার কাঁচতন্তু বসানো হয়ে গেলে তাকে বজায় রাখার খরচ অনেক কম।

নিভা তার কম্‌পিউটারের মারফত শহরের একটি বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরকে ডাকল। ভিডিও পর্দায় ঐ দোকানটির নাম ফুটে উঠল ও একজন বিক্রেতা পর্দায় এসে স্মিত হেসে বলল, "নিভা দেবী, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?" ছেলের পছন্দর কথা নিভা জানত। তাই খেলাধূলার সরঞ্জাম বিভাগ থেকে ইচ্ছামত জিনিষটি বেছে নিয়ে নিভা দাম মিটিয়ে দিল—তাও ঐ কম্‌পিউটারের মাধ্যমে। এরপর দীপকের উপহারের পালা। এমন সময় তার গলার কাছের একটা শব্দ তার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

অধিকাংশ লোক তাদের ব্যক্তিগত সচল টেলিফোনটি তাদের পকেটে রাখে, কেউ বা তাদের মণিবন্ধে। নিভা এটিকে একটি লকেটের মধ্যে রেখে গলায় পরত। শব্দ শুনে নিভা তার টেলিফোনে সাড়া দিল। শুনতে পেল, অপর প্রান্ত থেকে বিল্টু বলছে যে স্কুলের রিহার্সাল অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলবে, তাই তার ফিরতে দেরী হবে।

নিভা আবার উপহারের কথা ভাবতে বসল, এমন সময় দীপক ফিরে এল। ঘরের টুকিটাকি কাজ সেরে ওরা রাত্রের খাওয়া সারতে ফ্লাট বাড়ীর ওপর তলায় রেস্টুরেন্টে গেল। সেখানে এক একদিন এক এক দেশের খাবার পাওয়া যায়। খাওয়া সেরে এসে নিভা টি. ভি. দেখতে বসল। টি. ভি.-তে অনেক চ্যানেল। এক একটি চ্যানেলে এক এক ধরণের

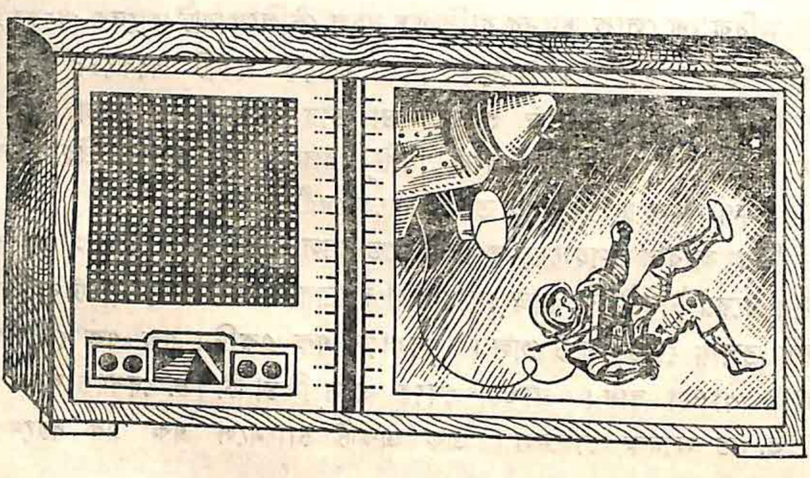
প্রোগ্রাম। কিন্তু প্রোগ্রাম দেখতে আলাদা পয়সা লাগে। একটি ভাল ক্লাসিকাল নাচের অনুষ্ঠান আছে দেখে নিভা বিনোদনের চ্যানেলটি বেছে নিল এবং তার যা' দর্শনী মূল্য কম্পিউটার মারফত সেই টাকা দিয়ে দেবার নির্দেশ দিল। এই নির্দেশদানের পরই টি. ভি. সেটে অনুষ্ঠানটি দেখা যাবে, তার আগে নয়।

দীপকের টি. ভি. প্রোগ্রাম দেখতে তত ভাল লাগে না। শোবার আগে সে গেল রান্না ঘরে এক গ্লাস জলের জন্য। প্রতিবার জল খাবার সময় দীপকের নাক একটু কুঁচকে যায়। জল যে বিস্বাদ তা নয়, কিন্তু যেই মনে হয় যে এই জলটির উৎস হচ্ছে ড্রেনের ময়লা জল যা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধন করে পানীয় জল হিসাবে সরবরাহ করা হচ্ছে, তখনই তার মনে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু উপায়ান্তর নাই, দেশ জুড়ে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর অনেক নেমে গেছে ; ফলে জল অপচয় করা একেবারেই বারণ।

টি. ভি.-র প্রোগ্রাম চলল বেশ রাত পর্যন্ত। বিল্টু ও দীপক আগেই শুয়ে পড়েছে। নিভা হাই তুলে সেট বন্ধ করল। আবার ভোর হতেই কর্মব্যস্ত দিন শুরু হবে। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় একটি সুখী ছোট পরিবারের দিন এইভাবেই শেষ হল।*

---

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।





বাড়ীর খোঁজে ঝকমারি

অরুণ কুমার সাহা

সন্‌জিৎ বললে সল্টলেকে যান। ওখানেই চট্ করে পেয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী। দিল্লি থেকে এসে আস্তানা খুঁজছিলাম একটা।

সায়েন্স কলেজে বসে কথা হচ্ছিল। সন্‌জিৎ বলে—আর যা সব বাড়ী সেখানে! কত লোক যে কত কায়দায় বাড়ী বানাচ্ছে—দেখেও সুখ। শ্যামসুন্দর হঠাৎ বলে—আমার এক বন্ধু বাড়ী করেছে সল্ট লেকে। আপনার পছন্দ হবে। সবাই ব্যাপারটা বুঝবে না। কারণ, উচ্চ পদার্থ বিদ্যার প্রয়োগ রয়েছে। উচ্চ গণিত বা জ্যামিতিও বলতে পারেন। বন্ধুর একটু প্রবলেম হচ্ছে। মানে, সি সি পাচ্ছে না। কমপ্লিশন সার্টিফিকেট। ময়ূখ ভবন যতক্ষণ না ছাড়পত্র দিচ্ছে ততক্ষণ জলের কানেকশান পাবে না। আবার ঐ উচ্চ পদার্থ বিদ্যা বা গণিত ইন্‌জিনিয়ার-দের মাথায় ঢুকছে না। আপনি একবার দেখুন।

আমি বলি—কেন, প্রবলেমটা কি ?

—দেখুন প্লটটা ছোট, মাত্র দেড় কাঠা মত। আবার বাইরে একটু খোলা জায়গা রাখবার ইচ্ছে, ফুলের গাছের জন্য। তাই বাড়ীটাকে তিন মাত্রায় না রেখে চার মাত্রার করে দিয়েছে।

—চার মাত্রা? মানে, ফোর ডাইমেনশন? এর মধ্যে আবার টাইম এল কোথা থেকে?

—চতুর্থ মাত্রা সময় হতে হবে তার তো কোন মানে নেই।

শ্যামসুন্দর আমাকে বোঝায়। প্রথম মাত্রা কি? একটা লাইন বা

রেখা। দুই মাত্রায় ক্ষেত্র বা তল। দুই মাত্রায় আপনি তিন মাত্রার—বাড়ী বা আর যা কিছু হোক—একটি ছবি আঁকতে পারেন। এই তিন মাত্রা পর্যন্ত আমরা ব্যাপারটা বুঝি, আমরা দেখতে পাই। আবার অনেক সময় দেখতে পাই না। যেমন পৃথিবী পৃষ্ঠটা যে সমতল নয়, ত্রিমাত্রিক, তা আমরা সব সময় খেয়াল করি না। দু'হাজার বছর আগে মানুষের ধারণাই ছিল না যে পৃথিবীটা গোলাকার। এখনও এমন লোকের দেখা পাবেন হঠাৎ, যে প্রমাণ করে দেবে পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল। এই স্যাটেলাইটের যুগেও।

চার মাত্রার ব্যাপারটা আমরা সহজ বুদ্ধিতে ঠিক কল্পনা করে উঠতে পারি না। কারণ, আমরা ত্রিমাত্রিক জীব। কিন্তু উচ্চ গণিতে তা সম্ভব। চার কেন—পাঁচ, ছয়, সাত—অনেক মাত্রাই সিদ্ধান্তে আনা যায়।

বন্ধুর ঐটুকু প্লটে যদি ত্রিমাত্রিক বাড়ী করা যায়, তবে বড় বাড়ীর জন্য একটাই পথ খোলা থাকে। ওপরের দিকে যাওয়া। অতটুকু জায়গায় পাঁচ তলা বা ছয় তলার অনুমতি পাওয়া যাবে না। তাই বন্ধুবর চার মাত্রার পরিকল্পনা করেছেন। তিন মাত্রায় যখন দেখবেন, ছোটই দেখাবে। কিন্তু ভেতরে দেখবেন অনেক জায়গা।

একটি কিউব বা ঘনক আপনি পাচ্ছেন তিন মাত্রায়। চার মাত্রায় যদি যান, তা হবে টেসেরাক্ট। হাইপার কিউব বা চতুর্মাত্রিক ঘনকও বলতে পারেন। কিউবকে আপনি দুই মাত্রায় পুরোপুরি দেখাতে পারেন না। একটা পারস্পেকটিভ বা অনুপাতের আশ্রয় নিতে হয়। টেসেরাক্টকে কাগজের ওপর এঁকে দেখাবার কোন সহজ উপায় নেই। তিন মাত্রাতেও পুরোটা দেখতে পাবেন না। আপনি বাড়ীটা দেখে আসুন, বুঝে নেবেন। আমি বন্ধুকে খবর দিচ্ছি, আপনাকে নিয়ে যাবে।

অগত্যা শ্যামসুন্দরের বন্ধু অলীকবাবুর সাথে সল্ট লেকে যাই। একটি বাড়ীর সামনে দাঁড় করালেন তিনি। সামনে, সাইডে ফুলের বাগান। কিছু ঝোপঝাড়ও রয়েছে। কারণ, সি সি হচ্ছে না তো! তদ্বির তদারকের উৎসাহ নেই আর। সমঝদার লোকও পান না বড় একটা। আশা করছেন, আমাকে দেখিয়ে বোঝাতে পারবেন, অভিনব কায়দাটা কেমন কাজে লাগিয়েছেন।

বাড়ীটা দেখতে কেমন একটা বাক্স মতন। আবার ঠিক বাক্সও নয়।

অলীকবাবু বলেন—চলুন, ভেতরে যাই। একটা ছোট ঘর। হল বা ল্যাণ্ডিং বলা যায়। সিঁড়ি চলে গেছে ওপরে। ওপরে উঠে অবাক হই। বেশ বড় একটা ড্রইং রুম। ওদিকে আবার কিচেন। কি সুন্দর ফিটিং সব। মনটা ভাল হয়ে যায়। বেডরুম কোথায় জানতে চাই। ঐ তো সিঁড়ি, চলে যান ওপরে। তাই তো! সুন্দর ঘর। সাথে বাথরুম। চমৎকার ব্যবস্থা। একদিকের জানালা খুলি। শুধু আকাশ, ছোট ছোট মেঘ ভেসে যাচ্ছে। আর কিছু দেখা যায় না। কেমন গা ছম্‌ছম করে। বন্ধ করে দিই। ওদিকের জানালা খুলে দেখি সেই ফুলের গাছ, ঝোপঝাড়—কিন্তু অনেক নীচে। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হয় না। বন্ধ করে দিই।

কয়েক ধাপ নীচে নেমে আরও একটা বেডরুম, বাথরুম। ওপরে যাবার সিঁড়ি রয়েছে। ছাদই হবে। কিন্তু এ কি! এ যে সেই ঘর যেখানে আমরা প্রথমে এসেছিলাম, রাস্তা থেকে। বেরিয়ে যাওয়া যাক এই সব কাণ্ড কারখানা থেকে, মনে করে দরজা খুলি। দেখি সব ফাঁকা —মহাশূন্য একেবারে। কোথায় রাস্তা, কোথায় কি! তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে অলীকবাবুর দিকে তাকাই। তিনি চিন্তিত হয়ে বলেন—আমারও কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কি করা যায়! এ তো বড় ফ্যাসাদে পড়লাম দেখছি! এই বাড়ীতেই আটকে থাকব নাকি? ওপরে যাই ড্রইং রুমে। জানালা খুলে সেই আকাশ। কিচেনের জানালাটা খুলে দেখি ফুলগাছ, ঝোপঝাড়গুলো। আর খুব কাছেই। জানালার বাইরেই। এ পাড়ার অন্য সব বাড়ীর মত জানালায় গ্রিলের বাহার নেই। থাকবেই বা কেন? এ বাড়ী থেকে বেরোনোই তো এক সমস্যা! অতএব একটি ছোট্ট লাফ—ব্যাস্‌—তাহলেই নিষ্কৃতি।

কিন্তু এ কোথায় এলাম! চারদিকে ধূ-ধূ মাঠ। মাঝে মাঝে একটু জলা। বাড়ীটাই বা গেল কোথায়? কিছু দূরে একজন মানুষই হবে, আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে এগিয়ে আসে আস্তে আস্তে। বাবু, আপনি ইখেনে এলেন কুথা থিকে? জানতে চাই, এটা কোন জায়গা। এ তো ধাপার মাঠ। ঐ দূরে পাকা সড়ক। দু' একটা গাড়ীও দেখা যায়। ইস্টার্ন বাইপাস।

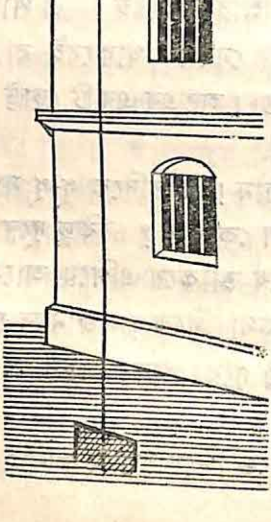
পরদিন সায়েন্স কলেজে গিয়ে বৃত্তান্ত জানাই। ইন্‌জিনিয়ারদের দোষ

নেই—সি সি দেবে কোথা থেকে? সনজিৎ বলে—অলীকবাবুর কি হল? কি জানি! উনিও যদি লাফিয়ে থাকেন আমার মত, তবে হয়তো উল্টোডাঙ্গার মোড়ে, অথবা গৌরীবাড়ি বা লেকটাউনে।

ওদের জানাই যে পরে আমি সল্ট লেকে গিয়ে বাড়ীটাকে আর দেখতে পাই নি ঐ সাইটে। আমার লাফানোর জন্যই কিনা জানি না, চতুর্থ মাত্রা বা ফোর্থ ডাইমেনশনটা বোধহয় টাইম হয়ে গেছে। আর ঐ বাড়ী সমেত অলীকবাবু হয়তো চলে গেছেন অন্য কোন সময়ে—অতীতে বা ভবিষ্যতে।

শ্যামসুন্দরকে বলি—তুমি ভাই আমাকে একটা ত্রিমাত্রিক বাড়ীই দেখে দাও বরং।

(স্বীকারোক্তি ঃ কয়েক বছর আগে একটা বিদেশী লেখা পড়েছিলাম। এই গল্পে তার ছায়া কিছু এসে গেছে। ওরা এত কিছু ভেবে রেখেছে আর লিখে গেছে ও যাচ্ছে তার প্রভাব মুক্ত হওয়া দুষ্কর।)





তার জ্বলন্ত চাহনি আজও যেন আমি দেখতে পাই।

গনগনে স্থিরচোখে আমার দিকে চেয়ে থেকে সে বলেছিল—"অবিনাশ, তোমার বড় অহংকার।"

আমি বলেছিলাম—"এই কথাটা বলার জন্যেই কি আজ ডেকে এনেছো?"

সে বললে—"তোমার অহংকার চূর্ণ করার জন্যে ডেকে এনেছি। তুমি বড় বৈজ্ঞানিক। আমাকে তুমি ছোট বৈজ্ঞানিক মনে করো, তোমার সমতুল্য বলে মনে করো না। হয়তো তোমার পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। ছোটবেলা থেকে একই স্কুলে একই ক্লাসে একই কলেজে একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এসেছি। বরাবর তুমি হয়েছো ফার্স্ট, আমি সেকেণ্ড। তোমার মধ্যে এই দেমাক তাই স্বাভাবিক কারণেই এসেছে। আমাকে তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বলেই মনে করেছো।"

আমি বললাম—"এসব কথা এতদিন পরে তোমার মনে জাগছে দেখে অবাক হচ্ছি। পড়াশুনার প্রতিযোগিতা চিরকালই করে এসেছি, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই প্রতিযোগিতা থেমে থাকে নি—থাকবেও না। তুমিও বিদেশ গেছো, আমিও গেছি। জয়ের মুকুট সেখানেও আমি পেয়েছি। সেটা কি আমার অপরাধ?"

সে বললে—"তুমি টেকনোলজির বর্মতে মুড়ে রেখেছো নিজেকে—শামুকের মত খোলার মধ্যে বন্দী হয়ে আছো। তোমার চোখ খুলে দেওয়া দরকার।"

"তোমার এই অভিমত নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে আমার কাছে। এই বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার কোনো বিতর্ক এর আগে তো ঘটে নি।"

সে বললে—"বারবার তুমি আমাকে আক্রমণ করেছো তোমার জ্ঞান দিয়ে। বারবার তুমি প্রমাণ করতে চেয়েছো, তোমার জ্ঞানের বাইরে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই এই পৃথিবীতে।"

বিদ্রূপের স্বরে আমি বললাম—"আমার জ্ঞান বোলো না। বলো, বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যার অস্তিত্ব স্বীকার করে না—আমি তা মানি না। যেমন ধরো, তুমি বলেছিলে, বুধ গ্রহের অসম গতির মূল আর একটা ছোট গ্রহ—যে গ্রহ রয়েছে বুধ গ্রহের চাইতে সূর্যের কাছে। তুমি তার নামকরণও করেছিলে—ভালকান। আমি প্রমাণ করে দিয়েছিলাম, তোমার থিওরি ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কাছে তোমার অনুমিতি ধোপে টেঁকে নি।"

শুনে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেল তার। গলা কাঁপতে লাগল। গালের মাংসপেশী কাঁপতে লাগল। বললে গলা চড়িয়ে—"ঠিক এইভাবেই তুমি আমার আর একটা অনুমিতি অমূলক প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছো।"

আমি বললাম—"তা তো লাগবই। তুমি প্রমাণ করতে চাও সাব-অ্যাটমিক পার্টিক্‌ল্ আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে—পরমাণুর চাইতেও ছোট এই বস্তুকণার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ কিন্তু হাজির করতে পারো নি।"

সে বললে জ্বলন্ত চাহনিকে আরো জ্বলন্ত করে—"সেই জন্যেই আজ তোমাকে ডেকে এনেছি।"

আমি আবার একটু ব্যঙ্গের সুরে বললাম—"এইখানে—এই ঘরে তুমি প্রমাণ করবে সাব-অ্যাটমিক পার্টিক্‌ল্‌য়ের অস্তিত্ব? বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তো কিছু দেখছি না। সাদামাটা একটা গেরস্ত ঘর, ঐ তো একটা ক্যাম্পখাট। একটা মাত্র টেবিল। ঘরের কোণে স্টোভে ওটা কি ফুটোচ্ছো? খিচুড়ি? নিজের হাতে রেঁধে খাও? একলা থাকো এই একখানা ঘরে? কিছু বই আর ঐ বড় আলমারিটা ছাড়া তোমার ঘরে আর কোনো সরঞ্জাম আছে বলে তো

মনে হয় না। পাশের ঘরটা বোধ হয় গুদোম ঘর। ঐখানে নিশ্চয় তোমার ল্যাবোরেটরী নেই।"

সে বললে—"বিদ্রূপ তোমার শক্তির হাতিয়ার। বিদ্রূপ করেই তুমি বরাবর আমাকে ছোট প্রমাণিত করে এসেছো। তোমার বিদ্রূপের জ্বালা সইতে না পেরেই আজ আমি লোকালয় থেকে পালিয়ে এসে সন্ন্যাসীর মত নিরালায় থাকি। তুমি ভাবছো, রণে ভঙ্গ দিয়ে এখানে রয়েছি। অবিনাশ, তোমার এই ভুল ধারণা ভাঙাবার জন্যেই আজ তোমায় এখানে ডেকে এনেছি। আমি সাব-অ্যাটমিক পার্টিক্‌ল্‌য়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করব এই ঘরেই—তার জন্যে কোনো সরঞ্জামের দরকার হবে না—কোনোদিনই হয় নি।"

আমি বললাম—"তুমি বোধ হয় এটুকু অন্ততঃ জানো, আমি বড় ব্যস্ত। নেহাত বাল্যবন্ধু বলে তোমার কথা রাখতে এসেছি। আমার পক্ষে এভাবে অবান্তর কথা শোনা সম্ভব নয়।"

সে বললে—"কিন্তু তোমাকে এত সহজে আমি ছাড়ছি না।"

আমি বললাম—"আমি জানি, জীবনের আঘাত তোমার হৃৎপিণ্ডকে দুর্বল করে তুলেছে—তুমি সম্প্রতি ই-সি-জি করিয়ে দেখেছো তোমার ব্লাডকোলেস-টেরল অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, তোমার হার্ট আগের মত সুস্থ সবল আর নয়। তোমার কথাবার্তা চোখ-মুখ তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাই তোমার ভালর জন্যই বলছি, আমাকে ছেড়ে দাও।"

সে বলল অস্বাভাবিক গলায়—"না।"

"তুমি বড় উত্তেজিত হয়েছো, তোমার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, কূট তর্কের অবসান অস্থির মস্তিষ্কে সম্ভব নয়—অসম্ভবকে সম্ভব করা তো নয়ই। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নিশ্চয় বসব, কিন্তু আজ এ অবস্থায় নয়।"

সে বলল—"আজ এই অবস্থাতেই তোমার কাছে যা অসম্ভব, আমার কাছে তা কতখানি সম্ভব, তা প্রমাণ করব। তুমি তোমার পাঁচটা ইন্দ্রিয়র ওপর বড় বেশী আস্থাবান। তুমি বিশ্বাস করো, এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়র বাইরে আর কোনো ইন্দ্রিয় নেই। তাই জগতের বহু বিষয় আজও তোমার কাছে

অজ্ঞাত। সাব-অ্যাটমিক পার্টিক্‌ল্‌য়ের অস্তিত্ব তাই তোমার কাছে একটা অলীক কল্পনা মাত্র।"

আমি বললাম—"তুমি যদি অকাল্ট সায়ান্টিস্ট হতে, সাগ্রহে তোমার বক্তৃতা শুনতাম। কিন্তু তুমি তো তা নও। ইলেকট্রনিকস্ আর জেনেটিক্সে তোমার মত বড় বিজ্ঞানী ওয়ার্ল্ডে খুব কম আছে। জাপানে এত বছর এই সম্পর্কেই কি সব কাজ করছিলে। হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় থেকে তোমার মস্তিষ্ক দেখছি আর সুস্থও নয়।"

সে বললে—"তোমার বিদ্রূপ আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে অবিনাশ। আমাকে পাগল বলেছো এর আগেও—আমার আড়ালে। আজ বললে আমার সামনে। তাই হেস্তনেস্ত করার জন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি।"

ঘড়ি দেখে বললাম—"কি হেস্তনেস্ত করতে চাও?"

সে বললে—"সময় দেখবার জন্যে ঘড়ির দিকে তাকাবার কোনো দরকার ছিল না। জানলা দিয়ে ঐ দেখো চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলো কত সুন্দর দেখেছো? বাতাসে রাতের ফুলের গন্ধ পাচ্ছো না? ভিজে মাটি আর পচা ঘাসের সুবাস পাচ্ছো না? রাতের পোকাদের হাঁকডাক শুনতে পাচ্ছো না।"

আমি বললাম—"একটা পেঁচার ডাক এইমাত্র শুনলাম বটে। এমন রাতে অলুক্ষুণে ডাকটা শুনে গা-টা যতটা না সিরসির করছে, তার চাইতেও বেশী করছে তোমার কথা বলার ঢং-টা দেখে। অন্য সময় হলে বলতাম, তুমি বিজ্ঞান ছেড়ে কাব্যসাধনা আরম্ভ করেছো। কিন্তু এখন তা বলতে পারছি না। প্রকৃতির ওপর তোমার এই হঠাৎ অনুরাগের মূলে কি কারণ থাকতে পারে জানি না, ভাববার চেষ্টা করছি—অকাল্ট সায়ান্স নয় তো?"

সে বললে—"পৃথিবীর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই চোখ বন্ধ করে সত্যানুসন্ধান করে—তাই তাদের প্রগতি এত মন্থর। প্রকৃতিকে অনুসরণ করো অবিনাশ—চোখ খুলে ভাল করে ছাখো—বিজ্ঞান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কল্পনাও করতে পারবে না।"

"তোমার প্রলাপ শোনবার সময় আমার নেই। আমি উঠি।"

সে গর্জে উঠল—"খবরদার। ঐখানে বসে থাকো। বিজ্ঞানের প্রগতি

তোমার ল্যাবোরেটরীতে নেই—আছে প্রকৃতির মধ্যে। সাব-অ্যাটমিক বস্তুকণার প্রমাণ আসবে এই শূন্যতার মধ্যে থেকেই—যে শূন্যতার মধ্যে অসংখ্য জগৎ, অগণিত বিস্ময় লুকিয়ে আছে। অসীম অনন্ত সেই রহস্যের কিছুটা আজ তোমার সামনে খুলে ধরব।"

আমি নাচার হয়ে বললাম—"যা করবে, তাড়াতাড়ি করো।"

সে বললে—"তুমি আমার অনেক খবরই রাখো। জাপানে আমি বহু বছর ইলেকট্রনিক্স আর জেনেটিক্স নিয়ে গবেষণা করেছি। ওরা চোখ খোলা মানুষ—ঐ জাপানীরা। প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের বহু অজ্ঞাত অব্যাখ্যাত রহস্য আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল দেখে তাই তোমার মত আমাকে বিদ্রূপ করে নি, আমাকে মদত দিয়েছে। তুমি তো জানো, রোবট উৎপাদনে জাপান আজ পৃথিবীতে অগ্রণী দেশ। আমি ছিলাম সেই রোবট গবেষণায়—এমন এক রোবট গড়তে চেয়েছিলাম যা মানুষকেও ছাড়িয়ে যাবে। মানুষ তো প্রকৃতির এক অসহায় জীব। নিজের শরীরের কোনো ত্রুটি ঘটলে নিজে সারিয়ে নিতে পারে না। তোমার নিজের ওপরেই তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, পা জখম হলে দৌড়োও ডাক্তারের কাছে, সমুদ্রের তলায় নামবার দরকার হলে অ্যাকুয়ালাঙের দরকার হয়। ম্যারাথন দৌড় দৌড়ে এসে জিভ বার করে কুকুরের মত হাঁপাও—শরীরের অসম্পূর্ণতার জন্যে মানিয়ে নিতে পারো না। কল্পনার সঙ্গে আবিষ্কার মিশিয়ে এমন এক ভবিষ্যতের রোবট তৈরী করতে চেয়েছিলাম যে হবে আজকের এই অশক্ত অপটু দুর্বল মানুষের প্রভু।" আমি বললাম—"সর্বনাশ! এই জন্যেই জেনেটিক্সের গবেষণায় যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তিনি পইপই করে বারণ করেছিলেন দানবে দানবে পৃথিবী ছেয়ে যাবে, যদি জেনেটিক্স নিয়ে লাগাম ছাড়া গবেষণা চলতে থাকে। যাক সে কথা, তোমার গবেষণা সফল হয়েছে। না, আবার ভুল করেছো?"

সে বললে—"বিদ্রূপ করার সময় হয়ত আর নাও পেতে পারো, অবিনাশ। তাই যত পারো বিদ্রূপ করে নাও। রোবট আমি গড়েছিলাম। সে এক আশ্চর্য রোবট। নিজেই নিজেকে বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে। স্বয়ংসম্পূর্ণ এই রোবটের ওপর খবরদারি করা আমার সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়াল একদিন। লক্ষ্য করলাম, আমি যে ইলেকট্রনিক সার্কিট অনুসারে তাকে

গড়েছিলাম, সে তার রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই নতুন ইলেকট্রনিক জটাজাল আমার অচেনা। তারপরেই তার ক্ষমতার পরিচয় পেলাম। অবাক হলাম তার দৃষ্টিশক্তি দেখে। আমাদের কাছের এই জগৎ—যা আমাদের কাছে অদৃশ্য, তা তার কাছে যেমন দৃশ্যমান, ঠিক তেমনি লক্ষ কোটি মাইল দূরের অসীম মহাশূন্যের নক্ষত্রলোকের বিস্ময়ও তার চোখে সুস্পষ্ট।"

আমি হেসে বললাম—"রাশিয়া আমেরিকা ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের বহু বড় বৈজ্ঞানিক আজকাল কল্প বিজ্ঞান লিখেছেন এবং বেশ ভালই লিখছেন। তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। ভাল লাইন ধরেছো। সস্তায় খ্যাতি পেয়ে যাবে অতি সহজেই।" দাঁত কিড়মিড় করে সে বললে—"হ্যাঁ, তোমাকে ছাড়িয়ে যাবো। তোমার ঐ পঞ্চেন্দ্রিয়র জগৎটার ওপারে বিশাল অদৃশ্য জগৎটাকে দৃশ্যমান করে তোলার খ্যাতি শুধু আমারই প্রাপ্য—বাবুন কথা দিয়েছে, খ্যাতির কোনো লোভ তার নেই।"

"বাবুন বুঝি তোমার নতুন রোবটের নাম?"

"হ্যাঁ। সে এখানেই আছে।"

উঠে দাঁড়ালাম আমি—"কোথায়?" "ঐ আলমারির মধ্যে। জাপান থেকে যখন আসি, আমার সমস্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শুধু তাকে নিয়ে এসেছি—শুধু তোমার চোখ খুলিয়ে দেব বলে।"

বলে সে উঠে গিয়ে আলমারির পাল্লা দু' হাট করে খুলে দিল।

ভেতরে কোনো তাক নেই। আসলে একটা বড় বাক্স। কফিনের সাইজের বাক্স। খাড়া করে দাঁড় করানো। ভেতরে সটান দাঁড়িয়ে আছে একটা কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি। রোবট নিঃসন্দেহে। কিন্তু অবিকল মানুষের মত দেখতে। হঠাৎ দেখলে ভ্রম হয়। তারপরেই ভ্রান্তি কেটে যায় বুক আর পেটজোড়া একটা স্ক্রীন দেখলে। টি. ভি. স্ক্রীনের মত ঘসা কাচের একটা বড় স্ক্রীন। মূর্তিটা নিরাবরণ। মানুষের পরিচ্ছদ নেই শ্রীঅঙ্গে।

হ্যারিকেনের আলোয় তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল মূর্তিটা নিষ্প্রাণ রোবট নয়—প্রাণময় মনুষ্য। কেন না, তার চোখের কোটরে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ দেখলাম। সে স্ফুলিঙ্গ নীলাভ—অমানবিক।

বসে পড়লাম। বললাম—"ও কি আমাদের কথা শুনেছে?"

সে বললে—"হ্যাঁ। এবং রেগেছে। ওর চোখের চাহনি আমি চিনি। তোমার দম্ভ আর সীমাহীন অজ্ঞতা ওকে শোনাবো বলেই তোমাকে এতক্ষণ ওর উপস্থিতির কথা বলি নি। প্রাণের আশ মিটিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করে ওকে আরও রাগিয়ে দিয়েছো। ও অকৃতজ্ঞ নয়—স্রষ্টার লাঞ্ছনা ও সহ্য করে না।"

আমি শুধু বললাম—"ও যে অদৃশ্য জগৎ দেখতে পায়, তার প্রমাণ ?"

সে বললে—"শুধু দেখতে পায় না, দেখাতেও পারে। কিন্তু তুমি কি তা সহ্য করতে পারবে ?" "কেন সহ্য করতে পারব না ?"

"অবিনাশ, এতক্ষণে তোমার গলায় অকৃত্রিম কৌতূহল প্রকাশ পেল। মনে হচ্ছে, আমার আবিষ্কারকে সম্মান দেওয়ার মত মন তোমার প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু বড় দেরী করে ফেলেছো, বাবুন কিছু ভোলে না। তাই পরমাণু জগতের চাইতেও সূক্ষ্ম বস্তুকণায় গড়া জগৎটা তোমাকে দেখিয়ে হয়তো তোমার মস্তিষ্কের সুস্থতাও কেড়ে নিতে পারে।"

আমি বললাম—"ভয় নেই। পঞ্চাশ পেরোনোর পর থেকে নিয়মিত কার্ডিওলজিস্টকে দিয়ে হার্ট চেক-আপ করাই। আমার হার্ট তোমার চাইতেও সবল—নার্ভও। তোমার মত আঙুল কাঁপছে না, মুখের মাংসপেশীও কাঁপছে না। ভয় তুমি পেয়েছো। কিন্তু কিসের ভয় ?"

সে বললে—"ইথারের মধ্যে যে যে সূক্ষ্মদেহীরা আছে, তাদের আভাসটুকুও দেখলে তোমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হবে অবিনাশ। তারপর যখন দেখবে দূর নক্ষত্রলোকের বাসিন্দাদের কল্পনাতীত কাণ্ডকারখানা, আত্মা আর ঐ দেহের খাঁচায় থাকবে না।"

আমি বললাম—"আমি যে বৈজ্ঞানিক, সে কথাটা সবিনয়ে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বিস্ময় সৃষ্টি করা এবং বিস্ময় প্রত্যক্ষ করাই আমার কাজ।"

হিংস্র নেকড়ের মত চাপা গজরানির সুরে সে বললে—"তাহলে দেখো আগে কাছের জগৎকে।—বাবুন !"

আচম্বিতে তীব্রতর হল বাবুনের নীলাভ চক্ষুর দীপ্তি। একই সঙ্গে ঘন বেগনী আভায় প্রদীপ্ত হল তার বুক আর পেটের স্ক্রীন। গাঢ় বর্ণের মধ্যে অনেকগুলো ছায়ামায়ার কুণ্ডলী পাকানো আবর্ত রচনা দেখলাম, সুস্পষ্ট কিছু বুঝলাম না—কিন্তু অজান্তেই আমার প্রতিটি লোমকূপ শিহরিত হল অব্যাখ্যাত

এক আতঙ্ক-অনুভূতিতে। অনুভূতিটা জাগ্রত হল আচমকা—জানি না তা ক্ষণপূর্বে শোনা ঘোর চাপা গজরানির প্রভাবে কিনা। যেন মনে হল, অন্ধকারের বিভীষিকারা পুঞ্জিত হচ্ছে ঐ বেগনী পর্দায়। যে কোনো মুহূর্তে দুঃস্বপ্নেরও অতীত বিকট রূপ পরিগ্রহ করে তারা আমার জ্ঞানবুদ্ধি চেতনার শেকড় পর্যন্ত উপড়িয়ে ফেলে দিতে পারে। সেই সঙ্গে জাগ্রত হল আর একটা সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি—না, না—উপলব্ধি। যেন প্রতিটি কোষ দিয়ে উপলব্ধি করলাম, আমার চারদিকে কারা যেন জড়ো হচ্ছে···ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে কারা যেন নিশব্দে পদসঞ্চারে বাতাসের ওপরে পা ফেলে ফেলে আমার নিকটবর্তী হচ্ছে···তারা আসছে শুধু ঘরের নিরন্ধ্র তমিস্রা ভেদ করেই নয়··· আসছে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিথর মাঠ-বন-প্রান্তরের ওপর দিয়ে···জলাভূমির পুঞ্জীভূত কুহেলীর আকার নিয়ে···তারা আসছে···আসছে···আসছে···তাদের অগ্রসর সমাচার ঘোষিত হচ্ছে বনভূমির পত্রমর্মর এবং সহসা উচ্ছ্বসিত আরণ্যক দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে দিয়ে···

আমি সভয়ে শিহরিত রোমকূপে চাইলাম আমার পাশে উপবিষ্ট ঈর্ষাকাতর উন্মাদ বন্ধুর পানে। যুক্তি বুদ্ধিকে প্রবোধ দিয়ে বোঝাতে প্রয়াস পেলাম, এ নিশ্চয় তার বাক্য-জালের সূক্ষ্ম প্রভাব···তার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে আজকের সম্মেলনের শেষে দুষ্পাচ্য গুরুভোজের প্রতিক্রিয়া···

বন্ধুটি নিবিষ্ট কিন্তু বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল শবাধার-সম কাঠের বাক্সটার ভেতর দিকে—যেখানে নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে গড়া নিরাবরণ কলের পুতুলটা। তার বুকের পর্দায় রঙের খেলা তখন ঘোর হতে ঘোরতর আকার ধারণ করছে। অনেক স্ফুলিঙ্গ···অনেক দংষ্ট্রা···অনেক তির্যক রশ্মি-রেখা অবিশ্রান্ত বেগে আসছে যাচ্ছে···একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন প্রলয় নাচন শুরু হয়ে গেল আমার মস্তিষ্কের অণু-পরমাণুর মধ্যে···

সবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—"ঢের হয়েছে। তোমার ভি. ডি. ও. গেম দেখবার জন্যে এতদূর না এলেও চলত—এক টাকা দিয়ে এসপ্ল্যানেডেই দেখতে পেতাম।"

খপ্‌ করে আমার বাহু আঁকড়ে ধরে সে, বলল—"যাচ্ছ কোথায়? এই তো শুরু।"

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম আমি। তাল সামলাতে না পেরে সে ছিটকে গেল জ্বলন্ত স্টোভের ওপর—উল্টে গেল স্টোভ। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সে—"বাবুন!" কফিন-বাক্সের মধ্যে থেকে এক পা বেরিয়ে এল বিদঘুটে মূর্তিটা। ঘটনাটা ঘটল ঠিক সেই মুহূর্তে। আচমকা একটা ফ্ল্যাশ দেখা গেল। যেন জানলার মধ্যে দিয়ে আলোর ঝলকটা একরাশ জমাট জ্যোৎস্না নিয়ে ধেয়ে এসেই আছড়ে পড়ল চলমান মূর্তিটার ওপর।

নিমেষের মধ্যে তার বুক-পেটের স্ক্রীনের বিভীষিকালোক অদৃশ্য হল—তার জায়গায় আর্বিভূত হল মহাকাশ···অগণিত নক্ষত্র···আর একটা বিশেষ নক্ষত্রপুঞ্জ···আমার অতি পরিচিত।

কলের মানুষ কি বিস্মিত হতে পারে? কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার সেই রকমই মনে হল। বিষম বিস্ময়ে যেন একটা অদৃশ্য ধাক্কায় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গিয়ে বিদ্‌ঘুটে মূর্তিটা আড়ষ্ট ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জানলা দিয়ে বাইরে।

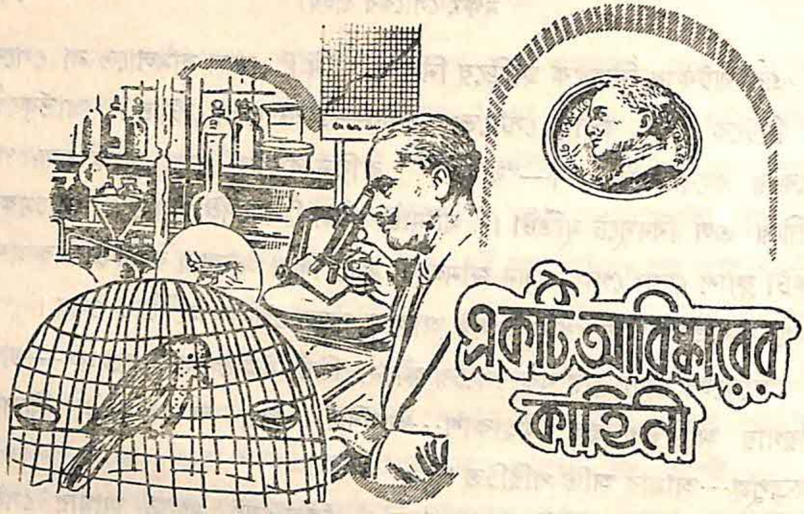
সরু পেন্সিলের চাইতেও সরু একটা আলোকরশ্মি ধেয়ে এল জানলা দিয়ে···উজ্জ্বল সবুজ পান্নার মতই সেই আলোকরশ্মির উৎস পলকের জন্য চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম···জ্যোৎস্নালোকিত আকাশ ভেদ করে অনেক উঁচু থেকে নামছে সেই আশ্চর্য আলোকরশ্মি—আসছে সেইদিক থেকে —যেদিকে রয়েছে আমার সুপরিচিত সেই নক্ষত্রমণ্ডলী—যার ছবি এইমাত্র প্রতিভাত হয়েছে রোবটের বুকের পর্দায়···

অমানুষিক গর্জন শুনে দৃষ্টি ফিরে এসেছিল ঘরের মধ্যে। আলোক-শর স্পর্শ করে রয়েছে বাবুনকে···স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে স্পর্শকেন্দ্র থেকে।

আর কিছু দেখি নি আমি—দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকিনি। রক্ত জমানো চিৎকারের পর চিৎকার ছেড়ে উন্মাদের মত ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলাম আমি। আসবার সময়ে দেখেছিলাম, মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে আমার হার্ট-উইক বন্ধুটি—ধাক্কার সংঘাত বোধহয় কাটিয়ে উঠতে পারে নি তার দুর্বল হৃৎপিণ্ড—স্টোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পরিধেয় বস্ত্রে···

পরের দিন পোড়া ঘরটার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল কেবল একটা দগ্ধ নরদেহ···

আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিস্তর যন্ত্রাংশ!



একটি আবিষ্কারের কাহিনী

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

ব্যাটিস্টা গ্রাসী এবং রবার্ট কক্ যখন ইটালীর মাঠে মাঠে এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন ভারতবর্ষে আর একজন লোক ম্যালেরিয়ার কারণ সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলেন।

তাঁর নাম রোনাল্ড রস্।

রোনাল্ড রস্ (Ronald Ross)-এর জন্মভূমি ভারতবর্ষে, হিমালয়ের পাদদেশে আলমোড়া শহরে। রোনাল্ডের বাবা একজন যোদ্ধা ছিলেন এবং সীমান্তবর্তী দেশের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ করতেন, কিন্তু রোনাল্ড সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ছেলে ছিল। তার গান শিখতে খুব ভাল লাগত। নিজে গান লিখতো আর নিজের মনে তাতে সুর দিত। বাবা দেখলেন ছেলে ভারতে থাকলে একেবারে বিগড়ে যাবে, তাই ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ। পাস্তুরের নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। অনেক ছাত্রই সাধারণতঃই ডাক্তারি পড়ার জন্য উৎসুক। রোনাল্ডও ডাক্তারি পড়তে ঢুকলো। কিন্তু ডাক্তারিতে একটুও মন ছিল না। সে পাস করল বটে, কিন্তু প্রেসক্রিপশন লিখতোই না। তার বদলে সে শুরু করল উপন্যাস লিখতে। তার ধারণা ছিল, সে যা উপন্যাস লিখছে, প্রকাশকরা শুনলে চমকে উঠবে। দেশের চারদিকে হইহই পড়ে যাবে।

কিন্তু হায়! রস্ পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরল, কিন্তু

কেউই পাত্তা দিল না। কেউ হয়ত দয়াপরবশ হয়ে পাণ্ডুলিপি শুনতো, কিন্তু চমকে ওঠা দূরে থাকুক, উপন্যাস প্রকাশ করার ধারে কাছে যেত না। রোনাল্ড তখন নিজের পয়সায় উপন্যাসগুলো ছেপে ফেললো, ভাবলো এবার দেশবাসী অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, এই নতুন ঔপন্যাসিক কে?

চারদিকে তার নামে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

কিন্তু কোথায় কী? কেউ রোনাল্ডের ছাপানো বই উলটেও দেখলো না। একখানা বইও বিক্রি হল না।

এমন সময় ভারতবর্ষ থেকে রোনাল্ডের বাবা কঠোর ভাবে চিঠি দিলেন,—বাঁদরামি করার জন্য টাকা পাঠাই না। তোমাকে আর টাকা পাঠাবো না। তুমি নিজে রোজগারের বন্দোবস্ত কর।

রোনাল্ড নিরুপায় হয়ে এক জাহাজের ডাক্তার হলেন। জাহাজটি লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাতায়াত করতো। এই জাহাজে বসে বসে কবিতা লিখতেন তিনি। জীবনের ব্যর্থতার কথা লিখতেন। যাত্রীদের হাসিকান্না নিয়ে রচনা করতেন নতুন নতুন কবিতা।

এমন সময় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন রোনাল্ড রস্। ভারতবর্ষে ডাক্তার হয়ে ফিরে এলেন তিনি। ভারতে আসাতে তিনি খুব খুশীই হলেন। অতি অল্প সময়ের জন্যে তাঁকে রোগী দেখতে হত, বাকী সময়টা কবিতা লিখে কাটিয়ে দিতেন।

বেশ কিছুদিন ভারতবর্ষে কাটিয়ে রস্ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন, আর ফিরে গিয়েই নতুন ভাগ্যের সম্মুখে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে মিস রোসা ব্লক্সাম্ (Miss Rosa Bloxam)-এর বিবাহ হল, তারপর তিনি স্ত্রীসহ ভারতে ফিরলেন। ফেরার সময় জাহাজের বিষয় নিয়ে লিখলেন 'চাইল্ড অফ ওসান' (Child of Ocean) উপন্যাস। সেই বোধহয় তাঁর শেষ উপন্যাস। সাহিত্যিক রোনাল্ড রস্ বৈজ্ঞানিক হয়ে গেলেন কোন এক জাদুমন্ত্রে। রস্-এর মাথায় ঢুকলো—কেন এত নেটিভ হিন্দু ম্যালেরিয়ায় মারা যায়? ম্যালেরিয়া কেন হয়? যে লোক কিছুদিন পূর্বেও কালি-কলম নিয়ে মত্ত ছিলেন উপন্যাস কবিতা রচনা করার জন্যে, তিনিই এখন মাইক্রোস্কোপের তলায় ম্যালেরিয়ার জীবাণু অন্বেষণে তন্ময়।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু—? হ্যাঁ—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সেনার চিকিৎসক ল্যাভেরান বলেছেন ম্যালেরিয়ার স্বতন্ত্র জীবাণু আছে। সেই জীবাণু রক্তের ভিতর প্রবেশ করলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ে।

আরম্ভ হল গবেষণা। দিনের পর দিন রোনাল্ড রোগীদের আঙুলে ফুটিয়ে রক্ত বের করে নেন। তারপর সেই রক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করেন। কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পান না। কোথায় ল্যাভেরানের আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়ার জীবাণু? যত সব বাজে!

এদিকে হয়েছে আর এক বিপদ। রোগীরা আঙুল ফুটো হবার ভয়ে আর হাসপাতালের দিকে পা বাড়ায় না। হাতে পায়ে ধরে, ভিক্ষে করে রোনাল্ড যে কয়জনের রক্ত পান, পরীক্ষা করে তাতে কিছুই দেখতে পান না। দিনের পর দিন পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে রোনাল্ড হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন,—না, ল্যাভেরান নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। ছত্রিশ বছর বয়স তখন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। জীবনে যা কিছু করতে গিয়েছেন তাতেই ব্যর্থ হয়েছেন বার বার।

কিন্তু এই ব্যর্থ হয়ে লণ্ডনে আসার পেছনে বোধহয় সৌভাগ্যের ইঙ্গিত ছিল। অলক্ষ্যে তাঁর ভাগ্যবিধাতা তাঁকে নিয়ে গেলেন লণ্ডনের একটি বাড়িতে, যেখানে প্যাট্রিক ম্যানসন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। প্যাট্রিক ম্যানসন সাংহাইতে প্রাকটিস করতেন। তিনি সেখানে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন মশা চীনাদের শরীর থেকে জীবাণু চুষে চুষে খায়। তিনি আরও বলেছিলেন এই জীবাণুগুলো মশার পেটে জন্মায়। হারলি স্ট্রীটের বিখ্যাত ডাক্তাররা ম্যানসনের এই উদ্ভট উক্তিকে বিদ্রূপ করে বলতেন,—ম্যানসন হলেন চিকিৎসা জগতের জুলে ভার্নে (**Jules Verne**)।

জুলে ভার্নের কথা নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছো। টোয়েন্টি থাউস্যাণ্ড্ লীগস্ আণ্ডার দি সী, মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড, জার্নি টু দি সেণ্টার অফ দি আর্থ, রাউণ্ড দি ওয়াল্‌র্ড্ ইন্ এইটটি ডেজ, প্রভৃতি অমর সাহিত্যের স্রষ্টিকর্তা। সাবমেরিন আবিষ্কারের পূর্বেই তিনি সাবমেরিনের কথা লিখে গিয়েছিলেন। এরোপ্লেন আবিষ্কারের আগে তিনি বেলুনের কথা কল্পনা করে লিখে

গিয়েছিলেন। সমসাময়িক যুগের লোকেরা তাঁর লেখা পড়ে হাসতেন। বলতেন গাঁজাখুরী লেখার রাজা হলেন জুলে ভার্নে।

ম্যানসনের কথাকে কেউ বিশ্বাস করতেন না বলে সবাই তাঁকে জুলে ভার্নের সঙ্গে তুলনা করতেন।

অবিশ্বাস করেন নি একজন, তিনি রোনাল্ড রস্।

প্রত্যহ প্যাট্রিক ম্যানসনের বাড়িতে তিনি আসতেন, চুপচাপ বসে শুনতেন। ম্যানসন তাঁকে উপদেশ দিতেন,—রোনাল্ড, তুমি ভারতে ফিরে যাও। আমি বলছি তুমি ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করতে পারবে। তুমি ঠিক পথেই চলছো। শুধু ধৈর্য ধরে কাজ করে যাও, দেখবে একদিন তুমি সফল হবে। তুমি যেটুকু খুঁজে পাবে আমায় চিঠি লিখে জানিও। যদি কোন সমস্যায় পড়, তাও জানিও—আমি তোমাকে যতটা পারি সাহায্য করবো।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ স্ত্রী-পুত্র রেখে একা রোনাল্ড রস্ প্যাট্রিক ম্যানসনের আশীর্বাদ মাথায় করে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন।

ভারতবর্ষ তখন এক নতুন জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত। বাঙলাদেশের যুবকের দল তখন স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রে জাগ্রত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সে সময় এক কাণ্ড বাধলো। আর সেই গোলমাল থেকে সর্বভারতীয় বিপ্লব শুরু হল। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা দেশপ্রেমিক হয়ে উঠলেন, কারণ তখনকার অধিকাংশ ইংরেজী সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমিকতা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ আই. সি. এস. পাস করার পরও তাঁকে কোন চাকরি দেওয়া হয় নি। অনেক গোলমালের পর অবশেষে তিনি চাকরি পেলেন, কিন্তু বিনা কারণে কয়েদিনের মধ্যে আবার চাকরি চলে গেল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চাকরি যাওয়ার ফলেই সুরেন্দ্রনাথ একজন সর্বভারতীয় নেতা হয়ে উঠলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম বোম্বাই শহরে এক জাতীয় অধিবেশন আহ্বান করেন। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি নামে এক বাঙালী ব্যারিস্টার সেই সভার সভাপতি ছিলেন। সেই অধিবেশনই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। তার পরের ইতিহাস জাতির সংগ্রামের ইতিহাস। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রাম কাহিনী।

এই রকম সময় রোনাল্ড রস্ ভারতবর্ষে পদার্পণ করলেন। তাঁকে অবিলম্বে

সেকেন্দ্রাবাদের সৈন্য শিবিরে বহাল করা হল। সেখানে তিনি অল্প কয়েক-দিনেই হাঁপিয়ে উঠলেন। কোন রোগী তাঁর কাছে যেতে চায় না। সবাই ভয় পায়। বলে, ওই পাগলা ডাক্তারের কাছে গেলেই, হাত ফুটিয়ে রক্ত নেয়। ওর কাছে কেউ যাবো না।

শিবিরের কর্নেল পর্যন্ত ভাবলেন রস্-এর মাথা খারাপ হয়েছে এবং পারত-পক্ষে তাঁকে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিন অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে রস্ ম্যানসনকে চিঠি লিখে জানালেন, রিসার্চ একটুও এগোচ্ছে না। কেউ রক্ত দিতে চায় না।

ম্যানসন উত্তর দিলেন, তুমি ভুল পথে যাচ্ছো। লোক না চিরে, মশা চিরে দেখো কোন কিছু পাও কিনা!

নতুন ভাবে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন রস্। মশা ধরেন আর চিরে মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে পরীক্ষা করেন। কোন রোগী পেলে তার গায়ে মশা ছেড়ে দেন, আর সেই মশা ধরে পরীক্ষা করেন। কিন্তু কিছু পান না। তাঁর অত্যাচারে রোগীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ভয়েতে কেউ তাঁর ধারে কাছে যায় না। কর্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না দেখে তাঁকে বাঙ্গালোরে বদলি করে দিলেন। সেখানে ভীষণ কলেরা হচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ রোনাল্ডের ওপর আদেশ দিলেন যেন কলেরা অতি অবশ্য বন্ধ হয়। কিন্তু কলেরা তিনি বন্ধ করতে পারলেন না। অগত্যা আবার তাঁকে সেকেন্দ্রাবাদে বদলি করা হল। রোনাল্ড প্রার্থনা করলেন যেখানে ম্যালেরিয়া বেশী এমন জায়গায় তাঁকে বদলি করলে খুব ভাল হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁর কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন। সাহেব ডাক্তাররা সহজে ম্যালেরিয়াদুষ্ট জায়গায় যেতে চাইতেন না, তাই সহজেই রোনাল্ডের আবেদন মঞ্জুর হল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে তাঁকে বদলি করা হল। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের দক্ষিণে তখন প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল। সেই হাসপাতালে মহানন্দে রোনাল্ড গবেষণা আরম্ভ করে দিলেন। রোনাল্ড দুজন সহকর্মী বহাল করলেন। একজনের নাম মহম্মদ বক্স। অন্য জন পারবুনা। এই দুজনে রাজ্যের মশা ধরে নিয়ে আসতো আর পরমানন্দে রস্ মশার দেহ চিরে যেতেন।

আর দিনের পর দিন অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে চোখ রেখে চলত তাঁর অক্লান্ত সাধনা।

একদিন পেলেন। এতদিনের সাধনার পর হঠাৎ একদিন তাঁর সিদ্ধির পথ খুলে গেল। তিনি পরম আশ্চর্যের সঙ্গে দেখলেন ধূসর রঙের মশার পেটে ম্যালেরিয়ার জীবাণু রয়েছে।···কেটে চলেছেন। উন্মাদের মত একটার পর একটা মশা চিরে যাচ্ছেন আর জীবাণু দেখতে পাচ্ছেন।

এবার দেখা যাক পশু-পাখির দেহের ভিতর জীবাণু প্রবেশ করানো যায় কিনা?

আরম্ভ করলেন গবেষণা। পাখির শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন। পাখির দেহে ম্যালেরিয়া ফুটে উঠল। তারপর সেই ধূসর রঙের মশাদের পাখির গায়ে ছেড়ে দিলেন। দেখলেন ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার পেটের ভিতর চলে গেছে। মশা যখন পাখিকে কামড়াল তখন শুঁড় দিয়ে রক্ত টেনে নিয়েছিল। রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণুও সে শুষে নিয়েছে। সেই মশাগুলোকে কয়েকদিন খাঁচায় রেখে আবার ভাল পাখিদের গায়ে ছেড়ে দিলেন, দেখলেন ভাল পাখিদেরও ম্যালেরিয়া হয়েছে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন রোনাল্ড রস্। তাঁর আবিষ্কারের কথা ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশ করলেন আর তাঁর গুরু প্যাট্রিক ম্যানসন-কে লিখে জানালেন,—আমি ম্যালেরিয়ার সন্ধান পেয়েছি। ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাখির দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়ে ম্যালেরিয়া রোগ তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস, এই ধূসর রঙের মশার দ্বারাই ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়।

প্যাট্রিক ম্যানসন চিঠি পড়ে রস্‌কে উত্তর দিলেন,—প্রিয় রস্, তোমার সার্থকতার কথা পড়লাম। তুমি পাখির শরীরে ম্যালেরিয়া রোগ তৈরি করেছো শুনে সত্যই আমি আনন্দিত। কিন্তু তোমার রিসার্চের শেষ এখনো হয় নি। পাখির শরীরে যা সত্য, মানুষের শরীরেও যে তাই ঘটবে এ ধারণা তোমার কিসে হল? যতক্ষণ তুমি প্রমাণ করতে না পারবে যে মানুষের শরীরেও ওই একই ভাবে রোগ সংক্রামিত হয়, ততক্ষণ তোমার রিসার্চ অসম্পূর্ণ। তুমি আরও রিসার্চ চালিয়ে যাও। আমার আশীর্বাদ রইল।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। ইটালীর গ্রামে গ্রামে রবার্ট কক্ ও জিওভানী ব্যাটিস্টা গ্রাসী (Giovanni Battista Grassi) নামে দুজন বৈজ্ঞানিক

ম্যালেরিয়ার বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। দেখা যাক সম্মানের জয়মুকুট ইটালীর ভাগ্যে যায় না ইংলণ্ডের ভাগ্যে যায়!

রোনাল্ড রস্ যখন ভারতবর্ষের বুকে আবিষ্কার করেছেন ধূসর রঙের মশার পেটে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু জন্মগ্রহণ করে, আর সেই মশা পাখিকে কামড়ালে পাখির ম্যালেরিয়া রোগ হয়, তখন ইটালীতে দুজন মনীষী ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। একজন স্বনামধন্য রবার্ট কক্, অন্যজন তরুণ বৈজ্ঞানিক ব্যাটিস্টা গ্রাসী।

গ্রাসী সজোরে মাথা নেড়ে রবার্টকে বললেন,—জানেন, আমি ইটালীর এমন জায়গা দেখেছি, যেখানে মশা ভরতি অথচ সেখানে ম্যালেরিয়া নেই। কিন্তু এমন একটি জায়গাও দেখি নি যেখানে ম্যালেরিয়া আছে অথচ মশা নেই।

—তা থেকে তোমার কী মনে হয়?—প্রবীণ বৈজ্ঞানিক থতমত খেয়ে নবীনকে প্রশ্ন করলেন।

—তা থেকে এই মনে হয় যে বিশেষ কোন শ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করছে। আমার গবেষণা হবে কোন্ শ্রেণীর মশা এই জীবাণু বহন করছে তা আবিষ্কার করা।

গ্রাসীর কথা কক্ বিশ্বাস করলেন না। বার্ধক্যের জন্য তিনি ভালভাবে চিন্তা করতে পারতেন না। এলোমেলো যা-তা ভাবতেন।

ব্যাটিস্টা গ্রাসী ইটালীর প্রান্তরে প্রান্তরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি কেবল বলতেন,—ম্যালেরিয়া ইটালীর সর্বনাশ করে দিল। চাষীর দল এই রোগের মড়কে নিঃশেষ হয়ে গেল। যে করেই হোক এই রোগের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে।

ইটালীর কার্পাসিও উপত্যকায় রেললাইন পাতা আরম্ভ হয়েছিল তখন, কিন্তু রেল কোম্পানির কর্মচারীরা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে উজার হয়ে যেতে লাগল। কেউ আর ভয়ে কাজ করতে চায় না। গ্রাসী এমনি একটা জায়গা খুঁজছিলেন নিজের গবেষণার জন্যে। তিনি ইটালীর সরকারকে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অর্থ মঞ্জুর করলেন গ্রাসীর গবেষণার সুবিধের জন্যে।

গ্রাসী গবেষণা করতে করতে দেখলেন তিনি যা ভেবেছেন তাই ঠিক।

বিশেষ একশ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। যেখানে সে মশা নেই, সেখানে ম্যালেরিয়াও নেই। যেখানে সে মশার প্রাদুর্ভাব, সেখানেই ম্যালেরিয়ার মড়ক।

কিন্তু কোন্ শ্রেণীর মশা জীবাণু বহন করে?

আবার গবেষণা। আবার অন্বেষণ। খুঁজতে খুঁজতে একরকম বিশেষ শ্রেণীর মশা খুঁজে পেলেন, যারা মানুষের দেহ থেকে রক্ত শোষণ করে। গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞেস করতে তারা বলল,—আমরা এই মশাদের জাঞ্জারোন (Zanzarone) বলি।

জাঞ্জারোন—জাঞ্জারোন··· !

ব্যাটিস্টা গ্রাসীর মস্তিষ্কের ভিতর আগুন জ্বলতে লাগলো। তিনি স্পষ্ট দেখলেন রক্তপায়ী মশাদের লেজগুলো আকাশের দিকে তোলা, আর এগুলো স্ত্রী-মশক। বহুদিন আগে থেকেই বিশেষজ্ঞরা এই জাতের মশার নাম রেখেছেন অ্যানোফিলিস ক্ল্যাভিজার (Anopheles Claviger)।

অ্যানোফিলিস ক্ল্যাভিজার! অ্যানোফিলিস ক্ল্যাভিজারের স্ত্রী-মশা ম্যালেরিয়া বহন করে বেড়ায়। সেই বাহক মশা যখন মানুষের রক্ত শোষণ করে, তখন দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয় ম্যালেরিয়ার জীবাণু। গ্রাসীর জীবনের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠল অ্যানোফিলিস মশা আর ম্যালেরিয়ার জীবাণু। যেখানেই অ্যানোফিলিস মশা দেখতে পান, পাকস্থলী চিরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পরীক্ষা করেন।

গ্রাসী রোমে ফিরে এলেন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর লিন্‌সেই (Lincei) অ্যাকাডেমির সামনে তাঁর গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করলেন, —"অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে এবং ঐ মশার কামড় থেকেই ম্যালেরিয়া হয়।"

তারপর গ্রাসী রোমের হোলি স্পিরিট হাসপাতালের ডাক্তার ব্যাস্টিয়ানেলীর (Dr. Bastianelli) সঙ্গে দেখা করলেন। পাহাড়ের ওপর সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে এই হাসপাতাল। কোনদিন কোন লোক এখানে ম্যালেরিয়ায় ভোগে নি। গ্রাসী এখানেই নিজের গবেষণা করবেন বলে স্থির করলেন। সেই

হাসপাতালের রোগী মিঃ শোলা এগিয়ে এলেন গবেষণার রোগী হিসেবে। তিনি বললেন,—আমার গায়ে যত ইচ্ছে মশা ছেড়ে দিন। আমার কিছু হবে না।

গ্রাসী, ব্যাস্তিয়ানেলী এবং গ্রাসীর অন্যতম সহকারী বিগনামী মিঃ শোলার গায়ে অ্যানোফিলিস মশা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁর কিছুই হয় নি। ব্যাস্তিয়ানেলী একটু দমে গেলেন। রবার্ট কক্ ঘোষণা করলেন, গ্রাসীর আবিষ্কারে ভুল আছে। ম্যালেরিয়া মশা দ্বারা হয় না।

গ্রাসী দমলেন না। তিনি রোমের বাইরে চলে গেলেন, তারপর সেখান থেকে এক বাক্স অ্যানোফিলিস মশা ধরে নিয়ে এসে মিঃ শোলার গায়ে ছেড়ে দিলেন।

পরদিন মিঃ শোলার কাঁপিয়ে জ্বর এলো।

গ্রাসী আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ মিঃ শোলার-এর রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বর্তমান।

গ্রাসীর সাধনা এতদিনে সার্থক হল।

হঠাৎ একদিন একটা মেডিকেল জার্নালের পাতা খুলে অবাক্ হয়ে গেলেন ব্যাটিস্টা গ্রাসী। ভারতবর্ষের কলকাতা শহরের প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে রোনাল্ড রস্ নামে এক ডাক্তার প্রমাণ করেছেন মশার পেটে ম্যালেরিয়ার জীবাণু জন্মায় আর সেই মশা পাখিকে কামড়ালে পাখির ম্যালেরিয়া হয়। ম্যালেরিয়া জীবাণু কেমন দেখতে তাও তিনি এঁকে দেখিয়েছেন। অবাক্ হয়ে গ্রাসী দেখলেন, তিনি যা আবিষ্কার করেছেন, অবিকল সেই জিনিসই রোনাল্ড রস্ আবিষ্কার করেছেন।

আবিষ্কারের তারিখটা ঝুঁকে পড়ে দেখলেন ব্যাটিস্টা গ্রাসী। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। ঠিক তাঁর আবিষ্কারের এক বছর আগে।

—কিন্তু আমি তো রস্-এর নাম শুনি নি। আমি যা কিছু করেছি, নিজের মৌলিক গবেষণায় করেছি। অন্যকে তো অনুকরণ করি নি! অনেকটা নিজের মনেই বিড়বিড়িয়ে বললেন ইটালীর হতভাগ্য আবিষ্কারক ব্যাটিস্টা গ্রাসী। হতভাগ্য কেন বললাম তা একটু পরেই বুঝতে পারবে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রোনাল্ড রস্‌কে সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানির প্রেসিডেন্ট

প্রিন্স অগাস্টি নিমন্ত্রণ জানালেন। তিনি লিখলেন,—ইসমেলিয়া শহরে এত বেশী ম্যালেরিয়ার উপদ্রব যে ক্যানালের কর্মীরা কাজ করতে পারছে না। যদি এই ভয়াবহ রোগ থেকে আমাদের না বাঁচান, তাহলে বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে আমাদের।

চিঠি পেয়ে রোনাল্ড রস্ ইসমেলিয়া শহরে উপস্থিত হলেন। কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে দেখলেন শহরের এঁদো পচা নরদমায় কোটি কোটি শিশুকীট জন্মে রয়েছে। এগুলো থেকেই মশা উৎপন্ন হবে বুঝতে পারলেন তিনি। এগুলোকে মারতে পারলে মশার উপদ্রব কমে যাবে, আর অধিবাসীরাও ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার পাবে। এখন, কী করে এই শিশুকীটগুলোকে মারা যায় তাই ভাবতে লাগলেন রস্। হঠাৎ একদিন মাথায় এলো অক্সিজেনের জন্যেই ওই কীটগুলো বেঁচে আছে। অক্সিজেন বন্ধ করে দিলে সব দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

অনেক ভেবে রস্ এক উপায় বের করলেন। নরদমায় টিন টিন তেল ঢালতে লাগলেন। তেলের একটা স্তর পড়ে গেল নরদমার ওপর। ফলে সব কীট তেলের তলায় পড়ে মরে গেল। ওদিকে জাদুর মত সমস্ত মশা শহর ছেড়ে পালাল। আর তার ফলে শহরও ম্যালেরিয়া মুক্ত হল।

রোনাল্ড রসের জয়জয়কার শুরু হয়ে গেল চারিদিকে। তিনি ইসমেলিয়া শহরকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করেছেন। ক্রমে সেই কথা ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছল। দেখতে দেখতে বিশ্ববাসী জানতে পারল রোনাল্ড রসের আবিষ্কারের কথা।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রোনাল্ড রসের কপালে আঁকা হল ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ সম্মান সার উপাধি।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল কমিটি সার রোনাল্ড রস্‌কে নোবেল পুরস্কার দিলেন।

ইটালীর হতভাগ্য আবিষ্কারক ব্যাটিস্টা গ্রাসী হারিয়ে গেলেন বিস্মৃতির তলে। কেবল ইটালীর লোক ছাড়া অন্য দেশের লোকেরা ব্যাটিস্টা গ্রাসীর নাম ভাল করে শোনেও নি।

———



অশোক পত্রনবীশ আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর মুখে বললো, 'স্যার, একটা কথা বলার আছে—'

অশোক এমনিতে খুব হাসিখুশি যুবক, তাছাড়া বুদ্ধিমানও বটে। বেশির ভাগ সময়েই সে নিজের অদ্ভুত পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং তার এখনকার হাবভাব যে একটু বেমানান তাতে সন্দেহ নেই।

'বলো, কি বলতে চাও।' কৌতূহলী চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

'স্যার···একটা গাছকে কেউ কষ্ট দিচ্ছে। যন্ত্রণায় সেটা চিৎকার করছে, ছটফট করছে। আমার যন্ত্রে সব ধরা পড়ছে।' অশোক পত্রনবীশের কণ্ঠস্বর আবেগে থমথম করছে।

আমি অর্ধেক অবিশ্বাস ও অর্ধেক সংশয় নিয়ে চুপ করে রইলাম। বিপদ-গ্রস্ত গাছকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে আমাদের সরকারী সংগঠন—সবুজ সংরক্ষণ সংস্থা। আমি এই সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর।

সবুজ নিয়ে সংকট প্রথম দেখা দিয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। কলকারখানা,

যানবাহন, তেজস্ক্রিয় আবর্জনা ইত্যাদির প্রকোপে সজীব গাছপালা ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়তে থাকে। তার উপরে ছিলো আমাদের এই সভ্যতার দুরন্ত গতি বিস্তার। ফলে লক্ষ লক্ষ অক্সিজেনদায়ী গাছ ধরাশায়ী করা হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। যখন মানুষ বুঝতে পারলো গাছ তাদের একান্ত বন্ধু, যাকে ছাড়া তাদের সভ্যতার অবলুপ্তি পর্যন্ত ঘটতে পারে, তখন তারা উঠে পড়ে উদ্যোগী হলো সবুজ সংরক্ষণে। সরকারের তরফ থেকে জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করা হতে লাগলো, তারা যেন সুযোগ পেলেই 'বৃক্ষরোপণে উৎসাহী' হয়। সে যুগের এক উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানী অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিয়েছিলেন একটা গাছ সারা জীবনে মানব সভ্যতার যে উপকার করে, তার দাম বেশ কয়েক লাখ টাকা। এরকম নানান প্রচেষ্টায় জনসাধারণের কিছু অংশকে সচেতন করা গেলেও বিপদের বড় অংশটা থেকেই গেলো। মানুষ খুশি মতো গাছ কাটছে, পাতা ছিঁড়ছে, ফুল ছিঁড়ছে। এর ওপর সমস্যা পরিবেশ দূষণের। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে সরকারী উদ্যোগে তৈরি হলো সবুজ সংরক্ষণ সংস্থা। শহর ও শহরতলীর প্রতিটি এলাকায় এর অফিস রয়েছে। আর সঙ্গে রয়েছে নতুন মহাকাশ যুগের নতুন নতুন সব যন্ত্রপাতি। ফলে কেউ সরকারী অনুমোদন ছাড়া কোন গাছের ক্ষতি করছে, এখবর পেলেই আমরা সরাসরি সেই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি। নতুন সবুজ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী নিজের বাগানের গাছেরও কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।

সুতরাং আমরা যথাসম্ভব নিজেদের কর্তব্য করে যাচ্ছিলাম। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস—প্রতিদিন অন্ততঃ বার চারেক অতি সূক্ষ্মভাবে মেপে, বা বাতাসের গতিবিধির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আমরা আঁচ করার চেষ্টা করি, সবুজের ক্ষতি করে সরকারী আইন কেউ লঙ্ঘন করছে কিনা। এরই মধ্যে এক নতুন অফিসার যোগ দিয়েছে আমাদের সংস্থায়। নাম তার অশোক পত্রনবীশ। সে নাকি গাছপালার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একাই গবেষণা করে। গাছের কথা শোনার জন্য, গাছের অভিব্যক্তি ও আচরণ বোঝার জন্য সে নানান পদ্ধতিতে চেষ্টা করছে। কখনও ইলেকট্রনিক পদ্ধতি, কখনও বা টেলিপ্যাথি। এই মুহূর্তে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে

চাইছে, একটা গাছের আর্তনাদ তার যন্ত্রে ধরা পড়েছে! তবু ভালো যে টেলিপ্যাথিতে ধরা পড়েনি, কারণ টেলিপ্যাথি জিনিসটাই আমার মতে ডাহা বুজরুকি—তার উপর আবার গাছের সঙ্গে!

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আমি অশোককে প্রশ্ন করলাম, 'গাছটা কোন্ জায়গায় আছে বুঝতে পেরেছো?'

আমার প্রশ্নে অশোক উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলো, 'উত্তর পূর্ব দিকে দু-তিন মাইলের মধ্যে স্যার। আমার পলিগ্রাফ যন্ত্রে যেটুকু ধরা পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে গাছটা ব্যথা পাচ্ছে, তার কষ্ট হচ্ছে। গ্রাফে সংকেতের কাঁপা কাঁপা ছবি দেখে যা বুঝেছি তাতে গতকাল ভোর থেকে কেউ সেটাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে—দিনে প্রায় সাত আট বার করে।'

এ আবার কেমন লোক যে গাছকে ইচ্ছে করে যন্ত্রণা দেয়, যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পায়? অশোক পত্রনবীশ কি পারবে এই অত্যাচারীকে খুঁজে বের করতে?

একটু চিন্তিতভাবেই বললাম, 'তা তুমি এখন কি করবে ঠিক করেছো?'

অশোক বললো, 'একটা মানি প্ল্যান্ট আর আমার পলিগ্রাফ নিয়ে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়বো—'

'মানি প্ল্যান্ট? মানি প্ল্যান্ট দিয়ে কি হবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

অশোক ছোট্ট করে হাসলো, বললো, 'স্যার, মানি প্ল্যান্ট জাতীয় বড়বড় পাতাওয়ালা কোন লতানো গাছ আমার পলিগ্রাফের অ্যান্‌টেনা হিসেবে কাজ করতে পারে। আহত গাছটার যন্ত্রণা তরঙ্গ প্রথমে ধরা পড়ে মানি প্ল্যান্টের ভেতর। তখন ঐ লতানে গাছটা নিজেই ছড়িয়ে দেয় এক সহানুভূতিশীল প্রতিক্রিয়া তরঙ্গ। সেটা আমার পলিগ্রাফ তার রেকর্ডারের চার্টে এঁকে ফেলে।'

আমি ক্রমশ যে অবাক হচ্ছিলাম সেটা বোধহয় অশোকের চোখে ধরা পড়লো। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'অন্য কোন মানুষের যন্ত্রণার চীৎকার শুনলে আমাদের মনে যেমন সহানুভূতির সৃষ্টি হয়, এটাও অনেকটা সেই ধরনের স্যার।...যাই হোক যতই আমরা গাড়ি নিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগোবো, পলিগ্রাফের সিগন্যাল ততোই জোরদার হয়ে উঠবে!'

গাছের অনুভূতি আছে। এটা গত শতাব্দীর বিজ্ঞানী জগদীশ বসু প্রমাণ করে গেছেন। সেই কারণেই কি অশোক গাছকে অনুভূতিশীল প্রাণী বলে সম্মান করে? গাড়িতে তার সঙ্গী থাকবে মানি প্ল্যান্ট। সেই জন্যই কি সে বললো, '…যতোই আমরা গাড়ি নিয়ে এগোবো…'

টেবিলে বার কয়েক টোকা মেরে আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাও। কাল তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবো।'

অশোক সামান্য হতাশ হয়ে চলে গেলো। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম, কি করা যায়? পত্রনবীশের কাজে আমি খুব একটা বাধা দিই না, কারণ ছেলেটির প্রতিভা আছে। কিন্তু এইমাত্র যা শুনলাম সেটা যে বিশ্বাস করা শক্ত! সে সরাসরি কারো দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলবে, 'নমস্কার, আপনি কি কোন গাছের ওপর অত্যাচার করছেন?' এটা ভাবতেই আমার আশঙ্কা হচ্ছে। কারণ অপরাধ প্রমাণ করতে না পারলে সেই লোক আমাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারে।

ভাবনা চিন্তায় কতোক্ষণ সময় কেটেছে জানি না, হঠাৎই ভিডিও ফোনে স্থানীয় নিরাপত্তা বিভাগের ক্যাপ্টেনের ছবি ফুটে উঠলো। তিনি জানালেন, এক ভদ্রমহিলা সিকিওরিটি বিভাগে এক অদ্ভুত অভিযোগ করেছেন। তাঁর প্রতিবেশীর বাগান থেকে নাকি গাছের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। গাছটা যন্ত্রণায় কাঁদছে, প্রাণপণ আর্তনাদ করছে। মহিলার পক্ষে ঘরে বাস করাই দায় হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, চিৎকারটা দেবদারু গাছের কান্না। স্বভাবতই নিরাপত্তা বিভাগ তদন্তে রাজি হয়নি। তারা এই কেস তুলে দিচ্ছে সবুজ সংরক্ষণ সংস্থার হাতে—অর্থাৎ, আমাদের হাতে।

খবরটা পেয়ে মনে মনে হাসিই পেলো আমার। এই মামলাটা হাতে পেলে অশোক নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে। একটু আগে সে তো এই ধরনেরই একটা অভিযোগ এনেছিলো আমার কাছে। মনে হলো, ঐ ভদ্রমহিলার মেজাজের সঙ্গে অশোক পত্রনবীশের মেজাজ বেশ খাপ খাবে। সুতরাং তক্ষুণি তাকে ডেকে কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম। সে মোবাইল ইউনিট নিয়ে রওনা হয়ে গেলো।

অফিস বন্ধ হবার সময়, সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ, অশোক পত্রনবীশ ফিরে এলো। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তার মুখ লালচে দেখাচ্ছে। পলিগ্রাফের সাদা

চার্টটা সে আমার চোখের সামনে মেলে ধরলো। তাতে শুধু একটা আঁকাবাঁকা রেখা, মাঝে মাঝে ওপরে নিচে লম্বা লম্বা খোঁচা রয়েছে। গাছের যন্ত্রণার তরঙ্গ।

চার্টটা দেখিয়েই পত্রনবীশ একেবারে ফেটে পড়লো, 'স্যার, লোকটার নাম হরিচরণ চক্রবর্তী। একটা আস্ত ঘাগী শয়তান! দেখেছেন চার্টটা, গাছটাকে নিয়ে কি অত্যাচার সে করছে? যে করে হোক লোকটাকে জেলেপুরতেই হবে!'

আমি একটু ক্লান্ত ভাবেই বলতে গেলাম যে, এখন থাক, আগামী কাল বিস্তারিত কথা হবে। কিন্তু আমার মনের অবস্থা বা অভিব্যক্তিকে একটুও আমল না দিয়ে অশোক এক নিঃশ্বাসে বলে চললো, 'এখন মনে পড়ছে, এই লোকটা কয়েক সপ্তাহ আগে আমার ল্যাবরেটরি দেখতে এসেছিলো। তখন আমাকে পনেরো মিনিট ধরে নানান প্রশ্ন করেছিলো। বিশেষ করে জানতে চেয়েছিলো, কি করে গাছের প্রতিক্রিয়ার সাইকো-সিগন্যাল মাপা যায়। এখন সেই সব তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে সে নিজের বিকৃত উল্লাস মেটাচ্ছে। আর বেচারা দেবদারু গাছটার কি করুণ অবস্থা!'

দেবদারু গাছের করুণ অবস্থা! বেশ বুঝতে পারছি গাছের সঙ্গে অশোকের একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে।

হাতের চার্টটা আবার তুলে ধরলো অশোক। বললো, 'এই রেকর্ডিং চার্টটা আমি তৈরি করেছি ঐ ভদ্রমহিলার বাড়িতে গিয়ে। এই যে লম্বা লম্বা খোঁচাগুলো দেখছেন, এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে হরিচরণ কখন কখন গাছটার ওপরে অত্যাচার করেছে। ঘণ্টা দুয়েক আমি সেখানে ছিলাম। তার মধ্যে সে একবার গাছের ছাল তুলেছে ছুরি দিয়ে। গাছের পাতা অ্যাসিডে ডুবিয়ে পুড়িয়েছে। আর সবশেষে; এই যে, সবচেয়ে লম্বা যে খোঁচাটা, এটা রেকর্ড করেছি যখন হরিচরণ গরম লোহার শিক চেপে ধরেছে গাছের গুঁড়িতে। লোকটা নির্ঘাৎ এক ভয়ঙ্কর পাগল!'

নানান তথ্যে দিশেহারা হয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু অশোক, ভদ্রমহিলা তো রিপোর্ট করেছিলেন যে তিনি গাছের কান্না শুনেছেন?'

'এসব ঐ শয়তান হরিচরণের কীর্তি।' অশোক ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'গাছের পাতার সঙ্গে ইলেকট্রনিক পিক-আপ লাগিয়ে আমি যেমন পলিগ্রাফ যন্ত্রে সিগন্যাল রেকর্ড করি, সেও অনেকটা তাই করেছে। শুধু পলিগ্রাফের বদলে

একটা অ্যাম্প্‌লিফায়ার ও মাইক লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর হরেক কারিকুরি করে এমন করেছে যে আহত হলেই গাছের অনুভূতি মানুষের কান্নার মতো শব্দের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে।'

'কিন্তু কি করে হরিচরণকে শায়েস্তা করা যায় ? যদি আমরা তার বাড়িতে হানা দিই তাহলে সমস্ত প্রমাণ সে লোপাট করে ফেলবে—'

আমার কথায় অশোক কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, 'আমি একটা উপায় ভেবেছি, স্যার। আজ রাতটা অফিসের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে পারলে ভালো হয়। কাল সকালে হরিচরণ চক্রবর্তীর ব্যবস্থা করছি।'

আমি হেসে বললাম, 'স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই। আশা করি তুমি হরিচরণকে এমন শায়েস্তা করবে যাতে সারাজীবন সে গাছের গায়ে হাত দিতে পর্যন্ত ভয় পায়।'

একথা বলে আমি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন বিকেলে অশোক পত্রনবীশ আমার কাছে এলো। চোখে মুখে খুশি উপচে পড়ছে। খুশি আমিও। কারণ একটু আগেই নিরাপত্তা বিভাগ থেকে খবর পেয়েছি। সুতরাং অশোক কিছু বলে ওঠার আগে আমিই তাকে সুখবরটা শোনালাম। বললাম, 'অশোক, এই মাত্র খবর পেলাম আমাদের হরিচরণ চক্রবর্তী সটান নিরাপত্তা-বিভাগে গিয়ে হাজির হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের জানিয়েছে সে গাছের ভয়ে পালাচ্ছে। একটা দেবদারু গাছ নাকি প্রতিশোধ নেবার জন্য তাকে তাড়া করেছে। সে নিরাপত্তা বিভাগে আশ্রয় চায়। অবাক কাণ্ড কি জানো ? হরিচরণ বলেছে, গাছটা তাকে মানুষের ভাষায় কথা বলে শাসিয়েছে। এখন তাকে মানসিক চিকিৎসার জন্য হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। ওঃ, আমাদের ঝামেলা তাহলে মিটলো'।

আমি থামতেই অশোক হেসে বললো, 'স্যার, আমার পরীক্ষা বেশ ভালোই কাজ দিয়েছে। আসলে, ঠিক যে কম্পাঙ্কে হরিচরণ গাছের কান্না শুনছিলো সেই কম্পাঙ্কটা আমি পরীক্ষা করে বের করি। তারপর একটা ট্রান্স-মিটারের মাধ্যমে ঐ দেরদারু গাছের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। আজ সকালে হরিচরণ যেই একরাশ উইপোকা গাছটার গুঁড়ির ওপর ছেড়ে দিয়েছে, ওমনি আমি ট্রান্সমিটারে কথা বলি। গাছের চিৎকারের স্বরের সঙ্গে মিল রেখে ওকে

ভয় দেখাই। বলেছি, মাথায় ভেঙে পড়ে ওকে শেষ করে দেবো। গাছের রস থেকে তার ক্যান্সার হতে পারে। তাছাড়া প্রতি মুহূর্তে আমি ওকে তাড়া করবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। প্রথমত, দেবদারু গাছের কাছ থেকে মানুষের ভাষায় কথা শুনেই হরিচরণ দারুণ ভয় পেয়ে যায়। তার ওপর যখন ঐসব ভয় দেখিয়েছি তখন আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। সোজা গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।'

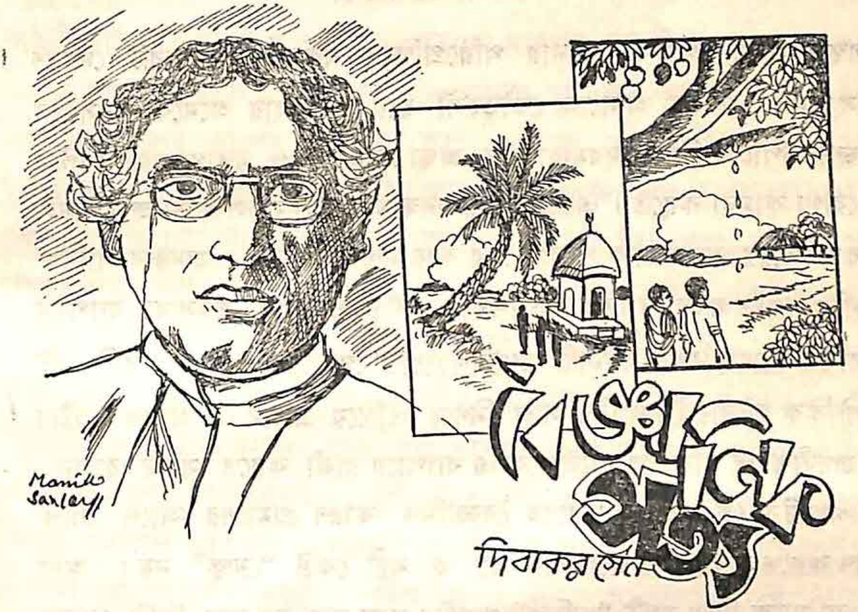
অশোকের কথা শেষ হতে আমি বললাম, 'হরিচরণ চক্রবর্তী লোকটা শয়তান হলেও তার প্রতিভা ছিলো। আচ্ছা, অশোক, সত্যিই কি কোন গাছ মানুষের ওপরে প্রতিশোধ নিতে পারে?'

অশোক উত্তর দিলো, 'না, স্যার। আমাদের মস্তিষ্কের মতো গাছের কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই। ওদের একটা কোষ থেকে আর একটা কোষে খবর আদান-প্রদান হয় ঠিকই, কিন্তু ওরা চিন্তা করতে পারে না, বা ডালপালা ইচ্ছে মতো নাড়াতে পারে না।'

অশোক পত্রনবীশের বুদ্ধি ও প্রতিভা আমাকে সব সময়েই অবাক করে। এখনও করলো! কিন্তু একটা প্রশ্ন বরাবর আমার মনে খোঁচা দিয়ে চলেছে যার উত্তর আমি এখনও পাইনি। সুতরাং সুযোগ বুঝে সেই প্রশ্নটা করলাম অশোককে, 'অশোক, একটা কথার জবাব দাও তো। নিরাপত্তা বিভাগের খবর আসার আগেই তুমি কেমন করে ঐ দেবদারু গাছের কান্নার খবর পেলে?'

অশোক নরম সুরে বললো, 'স্যার, আগেই তো বলেছি, গাছেরা পরস্পরের মধ্যে অনুভূতি আদান প্রদান করতে পারে। তবে আহত গাছের খুব কাছাকাছি যে সব গাছ থাকে তারাই সহানুভূতিবশতঃ প্রতিক্রিয়া দেখায় বেশি। বড় বড় পাতাওয়ালা লতানে গাছ এসব ক্ষেত্রে খুব ভালো অ্যান্টেনার কাজ করতে পারে। আপনি তো জানেন স্যার, আমার বাড়িতে একটা ছোট্ট বাগান আছে। সেখানে লতানে লাউ গাছের পাতাই আমাকে দেবদারুর গাছের বিপদের কথা প্রথম জানিয়ে দেয়।'

অশোক বিদায় নিয়ে চলে গেলো। এই প্রথম আমি তার নামটা ভালো করে খতিয়ে দেখলাম ঃ অশোক পত্রনবীশ। শব্দ দুটো যেন গাছের সঙ্গে তার ঘন আত্মীয়তার ইঙ্গিত দেয়।



১৯১৪ সালের বিশ্বপর্যটন শেষে ফেরার পর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য অর্থসংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা ও নানা অফুরন্ত কাজে আমরা জগদীশচন্দ্রকে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে অতিরিক্ত ব্যস্ততায় কি মহাবিজ্ঞানীর গবেষণা সাময়িক রুদ্ধ হয়েছিল? ভাবলে অবাক হতে হয় ১৯১৮ সালের শেষে বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম মুখপত্র **Transactions of the Bose Research Institute** প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল, তাতে মোট একুশটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

এই কাজের একটিতে রয়েছে বিস্ময়কর এক আবিস্কার ও তাঁর বর্ণনা Magnetic Crescograph। অন্যটি জগদীশচন্দ্রের কাজের একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংযোজন।

ফরিদপুরের (অধুনা বাংলাদেশ) "উপাসনারত খেজুর" গাছ। গাছটি লম্বায় ৫ মিটার ও চওড়ায় ২৫ সেঃ মিঃ। খুব সম্ভবত ঝড়ে মাটির সঙ্গে ৬০ ডিগ্রি কৌণিকভাবে গাছটি দাঁড়িয়ে ছিল। ঘটনাচক্রে গাছটির অবস্থান ছিল একটি মন্দির প্রাঙ্গণে। সন্ধ্যায় নিয়মিত মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির সাথে দেখা যেত গাছটি ক্রমশ মাটির দিকে নীচু হতে শুরু করেছে। যেন নতমস্তকে মন্দিরের বিগ্রহকে প্রণাম জানাচ্ছে। আবার ভোরে দেখা যেত গাছটি আগের

অবস্থায় ফিরে গেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বহুলোক ব্যাপারটি দেখতে আসতেন। কেউবা আসতেন কৌতূহলী হয়ে। আবার অনেকে আসতেন পূজোর উপাচার নিয়ে, দেবমাহাত্ম্যকে শ্রদ্ধা জানাতে ও মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর আরোগ্য কামনা করতে। এতে তাঁদের মনস্কাম কতটা সফল হতো জানা নেই, তবে মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক পুরোহিতের আয় মন্দ হতো না। জনরবে 'ধার্মিক' গাছটির খ্যাতি যখন খ্যাতির উচ্চ শিখরে, ভীড় সামলান শ্রমসাধ্য ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে তখন ঘটনাটি জগদীশচন্দ্রের গোচরে এলো। তিনি এই অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ণয়ে এগিয়ে এলেন। অনেক চেষ্টার পর জগদীশচন্দ্র মন্দিরের মালিককে এ ব্যাপারে রাজী করতে সক্ষম হলেন। তবে গাছটির এই অদ্ভুত আচরণের বৈজ্ঞানিক কারণ প্রমাণের আগে তাঁকে প্রমাণ করতে হলো, এই গবেষণার যন্ত্র ও যন্ত্রী কেউ "ম্লেচ্ছ" নয়। আর তাছাড়া যাকে দিয়ে যন্ত্রটি "ধার্মিক" গাছটির সঙ্গে লাগানো হবে তিনি একজন ব্রাহ্মণ সন্তান।

পরীক্ষায় অনেক অজানা তথ্য জানা গেল। বেরিয়ে এলো এক আশ্চর্য তথ্য। জগদীশচন্দ্র বললেন, গাছটি কোন সময়েই "নিশ্চল" হয়ে নেই। হয় নীচু হচ্ছে না হয়ত উঁচু হচ্ছে। সর্বোচ্চ উচ্চতার সময় সকাল সাতটা। তারপর গাছটি ক্রমশ ধীরে ধীরে নীচু হতে থাকে। বিকেল ৩-১৫ মিনিটে সবচেয়ে নীচু হয়। তারপর আবার ধীরে ধীরে উঁচু হতে থাকে। জগদীশচন্দ্র এই বিচিত্র ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে নানা পরীক্ষা শুরু করলেন। এই অনুসন্ধানের প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে তিনি খেঁজুর গাছটির এই উত্থান পতন বা চলন অন্য গাছেও হয় কিনা খুঁজে দেখলেন। দেখা গেল ফরিদপুর থেকে দু'শো মাইল দূরে হাওড়া জেলার সিজবেড়িয়া গ্রামের একটি খেঁজুর গাছেও ঠিক এই ধরনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু কাছাকাছি কোন মন্দির না থাকায় এর দেবমাহাত্ম্য প্রচার হয়নি। জগদীশচন্দ্র বুঝলেন ফরিদপুরের খেঁজুর গাছটির ঘটনা অনন্য নয়। উপলব্ধি করলেন গাছের এই প্রাত্যহিক চলন পরিবেশের কোন কিছুর নিয়মিত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বেশ কিছু পরীক্ষার পর তিনি বললেন, এই নিয়মিত পরিবর্তনটির কারণ হলো পরিবেশে তাপের নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধি। ক্রমবর্দ্ধমান তাপের সঙ্গে সমতা রেখে

গাছটি নীচু হতে থাকে ও তাপমাত্রা কমতে থাকলে গাছটির মাথাও আস্তে আস্তে উঁচু হতে থাকে। তিনি বললেন, গাছের এই চলন গাছটির শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার উপর তাপের প্রভাবের ফল। গাছের মূল মাটির নীচে চলে (**positively geotropic**), কাণ্ড আকাশের দিকে যায় (**negatively geotropic**)। গাছটি ছিল বেশ হেলানো। তাই নিয়ম অনুসারে গাছটি তার মাথাকে অর্থাৎ কাণ্ডের অগ্রভাগকে ক্রমাগত উঁচু করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিবেশের তাপবৃদ্ধি গাছের কাণ্ডের মাথা উঁচু করার প্রবণতাকে বাধা দেয়। ফলে গাছের মাথা নীচু হয়। উদ্ভিদের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র আরও বেশ কিছু গবেষণা করেছিলেন। তারমধ্যে দুটি গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম গবেষণাটি ফুল ও গাছের বৃদ্ধি সংক্রান্ত। অন্যটি সমাজের আর একটি কুসংস্কার দূরীকরণের প্রশ্নে।

শাপলাফুল রাত্রে ফোটে। দিনে ফোটে না। "কুমুদিনীর এই নিশি-জাগরণের" কারণ সম্পর্কে তখনকার বিজ্ঞানীদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁদের ধারণা সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের মন্তব্য বড় কৌতূহলোদ্দীপক। জগদীশচন্দ্র এক ভাষণে কৌতূক করে বলেছিলেন, উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণ সম্বন্ধে গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকে মনে করেন যে ঘুমান বা জাগা উদ্ভিদের সম্পূর্ণ খেয়ালমাত্র।

কুমুদ রাত্রে ফোটে এবং দিনে বন্ধ হয়—কারণ সে এইরূপই করিয়া থাকে; আর পদ্ম দিনে ফোটে রাত্রে মুদিয়া যায়, কারণ পদ্ম এ বিষয়ে কুমুদের ঠিক উল্টা করে। একবার এক প্রশ্ন উঠিয়াছিল—

তিলঞ্চ সরিষা চৈব উভয়ে তৈলদায়িকে।
তর্পনে তিল দরকারং সরিষা নাস্তি কি কারণে॥

তাহার উত্তর আসিয়াছিল—

ঢাকঞ্চ ঢোলকঞ্চৈব উভয়ে বাদ্যদায়িকে।
গাজনে ঢাক দরকারং ঢোল নাস্তি যে কারণে॥

কুমুদ ও পদ্মের ফোটা না-ফোটা সম্বন্ধে অনেকটা এই রকমের কৈফিৎ মিলিত। এই ফুল ফোটার কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্নে প্রথমেই একটি চিন্তা জগদীশচন্দ্রের মনে এসেছিল। শাপলার এই পাপড়ি খোলা ও বন্ধ হওয়া

পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে ঘটছে কিনা ? স্বাভাবিকভাবে ফোটা ফুলের পাপড়িগুলো যদি ওপরের দিকে যায় তবে ফুলটি বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি নীচের দিকে নামে তবে ফুলটি আরও প্রস্ফুটিত হবে। মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় যদি ফুলের ফোটা নির্ভর করে তবে ফুলটির মাথা নীচের দিকে রাখলেই বিপরীতক্রিয়া দেখা যাবে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, শাপলাফুল সোজাভাবেই থাক আর উল্টোভাবেই থাক তাতে ফুল ফোটার সময়ের কোন হেরফের হয় না। অন্য আর একটি পরীক্ষায় দেখলেন, আলোর ক্রিয়ার ওপরও ফুলফোটা নির্ভর করে না। এবার জগদীশচন্দ্র তাঁর **Diurnal phytogragh** যন্ত্রকে এই পরীক্ষার উপযোগী করে শাপলাফুলের পাপড়ির ধারাবাহিক লিপিচিত্র নিলেন। সেই সাথে একই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধারাবাহিক তাপমাত্রা পরিবর্ত্তনের লিপিও। দেখা গেল শাপলা ফুলের ফোটা ও বন্ধ হওয়া একমাত্র তাপের প্রভাবেই হয়। পরীক্ষায় প্রমাণ করে দেখালেন, দিনের বেলায় যদি শাপলাফুলের কুঁড়ির চারদিকে রাত্রের তাপমাত্রা বজায় রাখা যায় তবে দিনেও শাপলাফুল ফুটতে পারে। এই গবেষণার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, একখণ্ড লৌহকে সমলম্ব একখণ্ড তাম্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া উভয়কে উত্তাপ দিতে আরম্ভ করা হইল ; তাপে উভয়েই বাড়িবে, কিন্তু সমতাপে তাম্র সমলম্ব লৌহ অপেক্ষা অধিক বাড়ে। অথচ প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক বাড়িবার জো নাই বলিয়া ফলে সমস্তটি ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যাইবে, যেটি বেশী বাড়ে সেইটি থাকিবে বাহিরে, যেটি কম বাড়ে সেইটি থাকিবে ভিতরে। সেইরূপ গাছের একদিক যদি আর একদিক অপেক্ষা বেশী বাড়ে তবে গাছটি বাঁকিতে থাকিবে, পাতার একদিক আর দিকের অপেক্ষা বাড়িলে পাতাটি ধনুকের মত হইবে।

বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্যের সহিত গাছের বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে কি-না দেখিবার জন্য নবনির্মিত "ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ" যাহা অত্যধিক শক্তিশালী "অনুবীক্ষণের দৃষ্টির" অতীত গাছের বৃদ্ধিকে কোটিগুণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া চোখের সন্মুখে ধরে, সেই ক্রেস্কোগ্রাফে একটি গাছ বসান হইল ; গাছ তাহার সাধারণ অবস্থায় বাড়িতে লাগিল। ঠাণ্ডা বরফজল চারদিকে দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে উহার বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এইবার

বরফজল ফেলিয়া গরমজল দেওয়া হইল। গাছ তাহার সহজ অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল।

বাহিরের উত্তাপে কুমুদের পাপড়িও বাড়িতে থাকিবে, কিন্তু এই পাপড়ির বাহিরের সবুজ দিক্‌টা ভিতরের সাদা দিকটা অপেক্ষা বেশী কমণীয়। সুতরাং বাহিরটা ভিতর অপেক্ষা বেশী বাড়িবে, ফলে সমস্ত পাপড়িটা ধনুকের আকার লইবে—সবুজ দিকটা থাকিবে বাহিরে, সাদা দিকটা থাকিবে ভিতরে। সুতরাং ফুলটি একেবারে মুদিয়া যাইবে। দিনে ফোটে এইরূপ একটি ফুল লওয়া হইল, দেখা গেল পাপড়ির ভিতরটা উহার বাহির অপেক্ষা অধিক কোমল, সুতরাং এক্ষেত্রেও পাপড়িটি বাঁকিবে। তবে এবার উহা উল্টাদিকে বাঁকিবে। ফলে বাহিরের উত্তাপের প্রভাবে উহা আরও খুলিয়া যাইবে। সুতরাং একই উত্তেজনা যে ভিন্নজাতীয় পুষ্পকে বিভিন্নরূপ প্রদান করে তাহা কেবলমাত্র তাঁহাদের আভ্যন্তরিক গঠন বৈচিত্র্যের ফলে।

এ পর্যায়ের অন্য গবেষণাটি হল একটি আম গাছকে নিয়ে। গাছটির অবস্থিতি ছিল কলকাতার কাছেই। খবর এলো আম গাছটির একটি ডাল থেকে ক্রমাগত ফোঁটা ফোঁটা জল নীচে পড়ছে। শুধু দিনের বেলায়, রাত্রে নয়। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত। তাঁদের ধারণা ঘটনাটি গ্রামের পক্ষে অমঙ্গল- সূচক। যেহেতু এই "কাঁদুনে আমগাছটি" গ্রামের অধিবাসীদের কাছে অমঙ্গল-সূচক তাই এ গবেষণায় জগদীশচন্দ্রকে কোন সামাজিক বাধার সামনে পড়তে হলো না। তিনি বেশ কিছু পরীক্ষার পর বললেন, গাছটির ডালের ভেতরের খানিকটা অংশ কোন কারণে পচে গিয়েছে। পচা জায়গাটিতে গাছের ক্ষরিত রস জমা হয়ে বাকলের কোন সরু ফুটো দিয়ে রস ফোঁটা ফোঁটা নীচে পড়ছে। এতে গ্রামবাসীর আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। এই রস শুধু দিনে বেরুবার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, দুপুরের উত্তাপে গাছটির বাকলের সজীব কোষের সক্রিয়তা বেড়ে যায় ও তাদের পার্শ্বচাপে বেশী পরিমাণ রস পচা জায়গাটিতে জমা হয়। সেই রস উপচে নীচে পড়ে। ক্রমশঃ পড়ন্ত বিকেলে তাপমাত্রা কমলে এই রস উপচে পড়া বন্ধ হয়।

'কাঁদুনে আমগাছের' এই বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রামবাসীদের আতঙ্ক দূর করেছিল একথা বলাই বাহুল্য।



রিলেটিভিটির আশ্চর্য দুনিয়ায়

পার্থসারথি চক্রবর্তী

নিকুঞ্জবিহারী ব্যাঙ্কের জরুরী কাজগুলো সেরে ফেলতে লাগলেন। সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছে, লোকজন তো বটেই এমন কি কর্মচারীদের অনেকেই চলে গিয়েছেন। বড় হলঘরটা প্রায় ফাঁকা, কেবল দারোয়ানের পোষা সাদা বেড়ালটা জিব দিয়ে গা চেটে পরিষ্কার করছে—আর মাঝে মাঝে আলমারীর নিচের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। নিকুঞ্জবিহারী তাড়াতাড়ি ফাইলগুলো সই করে বড়বাবুর টেবিলে রেখে দিয়ে সায়েন্স কলেজের দিকে পা বাড়ালেন—ছটার মধ্যে তাঁকে সেখানে পৌঁছাতে হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সায়েন্স কলেজে ঢুকেই নিকুঞ্জবিহারী শুনলেন —প্রফেসর হঠাৎ কি একটা জরুরী কাজে আজ ভিয়েনায় চলে যাচ্ছেন। কাজেই এ মাসে তিনি আর কোনও লেকচার দেবেন না। তবে সায়েন্স কলেজ থেকে কতকগুলো কাগজ তার হাতে দেওয়া হল—প্রফেসরের লেকচারের ফটোকপি, একটা প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে।

নিকুঞ্জবিহারী বাড়ি ফিরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে প্রফেসরের ঐ কাগজ খুলে বসলেন।

কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিকুঞ্জবিহারী ত' অবাক! ও হরি, এতে

রয়েছে এমন কতকগুলো বড় বড় ফর্মুলা আর ইকুয়েশন যা কস্মিনকালেও তাঁর মাথায় ঢুকবে না, অঙ্কে উনি বরাবরই একটু কাঁচা যে। অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করে তিনি বুঝলেন—প্রফেসর রিলেটিভিটি থিয়োরী বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এতে। ফর্মুলার ব্যাপারটা না বুঝলেও ওঁর মনে হল যে ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র আলোর গতিই যে সব চাইতে বেশী, এটাই তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। দুনিয়ার কোনও গতিশীল বস্তুরই আলোর গতিকে ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমতা নেই ; আর তার ফলেই ঘটছে যত অস্বাভাবিক এবং অদ্ভুত সব ঘটনা। রিলেটিভিটির ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে হলে এই আলোর গতিবিধি আগে ভালো করে জানতে হবে। আলোর গতি এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বা তিন লক্ষ কিলোমিটার,—কাজেই রিলেটিভিটির প্রতিক্রিয়া দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনায় ধরা পড়ে না। নিকুঞ্জবিহারী বুঝলেন রিলেটিভিটির মতো অস্বাভাবিক ঘটনা মগজে ঢোকানো বড় সহজ কাজ নয়। তাছাড়া রিলেটিভিটির ঘটনা কমনসেন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

নিকুঞ্জবিহারী ভাবলেন ঘড়ির পেণ্ডুলামটা যদি কোনও কারণে আলোর গতি পেয়ে ধাঁ করে ছুটতে পারত তাহলে সময়ের হিসেবটাই বা কিরকম হতো ? অথবা যদি এমন হতো যে আলোর গতি কোনও কারণে হঠাৎ কমে গিয়ে ঘণ্টায় ছুটত দশ মাইল বেগে তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াত ? এমন ঘটনা কখনও ঘটতে পারে না—তবে যদি কখনও ঘটে তাহলে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার অনুভূতিই বা কেমন হবে ? এই সব সাত-পাঁচ আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে নিকুঞ্জবিহারীর চোখ দুটো হঠাৎ কাগজের একটা ফর্মুলায় পড়ে থমকে গেল। তারপর চোখের পাতা দুটো আস্তে আস্তে বুজে এল।

* * *

নিকুঞ্জবিহারী চোখ মেলে দেখলেন তিনি একটা খুব চমৎকার শহরের ঝকঝকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁর মনে হল স্বপ্ন দেখছেন বুঝি—কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে যেসব তাজ্জব ঘটনা ঘটে সেসবের কিছুই তার নজরে এল না। রাস্তার এক পাশে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল—তাকে ঠিক পুলিশের মতোই দেখাচ্ছিল, মাথায় টুপি, কোমরে বেল্ট আর পুলিশেরই ইউনিফর্ম পরা।

টাওয়ারের বড় ঘড়িটার কাঁটা তুটো তুপুর বারোটায় রয়েছে, আর ঠিক সেই সময় ঢং ঢং করে তুপুর বারোটাই বাজল। রাস্তাঘাট ফাঁকা, লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে।

নিকুঞ্জবিহারী দেখলেন সাইকেলে চড়ে একজন আরোহী মৃত্নমন্দ গতিতে এগিয়ে আসছে। আরোহীটি যতই এগিয়ে আসতে থাকল নিকুঞ্জবিহারীর চোখ ততই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। কারণ ঐ সাইকেল এবং তার আরোহীকে তাদের গতিপথে এমন অদ্ভুত রকম চ্যাপ্টা দেখাচ্ছে যে তিনি তাঁর নিজের চোখ তুটোকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কনভেক্স লেন্সের ভিতর দিয়ে কাউকে দেখলে তাকে যেমন মজার মতো লাগে দেখতে অনেকটা সেই রকম আর কি। আরোহী প্যাডেল চালাতে লাগলেন খুব জোর কদমে কিন্তু তিনি যে খুব স্পীডের মাথায় চলছেন তা নিকুঞ্জবিহারীর মনে হল না। আর কি আশ্চর্য, যতই তিনি জোরে প্যাডেল চালাতে থাকলেন ততই তাকে বেজায় চ্যাপ্টা দেখাতে থাকল, কার্ডবোর্ড কেটে ছবি আঁকলে যেমন দেখায় ঠিক সেই রকম। নিকুঞ্জবিহারী বেজায় ধাঁধায় পড়ে গেলেন।

হঠাৎ নিকুঞ্জবিহারীর প্রফেসরের রিলেটিভিটি থিয়োরীর কথা মনে পড়ল। যদিও তিনি থিয়োরীর সবটা ভালো করে বুঝতে পারেন নি—তথাপি যেটুকু আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, তাতে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এই ঘটনাকে বলা চলে 'চলন্ত বস্তুর সংকোচন' বা কনট্রাকসন অব্ মুভিং বডিস। নিকুঞ্জবিহারী এই কথাটা ভেবে খুব গর্ববোধ করলেন, হুঁ হুঁ, রিলেটিভিটির সামান্য অংশটুকু বোঝবার মধ্যেও কেরামতি আছে বৈকি!

এবার একটা ট্যাক্সি এগিয়ে আসছে। এত মন্থর, শামুকের মতো গতি এই ট্যাক্সির যে ওঁর মনে হল হয়ত সাইকেল আরোহী এর চাইতে জোরে এগিয়ে গিয়েছেন।

নিকুঞ্জবিহারী অ্যাডভেঞ্চার করতে খুব যে একটা ভালবাসেন এমন নয়। কিন্তু আজ কি যেন ওঁর মনে হল ঐ সাইকেল আরোহীকে তিনি টেক্কা দিয়ে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন। একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা সাইকেল চেয়ে তিনি জোর স্পীডে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ওঁর মনে হল এক্ষুনি হয়ত তিনিও চ্যাপ্টা হয়ে যাবেন—আর হলেই বা মন্দ কি, কারণ বেশ

কিছুদিন ধরে তিনি তাঁর ক্রমবর্ধমান স্ফীত দেহ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু কৈ, কিছুই হলো না তো! বরং তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন—তাঁর চারপাশের ছবিগুলো কেমন বদলে যাচ্ছে, রাস্তাগুলো ক্রমশ ছোট হচ্ছে। রাস্তার তু'পাশের দোকানের দরজা-জানালাগুলোকে মনে হচ্ছে খুব ছোট্ট ফুটো ছাড়া আর কিছুই নয়। আর অবাক কাণ্ড, রাস্তার পাশে সেই দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশম্যানটাকে এত মোটা দেখাতে লাগল যে নিকুঞ্জবিহারী তাঁর জীবনে এত মোটা মানুষ কখনও দেখেছেন বলে মনে পড়ল না।

সত্যিই তো, এইখানেই আসল 'রিলেটিভিটি' শব্দটা আসছে। আমার সাপেক্ষে অন্য যে বস্তুই ছুটে চলেছে সেটা আমার কাছে ছোট দেখাচ্ছে, তা সে প্যাডেল যেই চালাক না কেন! নিকুঞ্জবিহারী একসময় ভালো সাইকেল চালাতে পারতেন বলে সুনাম ছিল। সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি তুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, ওঁর পায়ে ব্যথা ধরে গেল, মনে হ'ল উনি কিছুতেই সামনের আরোহীকে ধরতে পারবেন না। যাই হোক, আরও বেশ কিছুক্ষণ কাটবার পর তিনি ওঁকে দেখতে পেয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলেন। ঠিক যে মুহূর্তে তিনি এবং ঐ সাইকেল আরোহী পাশাপাশি সাইকেল চালাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে কিন্তু আবার যথারীতি একজন সাধারণ যুবক বলেই বোধ হল। নিকুঞ্জবিহারী ভাবলেন—এটা ঘটছে এইজন্যে যেহেতু আমরা তুজন পরস্পরের সাপেক্ষে এগুচ্ছি না। ঠিক এই সময় ওঁর রবার্ট ব্রাউনিং-এর Last ride together কবিতাটির কথা মনে পড়ল। তিনি ভাবলেন, সম্ভবত ওই কবিতাটির সঙ্গে এখনকার অবস্থার একমাত্র তুলনা দেওয়া চলে।

যাই হোক নিকুঞ্জবিহারী সাইকেল আরোহীটির সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে বাতচিত শুরু করে দিলেন।

—'মাপ করবেন, আপনার এই রকম একটা বিচ্ছিরি শহরে—অর্থাৎ যেখানে এত কম স্পীডে গাড়ী চালাতে হয় সেখানে থাকতে অসুবিধা হয় না?'

—'এখানে কম স্পীডে গাড়ী চালাচ্ছি? বলছেন কি মশায়',—ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'আমাদের এখানে কোনও স্পীড লিমিট নেই, যে যত খুশি জোরে গাড়ী চালাতে পারে—যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। আমি

তো কদিন থেকে ভাবছি এই ঝরঝরে পুরোনো সাইকেলটা বেচে দিয়ে একটা বেশ ভালো মোটর সাইকেল কিনি।'

—'কিন্তু আপনি যে অসম্ভব রকম স্লো-স্পীডে গাড়ী চালাচ্ছিলেন, আমি বিশেষভাবে আপনাকে লক্ষ্য করে তবেই এই কথা বলছি—', উত্তর দিলেন নিকুঞ্জবিহারী।

—'তাই নাকি?' সাইকেল আরোহীটি কৌতুক বোধ করলেন, সেই সঙ্গে তার আঁতে ঘা-ও লাগল খানিকটা।

—'আপনি বোধ হয় খেয়াল করেন নি যে আমাকে সম্বোধন করে ডাকার পর থেকে আমরা প্রায় পাঁচটা ব্লক পার হয়ে এসেছি। আপনার কাছে কি এই স্পীড যথেষ্ট নয়?'—জিজ্ঞাসা করলেন সাইকেল আরোহী।

আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন নিকুঞ্জবিহারী—'রাস্তাগুলো যে বেজায় সরু দেখাচ্ছে।'

—'তাতে কিছু এসে যায় বলে ত' বোধ হয় না',—উত্তর দিলেন আরোহী, 'আমরা দ্রুতই এগিয়ে যাই, অথবা রাস্তাগুলো সরু দেখাক, আসলে আমাকে দশটা ব্লক পার হয়ে পোস্ট অফিসে যেতে হবে। আর যদি আমি প্যাডেল জোরে ঘোরাই তাহলে ত' আর কথা নেই, আমি তাড়াতাড়ি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারব। আরে সত্যিই তো, এ যে দেখছি আমরা কাজের জায়গায় একেবারে যথারীতি পৌঁছে গেছি!'

নিকুঞ্জবিহারী পোষ্ট অফিসের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সাড়ে বারোটা বাজে।

—'আচ্ছা, তা হলে তো আপনার দশটা ব্লক পেরোতে পাক্কা আধ ঘন্টা সময় লেগেছে, নয় কি, কারণ প্রথম যখন আপনাকে আমি দেখি তখন ঠিক বেলা বারোটা বেজেছিল', বললেন নিকুঞ্জবিহারী।

—'এই আধ ঘন্টা সময় কি আপনি ভালভাবে লক্ষ্য করেছেন?' পরিহাস ভরে জিজ্ঞাসা করলেন ওঁকে সাইকেল আরোহী।

নিকুঞ্জবিহারী সাধাসিধে মানুষ। তিনি ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন—যে তাঁর মনে হচ্ছে মাত্র কয়েক মিনিট পার হয়েছে, আধ ঘন্টা নয়। তিনি তাঁর রিস্টওয়াচের দিকে নজর দিয়েও দেখলেন তাতে বারোটা বেজে মাত্র কয়েক

মিনিট হয়েছে। নিকুঞ্জবিহারী মনে মনে বিড়বিড় করে বললেন, 'তাহলে কি পোস্ট অফিসের ঘড়িটা খুব ফাস্ট চলছে ?'

—'নিশ্চয়ই তাই, নয়ত আপনার রিস্টওয়াচ স্লো চলছে, যেহেতু আপনি খুব তাড়াতাড়ি চলেছেন। সে যাই হোক, আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো মশায়, আপনি কি অন্য কোনও গ্রহ বা হঠাৎ চাঁদ থেকে লাফ দিয়ে পৃথিবীতে পড়েছেন ?' এই কথাগুলো হড়বড় করে বলে সাইকেল আরোহী এক লাফে পোস্ট অফিসের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন।

এই সব কথোপকথনের সময় নিকুঞ্জবিহারী নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে বোধ হতে লাগল। তিনি ভাবলেন ঠিক এই সময় কাছে দাড়ি-ওয়ালা প্রফেসর থাকলে ভালো হতো, সমস্ত ব্যাপারটা তিনি জলবৎ তরলং করে বুঝিয়ে দিতেন।

কিছুক্ষণ বাদেই সে সুযোগটা এসে গেল। একজন ভদ্রলোক বয়স পঞ্চাশের কিছুটা নিচেই হবে, ট্রেন থেকে স্যুটকেশ হাতে নামলেন। ভদ্রলোক স্টেশনের Exit দিয়ে বেরুতে যাবেন এমন সময় একজন বুড়ী ভদ্রমহিলা কচি-খুকীর মতো ভদ্রলোকের কাছে এসে বলল—'দাদু, কেমন আছ, ট্রেনে আসতে কোনও কষ্ট হয় নি তো ?'

এবার নিকুঞ্জবিহারীর অবাক হবার পালা। তিনি আর নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে সোজাসুজি ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'মাফ করবেন, এই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কি সত্যিই আপনার নাতনী ? যদিও এটা আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার, তবু সত্যি কথা বলতে কি এমন ধারা অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার কস্মিনকালেও দেখিনি, তাই বাধ্য হয়ে আপনাকে কথাটা জিজ্ঞেস করছি।'

ভদ্রলোক বেশ মেজাজী। গোঁফে তা দিতে দিতে বললেন—'ব্যাপারটা আপনার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকলেও নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। ইনি সত্যই আমার একমাত্র আদুরে নাতনী। আমাকে ব্যবসার জন্যে প্রায় সব সময়েই ট্রেনে করে ঘুরে বেড়াতে হয়। কাজেই আমার বয়স, এই নাতনী যে শহরে বাস করে তার তুলনায় খুব কম বাড়ে।'

নিকুঞ্জবিহারী আবার গোলমেলে ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলেন। এ আবার কোন্ ধরনের আদিখ্যেতা ! পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়সের লোকের

নাতনী হল গিয়ে আশি বছরের বুড়ী ? এ কি অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের মজার দেশে এসে পড়লাম নাকি ?

নিকুঞ্জবিহারীর মাথায় এখন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তিনি রেস্টুরেণ্ট থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন। প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আবার ঢুকে দেখলেন—লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু একজন লোক রেলওয়ের ইউনিফর্ম পরে ওয়েটিং রুমের একপাশে চুপচাপ বসে রয়েছে।

—'আজ্ঞে, আপনি আমায় কি একটু আলোকপাত করে সাহায্য করবেন, আমি বড়ই মুশকিলে পড়েছি—'

—'আমার নাম 'মুস্কিল আসান' নয়; তবে আপনার সমস্যার কথাটা বলতে পারেন, একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'—উত্তর দিলেন তিনি।

—'আজ্ঞে, শহরের লোকের চাইতে ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের বয়স ধীরে ধীরে বাড়ার কারণ কি যদি দয়া করে বলেন—'

—'আমিই এই ঘটনার জন্য দায়ী'—নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিলেন কর্মচারীটি।

নিকুঞ্জবিহারীর মনে হল ইনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিখ্যাত লোক, এবং সকল জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

—'আজ্ঞে আপনি কি এখানকার মেডিকেল বোর্ডের চেয়ারম্যান ?'—জিজ্ঞাসা করলেন নিকুঞ্জবিহারী।

—'মোটেই না, আমি এখানকার রেলের একজন সামান্য ব্রেকম্যান।'

—'আপনি রেলের ব্রেকম্যান, মানে, ট্রেন স্টেশনে এলে আপনার কাজ হচ্ছে ব্রেক কষে ট্রেন থামানো ?'

—'হ্যাঁ, এই কাজটিই আমাকে করতে হয়, এবং আমি প্রত্যেকবার ট্রেন স্লো করলে ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের রিলেটিভ বয়স বেড়ে যায় অন্যদের চাইতে।'

—'কিন্তু সে না হয় হল, তাতে একজন লোক বুড়ো না হয়ে কচি থাকবে এ আবার কেমন কথা ?'—জিজ্ঞাসা করলেন নিকুঞ্জবিহারী।

—'সেটা আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না, আমি যখন একজন ইউনিভার্সিটির দাড়িওয়ালা প্রফেসরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম—তিনি এমন একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে যে আমি তার

মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে—মাঝে মাঝে তাঁকে **Red-shift** বা লাল সরণ এই শব্দটা ব্যবহার করতে দেখেছি। আপনি কি **Red-shift** সম্বন্ধে কিছু জানেন ?'

—'না না, আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না', উত্তর দিলেন নিকুঞ্জবিহারী।

এমন সময় একজন লোক এসে ওঁর সামনে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট মেলে ধরে ওটা ভাঙিয়ে দিতে বলল। নিকুঞ্জবিহারীর মনে হল এই মুখটা তার বহুদিনের চেনা।

—'এত দেরি হচ্ছে কেন সামান্য পঞ্চাশ টাকা ভাঙিয়ে দিতে ? আপনার হয়েছে কি ?'

নিকুঞ্জবিহারী চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন ওই লোকের মুখটা আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছে। এইবার তিনি স্পষ্ট দেখলেন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ প্রফেসর তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিকুঞ্জবিহারীর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না, তিনি মাথা নিচু করে প্রফেসরকে পঞ্চাশ টাকার নোটটা ভাঙিয়ে দিলেন।

নিকুঞ্জবিহারী তার ঘুমের মধ্যে বারবার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের গোমড়া মুখটা দেখতে পাচ্ছেন। আসলে নিকুঞ্জবিহারী কোয়ান্টাম থিয়োরীর 'অনিশ্চয়তার নিয়ম'-এর ব্যাপারটা ব্যাঙ্কে ঢোকাতে গিয়েই হল যত বিপত্তি! ম্যানেজার সাহেব তো একেবারে রেগে টং। নিকুঞ্জবিহারীকে সাফ কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে ব্যাঙ্কের কাস্টমারদের নিয়ে ওসব রিলেটিভিটির কায়দা দেখানো চলবে না।

নিকুঞ্জবিহারী ভাবলেন কিছুদিনের ছুটি নিয়ে মেজাজটা একটু হাল্কা করে আসবেন। ব্যাংকে ছুটির দরখাস্ত দিতেই ম্যানেজার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করে দিলেন। নিকুঞ্জবিহারী মনে মনে ভাবলেন—ম্যানেজার সাহেব হয়ত এইবার রিলেটিভিটির আসল ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। যাই হোক, বেড়িয়ে ফিরে এসে ওকে 'অনিশ্চয়তার নিয়মটা' ভালো করে শেখাতে হবে। তাহলে শেষ পর্যন্ত ব্যাংকে ওটা হয়ত বা চালু করা সম্ভব হবে।

তিনি ঠিক করলেন শিলং যাবেন।

নির্দিষ্ট দিনে শেয়ালদায় যথারীতি গিয়ে ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে উঠে

নিকুঞ্জবিহারী ত' অবাক। দাড়িওয়ালা প্রফেসর ওই কম্পার্টমেণ্টে বসে রয়েছেন।

—'নমস্কার অপনিও কি এই ট্রেনে গৌহাটি চললেন নাকি?' জিজ্ঞাসা করলেন নিকুঞ্জবিহারী।

—'হ্যাঁ, তবে ওখান থেকে শিলং যাবার ইচ্ছে আছে; কিন্তু তুমি চললে কোথায়?'

—'আজ্ঞে আমিও তো শিলং-এর দিকেই যাচ্ছি।'

—'তাহলে তো ভালই হলো। একসঙ্গে শিলং পর্যন্ত যাওয়া যাবে—' উত্তর দিলেন প্রফেসর।

নিকুঞ্জবিহারী দেখলেন প্রফেসরকে এত হাতের কাছে পাওয়া গিয়েছে যখন তখন ঐ ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় বয়সটা কি করে কমে যায় সেটা জেনে নিতে হবে। একটু আমতা আমতা করার পর উনি শুরু করলেন—'আচ্ছা, ট্রেনের একজন ব্রেকম্যান আমাকে একটা অদ্ভুত কথা শুনিয়েছিল, কোনও লোক ট্রেনে চেপে বেড়াবার সময় তাঁর বয়স নাকি সেই শহরের লোকেদের চাইতে ম্যাজিকের মতো কমে যায়। ব্যাপারটা সত্যি কিনা তা একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

—'বিজ্ঞানের জগতে ম্যাজিক বলে কিছু নেই। প্রত্যেক ঘটনারই একটা কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। আর এমন ঘটনা রিলেটিভিটির জগতে সত্যিই ঘটতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রের সাহায্যেই এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। আইনস্টাইন Space এবং সময়ের পরিবর্তিত ধারণার সাহায্যে দেখিয়েছেন—সমস্ত ভৌতিক পদ্ধতিগুলো যে বিশেষ System-এ ওটা ঘটছে তার Velocity বদলে গেলে মন্থর হয়ে আসবে।

সাধারণ জগতে এসব ব্যাপার ঠাহর করা যায় না, কিন্তু আমাদের এখানে যেহেতু আলোর গতিবেগ খুব কম—তাই এখানে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। আচ্ছা একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক। ধর, তুমি একটা ডিম সেদ্ধ করতে চাও—কিন্তু সসপ্যানটাকে স্টোভের উপর স্থির করে না রেখে স্টোভের এদিক ওদিক ঘোরাতে থাক তাহলে দেখবে ডিমটা সেদ্ধ হতে তোমার পাঁচ মিনিট নয়—প্রায় ছ মিনিট লেগেছে। অর্থাৎ প্রায় এক

মিনিট সময় বেশি লেগেছে ঐ সসপ্যানের velocity বদলাবার জন্যে। ঠিক তেমনি আমাদের মনুষ্য দেহেও সমস্ত পদ্ধতিগুলো মন্থর হয়ে আসে যদি কেউ ট্রেনে চড়ে বেড়াতে যায়—যে ট্রেন আবার সর্বক্ষণ তার velocity-র পরিবর্তন করছে। এখানে ডিম যেন মানুষের দেহ আর সসপ্যান হচ্ছে ট্রেন। এই অবস্থায় আমরা খুব মন্থর গতিতে জীবনযাপন করি। বিজ্ঞানীরা এই অবস্থাকে ইংরেজীতে বলছেন —'in an non-uniformly moving system time flows more slowly, অর্থাৎ 'অসঙ্গতিপূর্ণ গতিশীল প্রণালীতে সময় আরও মন্থর হয়ে আসে।'

—'আজ্ঞে এই রকম ঘটনা কি বিজ্ঞানীরা চাক্ষুষ দেখেছেন ?'

—'নিশ্চয়ই দেখেছেন, তবে এই জন্যে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ লিফ্‌টে চড়ে উপরে উঠবার সময় আমাদের কেমন মনে হয় দেহটা কেমন ভারী ঠেকছে—আবার যখন লিফ্‌ট নীচের দিকে নামতে থাকে তখন মনে হয় দেহটা বেশ হালকা হয়ে গেছে। এখানে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র যেটা লিফ্‌টের গতির পরিবর্তনের হারের ফলে সৃষ্টি হয়েছে—সেটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে কখনও যোগ হচ্ছে আবার কখনও বা বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই জানি সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চাইতে অনেক অনেক বেশি। তাহলে মাধ্যাকর্ষণ বল খুব প্রবল হলে কি ব্যাপার-স্যাপার ঘটবে ? স্পষ্টতই সূর্যের রাজ্যে সমস্ত পদ্ধতিগুলোই মন্থর হয়ে আসবে। জ্যোতির্বিদরা এসব ঘটনা লক্ষ্য করেছেন।'

—'আজ্ঞে, এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে ওঁদের কি সূর্যের রাজ্যে ধাওয়া করবার প্রয়োজন হয় ?'

—'এটার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, সূর্যের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কত তা জান ? সূর্য থেকে যে আলো বেরিয়ে আসে তার কারণ হল বিভিন্ন পরমাণুর কম্পনের ফল। যদি সূর্যের রাজ্যে সব কিছু পদ্ধতিই (Process) মন্থর হয়ে আসে তবে সেখানকার পরমাণু কম্পনের বেগও মন্থর হয়ে আসবে। এবার সূর্যের সঙ্গে বিভিন্ন নক্ষত্রের বিকিরিত আলোর তুলনা করে আমরা এই তফাতটা ধরতে পারি। আচ্ছা, এই ছোট্ট স্টেশনটার নামটা যেন কি—'

ট্রেনটা তখন একটা ছোট্ট স্টেশনের নির্জন প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে ছুটছিল। প্ল্যাটফর্মে স্টেশনমাস্টার এবং একটা কুলি ছাড়া আর কেউ ছিল না। একটা ট্রলির উপর বসে খোশমেজাজে কুলিরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে খবরের কাগজে সিনেমার পাতা পড়ছিল। আর সেই রোমহর্ষক ঘটনাটা ঠিক তখনই ঘটল।

প্ল্যাটফর্মের স্টেশন মাস্টার হঠাৎ হাত-পা শূন্যে ছুঁড়ে গোঁ-গোঁ করতে করতে পড়ে গেলেন। নিকুঞ্জবিহারীর মনে হল নিশ্চয়ই কেউ ওঁকে গুলি করে মেরেছে—তবে ট্রেনের শব্দে তিনি তার আওয়াজ শুনতে পাননি।

প্রফেসর খুব তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ট্রেনের চেন ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান মারলেন। আস্তে আস্তে ট্রেনটা থেমে এল।

নিকুঞ্জবিহারী ও দাড়িওয়ালা প্রফেসর ট্রেন থেকে নেমে দেখলেন—কুলিটা স্টেশন মাস্টারের মৃত দেহটার দিকে এগিয়ে আসছে, আর উল্টোদিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে একজন রেলওয়ে পুলিশ।'

—'গুলি করেই খুন করা হয়েছে', উত্তর দিল রেলওয়ে পুলিশ। আর কি আশ্চর্য, তক্ষুনি কুলিটার ডান হাত চেপে ধরে পুলিশটা বলল—'খুনের অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।'

বেচারী কুলিটার মুখ তখন একেবারে শুকিয়ে এসেছে। সে বলল—'আজ্ঞে, বিশ্বাস করুন, আমি ওঁকে খুন করিনি। আমি এই ট্রলিটার উপর বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। সম্ভবত ট্রেন থেকে এই ভদ্রলোকেরা সেটা দেখে থাকবেন।'

—'কিন্তু ওঁরা তো গতিশীল ট্রেনের মধ্যে ছিলেন। কাজেই ওদের ও দেখার কোনও দামই নেই যেহেতু প্ল্যাটফর্ম থেকে সেই মুহূর্তে তাকে গুলি করতে দেখা যেতে পারে। তুমি কি জান যুগপত্তা (Simultaneousness) নির্ভর করে যেখান থেকে তুমি নিরীক্ষণ করছ সেই সিসটেমের উপর? আমার সঙ্গে চলে এস এক্ষুনি থানায়'—গম্ভীর স্বরে পুলিশম্যান বলে উঠল।

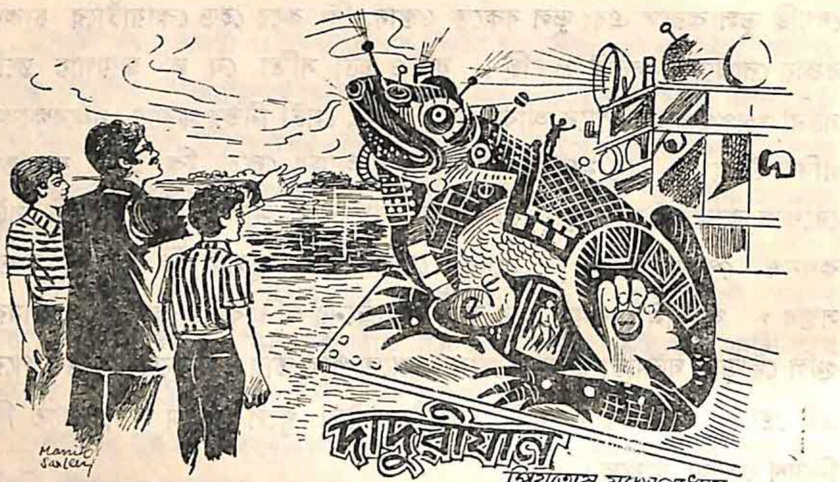
দাড়িওয়ালা প্রফেসর এতক্ষণ চুপ করে এদের কথোপকথন শুনছিলেন। এবার তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।—'মাফ করবেন, আপনি

দেখছি ভুল করতে এবং ভুল বকতে ওস্তাদ, কি করে হেড কোয়ার্টারে চাকরী বজায় রেখেছেন সেটাই ভাবছি। যদিও এটা সত্যি যে দু' জায়গায় দুটো ঘটনা যুগপৎ ঘটতে পারে আবার নাও পারে, সেটা নির্ভর করবে পর্যবেক্ষকের গতির উপর। কিন্তু মশাই, আপনার এই আজব দেশে কি কেউ ফলাফল দেখেছে কারণের আগে? টেলিগ্রাম পাঠাবার আগেই কি আপনি সেটা কখনও পেতে পারেন? মদের বোতল না খুলেই কি মাতাল হওয়া সম্ভব? আপনি নিশ্চয়ই মনে করেছেন ট্রেনের গতিবেগ থাকার জন্য আমরা গুলি ছোঁড়ার ঘটনাটা সেখান থেকে দেখতে পাব তার ফলাফলের অনেক পরে, এই তো? আপনার পকেটের ডায়েরীর বইটা খুলে দেখুন তো তাতে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

পুলিশম্যান প্রফেসরের ধমকানিতে হকচকিয়ে গিয়ে তার ডায়েরী খুলে কি যেন দেখল। তারপর বিড়বিড় করে ±cd বলতে বলতে মাথার টুপীটা খুলে প্রফেসরকে স্যালিউট জানিয়ে এবং কুলিটাকে নির্দোষ বলে চলে গেল।

নিকুঞ্জবিহারী এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ক্রমশ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন—কিছুই তাঁর মাথায় ঢুকছিল না। হঠাৎ কিসের শব্দে নিকুঞ্জবিহারীর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাকিয়ে দেখলেন বিছানায় শুয়ে রয়েছেন আর ঘরের বাইরে থেকে চাকর ক্রমাগত কলিং বেল বাজিয়ে চলেছে।





ডক্টর কয়াল পাতাল পরিক্রমা করবার পর (পাতাল পথে পরিভ্রমণের জন্য এক বিস্ময়কর যান উদ্ভাবনের ভিন্ন কাহিনী) ঠিক করলেন যানবাহন-জ্যামের ঝামেলা এড়িয়ে যাবার জন্যে ফ্রগশিপ তৈরি করবেন। ফ্রগশিপ শূন্য পথে উড়ে এক স্থান থেকে গন্তব্য স্থানে গিয়ে পড়বে, রাস্তার ঝামেলা পোহাতে হবে না।

ফ্রগশিপ তৈরি করে পরীক্ষা করবার জন্যে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে একটা স্থান নির্বাচন করেছিলেন তিনি। সরকার পরীক্ষা করবার জন্যে একটা মালবাহী জাহাজ ব্যবস্থা করেছেন। জাহাজটা মালবাহী তাই বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না, কারণ সাতদিন পরে ওকে পোর্টব্লেয়ারে যেতে হবে কাঠ, নারকেল লাদাই করবার জন্য।

নদীর মোহনায় ডায়মণ্ডহারবার থেকে বেশ দূরে একটা নিরিবিলি তট্ ডক্টর কয়াল ঠিক করে রেখেছেন। এখানে নদীর মুখ দেখলে নদী মনে হয় না, মনে হয় সমুদ্রে এলাম বুঝি। দূরে ওপারে অস্পষ্ট মেদিনীপুরের গ্রামগুলো কালচে ধোঁয়াটে গাছের সারির সঙ্গে একাকার হয়ে রয়েছে—চোখে পড়ে।

ডক্টর কয়ালের চোখে পড়ল এক পশলা বৃষ্টির পর রাস্তায় জায়গায় জায়গায় জল জমেছে ? ট্রাম থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন। সারি সারি ট্রাম পর পর দাঁড়িয়ে পড়েছে। যেন লম্বা একখানা ইলেক্ট্রিক ট্রেন। জলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ উঠতে মনে পড়ল ডায়মণ্ডহারবারের ওই তটের কথা—

ওখানে জলের শব্দ অবিরাম হয়ে চলেছে। জাহাজটা মোটামুটি সাজিয়ে ফেলেছেন ডক্টর কয়াল। জাহাজের খোলে সতের মিটার দীর্ঘ ষাট সেন্টিমিটার ব্যাসের একটা সিলিণ্ডার কামানের মত করে বসান হয়েছে। সিলিণ্ডারের ভেতরে পাঁচশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটারের একটা হাই স্পীড স্টিলের স্প্রিং বসানো হয়েছে, যেটার কার্যক্ষমতার ওপর ফ্রগশিপের ওড়া নির্ভর করছে। স্প্রিংটাকে চাপার ব্যবস্থা করা হয়েছে হাইড্রোলিক প্রেসার পিস্টন দিয়ে। পিস্টনটা সিলিণ্ডারের ভেতরে ওঠা-নামা করতে পারে। সমস্ত কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে কলকাতায় ফিরে এলেন ডক্টর কয়াল আজ। ফিরেই গিয়েছিলেন নেভাল ডকের ক্যাপটেন পেরেরার সঙ্গে আরও কিছু ব্যবস্থা করতে। ট্রামে ফিরছিলেন, হঠাৎ লোডশেডিং, তারপর বৃষ্টি হয়ে ট্রাম অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ডক্টর কয়াল ফ্রগ-শিপের ব্লু প্রিণ্ট বার করে মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন, আর লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিচ্ছিলেন। রঞ্জন আর হারু ঠিক সেই সময় পেছনের একটা ট্রাম থেকে নেমে ট্রামগুলোর ধার দিয়ে হেঁটে এগিয়ে আসছিল। ডক্টর কয়ালকে হঠাৎ জানালার ধারে বসে থাকতে দেখে ওরা তাড়াতাড়ি ট্রামটায় উঠে পড়ল।—মামা আপনি! আমরা তো আপনার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। ডক্টর কয়াল মুখ তুললেন।—যাক, এসে পড়েছ তোমরা—এত দেরি হল? চল হেঁটেই যাওয়া যাক্। জ্যাম কখন ছাড়বে ঠিক নেই।

ট্রাম থেকে নেমে ওরা হাঁটতে লাগল। ডক্টর কয়াল বললেন, এই জ্যামের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই ফ্রগশিপ আবিষ্কার করেছি। কোন নামকরা লোক বা নেতা এলে রাস্তার ট্রাফিক ঘুরিয়ে অযথা জ্যাম সৃষ্টি আর করতে হবে না। লোকে টেরও পাবে না, নেতাটি কখন কোথা দিয়ে চলে গেলেন। তাছাড়া দিনকাল খারাপ, নেতাদের সাধারণ মানুষের চোখের আড়াল দিয়েই যাওয়া আসা করা ভাল। রাস্তা দিয়ে খোলা গাড়িতে নেতা গেলে প্রচণ্ড সিকিউরিটি ফোর্স, পুলিশ, হোমগার্ড, স্থান বিশেষে মিলিটারি, আধা মিলিটারি মোতায়েন করতে হয়—খরচ বাড়ে, ফ্রগশিপ-এ এসব কিছুই করতে হবে না। ধর, নেতা দমদমে এলেন, ওখান থেকে এই যানে বসে ধপ করে এসে পড়লেন ময়দানে ফোর্টউইলিয়ামের কাছে। ঝামেলা মিটে গেল।

হারু বলল, হেলিকপ্টারেও তো এই একই কাজ হতে পারে।—না

হতে পারে না? ডক্টর কয়াল বললেন, হেলিকপ্টারে যাওয়া ফ্রগশিপ-এর মত সব দিক দিয়ে নিরাপদ নয়। ঝড়ের পূর্বাভাস থাকলে হেলিকপ্টার যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়। হেলিপ্যাড তৈরি করার ব্যাপার আছে। স্থানটাকে সুরক্ষিত করতে হয়—এ খরচ আমাদের গরীব দেশের পক্ষে বহন করা যুক্তিসংগত নয়। ফ্রগশিপে খরচ একবার, প্রাথমিক খরচ, তারপর নামমাত্র খরচ। ইমারজেন্সি বা জরুরী ব্যাপারে তো এর কোনও জুড়ি মেলা ভার। স্থল ও জল এই উভয়ক্ষেত্রে কম ব্যয়ে দ্রুত পরিবহণের ক্ষেত্রে নিকট ভবিষ্যতে এই যানটি হয়ে উঠবে অদ্বিতীয় ও অপরিহার্য। তাই এটার নাম দিয়েছি ফ্রগশিপ বা দাদুরীযান। ফ্রগশিপ নামটা বিদেশীদের বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করেছি। ধর, কোন বিদেশী মহাপুরুষ টাকা ধার দিতে কলকাতায় এলেন। সরাসরি তাকে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে দাদুরীযানে করে নিউটনের আপেলের মত রাজভবনের বাগানে ফেলা হল। কলকাতার অনেক কিছু দৃষ্টির আড়াল করে দেওয়া গেল। এটা তো হেলিকপ্টার করতে পারত না। এই দিক থেকেও দাদুরীযান যথেষ্ট সহায়ক হবে। ডক্টর কয়াল বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পকেট থেকে একটা টর্চ বার করে দরজার ভিউহোলে ফেলতেই দরজা আপনা থেকে খুলে গেল।

রঞ্জন বলল, দাদুরীযানটা আমাদের আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবেন মামা?

ওরা ডক্টর কয়ালের গবেষণাগারে এসে ঢুকল।

হারু বলল, জয়েন্ট এনট্রান্সের জন্য ব্যস্ত ছিলাম, তাই মাঝে আমরা আসতে পারি নি।

ডক্টর কয়াল বললেন, বড় কঠিন কাজ হারু। সময় বড় কম, তাই চিন্তা। তোমাদের মত অভিযানপ্রেমী ছেলেই আজ দরকার।

গবেষণাগারের কোণের দিকে একটা পর্দা সরিয়ে ডক্টর কয়াল প্রশ্ন করলেন এটা চিনতে পারছ? একটা ক্যাপসুলের মত।

রঞ্জন বলল, এটাই বুঝি দাদুরীযান?

—হ্যাঁ, ক্যাপসুলের আকৃতি। এর পেটের দিকটার ব্যাস উনষাট সেন্টিমিটার। দুপাশে কমে গেছে। এটার দৈর্ঘ্য দুই মিটার। ডক্টর কয়াল ক্যাপসুলটার গায়ে একটা বড়ির মত বোতাম টিপতেই সামনে একটা দেড়মিটারের মত দরজার সৃষ্টি হয়।—যাত্রীরা এই দরজা দিয়েই

ভেতরে প্রবেশ করবে। না, শ্বাস নিতে কোন কষ্ট হবে না। পানীয়র ব্যবস্থা করা আছে—আলোর সূচক দিয়ে নির্দেশ করা আছে,—ভেতরে ঢুকে দেখতে পার। বেশীক্ষণ তো ভেতরে থাকতে হবে না, তাই আর কিছু ব্যবস্থা করা হয় নি।

ডক্টর কয়াল যে সিলিণ্ডারটা জাহাজে বসিয়েছেন সেটার নকশা রঞ্জন আর হারুকে দেখালেন। দেয়ালে দশগুণ বড় করে নকশাটা দেখান হয়েছে। নকশাটা বিভিন্ন সেকশনে করা হয়েছে। এই যে স্প্রিংটা সিলিণ্ডারের নিচে কি ভাবে সেট করা হয়েছে দেখ—পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই হাইস্পিড ষ্টিলের স্প্রিং খুব কস্টলি। তবে এ ধরনের ষ্টিল এদেশেই এখন উৎপাদিত হচ্ছে। সুতরাং আমদানির ঝামেলা নেই। ক্যাপ খুলে যাত্রী প্রবেশ করবার পর ক্যাপসুলটা তুলে সিলিণ্ডারে প্রবেশ করিয়ে স্প্রিং-এর উপর বসিয়ে চাপ দিয়ে নিচে ঠেলে দিতে হয়। ঠেলে দিলেই লিভার-ক্লাচ ধরে নেবে। লিভার রিলিজ করলেই ক্যাপসুল বেরিয়ে যাবে এবং প্রজেক্টাইল হয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পড়বে বা নামানো হবে। পরে ব্যবস্থাটা সম্পুর্ণ স্বয়ংক্রিয় করা যাবে।

হারু বলল—এত সহজ !

ডক্টর কয়াল বললেন—জানবার পরই সব সহজ হ'য়ে দাঁড়ায় !

রঞ্জন বলল—আচ্ছা মামা, স্প্রিং ক্যাপসুলে যে ধাক্কার সৃষ্টি করবে সেটা কি যাত্রী সহ্য করতে পারবে ?

—রাইট ! একটা ভাল প্রশ্ন করেছ। ডক্টর কয়াল তাকালেন। যাত্রীর যাতে না লাগে তার ব্যবস্থা করতে হবে চূড়ান্ত ভাবে। সেটার কাজ এখনও কিছু বাকি। ওই নকশাটা দেখ। ডবলওয়াল-ব্লাডার, রবারের তৈরি একটা বালিশের খোলের মত। খোলের ভেতরে যাত্রী থাকবে। যাত্রীকে বেষ্টন করে থাকবে দুই দেয়ালের মাঝখানে একটা তরল পদার্থ, শক অ্যাব্‌সর্‌বার। কতকটা ওভারিতে শিশু যে ভাবে তরলের মধ্যে থাকে। যাত্রী কিছু টের পাবে না। ক্যাপসুলের ভেতর দেওয়াল এবং খোলের বাইরের দেওয়ালের মাঝখানে উচ্চ চাপের বায়ু থাকবে—ড্যাম্‌পিং ভাল হবে।

—নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে না ?

—না কিছু কষ্ট হবে না। ক্যাপসুল শূন্যপথে থাকবে আর কতক্ষণ। প্রয়োজনে অক্সিজেনের ব্যবস্থা রয়েছে কয়েক ঘণ্টার। চব্বিশ ঘণ্টা নরমাল

প্রেসারে এবং টেম্পারেচারের কোন ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে নিরাপদে থাকতে পারা যাবে। আমার দাদুরীযানের প্রথম যাত্রীকে তোমাদের দেখিয়ে দিই এস, একটা বাঁদর। গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের বারান্দায় ছোট্ট খাটে শোয়া একটা বাঁদরকে দেখালেন। পায়ার সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা ছিল বাঁদরটা। তড়াং করে উঠে দাঁড়িয়ে জোড় হাত দেখিয়ে ডান হাতটা রঞ্জনের দিকে বাড়িয়ে দিল। ডক্টর কয়াল বললেন, করমর্দন করার জন্যে হাত বাড়াল। নেতারা উড়োজাহাজ থেকে নেমে অভ্যর্থনার জন্যে অপেক্ষারত বিশেষ ব্যক্তিদের যে ভাবে করে, ও তাই করল। শিখিয়েছি। বাঁদরটা বিশেষ ভাবে ট্রেণ্ড। হারু বলল—আপনার পাতাল পথে যে বেড়াল পিজি চালিয়ে গিয়েছিল সেও ভীষণ ট্রেণ্ড ছিল মামা।—ক্যাপটেন কেষ্ট, ওর নাম ছিল। অসাধারাণ দক্ষতা অর্জন করেছিল কেষ্ট।

ডক্টর কয়াল তারপর বুঝিয়ে বললেন—ব্লাডারের খোল সম্পূর্ণ শক্ প্রতিরোধ করতে পারবে তবু আমি প্রথমে ক্যাপসুলটাকে জলে পরীক্ষা করতেই চাই।—রেজাল্টটা কি হয় দেখি।

রঞ্জন জানতে চাইল—যানটা নেমে আসবার ব্যাপারে—।

ডক্টর কয়াল খুশি হয়ে বললেন—জাস্ট্ দি কোয়েস্চন্। ক্যাপসুলের পেছনে অ্যালুউমিনিয়াম-এর ছোট্ট একটা প্যারাসুট থাকবে যেটা মাটি থেকে পঁচিশ মিটার ওপরে নিজের থেকেই খুলে যাবে এবং ক্যাপসুলটা ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে নেমে পড়বে। বায়ুর চাপের তারতম্য ঘটলে প্যারাসুট নিজেই খুলে যায়। এটা পঁচিশ মিটার উচ্চতায় এলে বায়ুর চাপের সামান্য তফাতে রিলে সিস্টেমে খুলে যায়। অবশ্য ড্যাম্পিং চূড়ান্ত হলে প্যারাসুট ব্যবহার করা হবে না। নদীতে যে পরীক্ষাটা করব তাতে প্যারাসুট লাগাব না, ওতে পড়তে সময় বেশি লাগবে। জলে পড়তে ট্রাবলটা অবশ্য কম। স্বয়ংক্রিয় না করে আপাতত রকেটের মত যানটিকে ছুড়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।—ও. কে. হলধর এবার তুমি শুয়ে রেস্ট নাও। হলধর বাঁদরটার নাম। —হ্যাঁ। তোমাদের বাড়িতে জানিয়েছ আমার সঙ্গে পরীক্ষামূলক অভিযানে বাইরে যাবার কথা ?

—হ্যাঁ, অনুমতি নিয়েছি। হারু উত্তর দিল। ওকে অবশ্য বাধা দেবার কেউ নেই। আচ্ছা মামা প্রথম দাদুরীযানের মানুষ যাত্রী হিসেবেই আমাদের সুযোগ দিন না ? বাঁদর—মানে হলধর যদি অক্ষত থাকে তাহলে আমি আর রঞ্জন চেষ্টা করে দেখি।

—উত্তম প্রস্তাব। কথাটা আমি ভেবে দেখব। অবশ্য বিপদের কোন ভয় নেই এই বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু অ্যাকসিডেন্টের কথা কিছুই বলা যায় না। তবে আমি কাগজপত্র ঠিক করেই রেখেছি। তোমাদের আর অভিভাবকদের সইসাবুদ করিয়ে নিতে হবে। আবেগ ভরা গলায় হারু বলল—বিজ্ঞানের স্বার্থে, মানুষের অগ্রগতির জন্যে প্রাণ যদি যায় তা আমরা সার্থক মনে করব। ডক্টর কয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। —সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে সকাল সাতটায় আমরা জিনিস পত্তর নিয়ে রওনা হচ্ছি তোমরা রেডি হয়ে এস। আট তারিখে দাদুরীযান উঠছে মনে রেখ। রঞ্জন উৎসাহ দেখাল বটে, কিন্তু সে অভিযানের কথা বাড়িতে তেমন খোলসা করে বলেনি।

আট তারিখ খুব ভোরে রঞ্জন, হারু এবং ডক্টর কয়াল একটা জেলে ডিঙিতে করে জাহাজে গিয়ে উঠল। ডক্টর কয়াল জাহাজের খোলে নেমে গিয়ে সিলিণ্ডারটা পরীক্ষা করে দেখলেন। দূরবীণ দিয়ে আকাশের চারিদিক ভাল করে দেখে নিলেন। আধ মাইলের মত ব্যাস সৃষ্টি করে চক্রাকারে যে জেলে ডিঙিগুলো অপেক্ষা করছিল ডক্টর কয়াল তাদের আর একটু এগিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। সেকস্‌টান্‌ট্ দিয়ে একটি লোক মাপ জোক পরীক্ষা করছিল, সে জাহাজটিকে আরও দক্ষিণ দিকে জলের গভীরে যাবার নির্দেশ দিল। একসময় যখন ডক্টর কয়াল আদেশ দিলেন —পজিশন, তখন জাহাজটা আবার থেমে গেল। লোকটা হাত তুলে বলল, রাইট পজিশন। ডক্টর কয়ালের সঙ্গে একটু এগিয়ে যেতে সাময়িক তৈরি একটা ঘরে প্রবেশ করল হারু আর রঞ্জন। কালকে ক্যাপসুলের মডেল দেখেছে, তাই ঘরে ঢুকতেই ওরা একসঙ্গে বলে উঠল—এই তো ক্যাপসুল!

ডক্টর কয়াল কিছু বললেন না, ক্যাপসুলটার কি সব পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর পাশের একটা কাঠের বাক্সর দিকে তাকিয়ে বললেন— খোল। খোল বলে নিজেই বোতাম টিপে ক্যাপসুলের দরজা খুলে দিলেন। ওদিকে একজন কাঠের বাক্সর ডালা খুলতেই তড়াক করে হলধর বেরিয়ে এসে ক্যাপসুলে ঢুকে গেল। ডঃ কয়াল ঘড়ি দেখে বললেন—লোড।

একটা ট্রলিতে করে ঠেলে ঠেলে ক্যাপসুলটাকে সিলিণ্ডারের কাছে আনা হল। ক্রেন দিয়ে ক্যাপসুলটাকে তোলবার আগে ডক্টর কয়াল প্রেসার' গেজে চাপ দেখে নিয়ে গা-তালায় চাবি ঘুরিয়ে ক্যাপসুলের দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। ক্রেনে ক্যাপসুলটাকে সিলিণ্ডারের মুখে

তুলে ছেড়ে দিতেই সেটা সর সর করে ভেতরে চলে গিয়ে স্প্রিং-এর ওপর বসল। একটা আলো জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ডক্টর কয়াল বললেন, প্রেস—

সারসের গলার মত হাইড্রোলিক প্রেসের পিস্টন সিলিণ্ডারে নেমে গেল। সিলিণ্ডারের গায়ে ঘড়ির কাঁটা দেখে ডক্টর কয়াল ক্যাপস্থলটা স্প্রিং-এর উপর ঠিক বসেছে কিনা দেখে নিজের স্থানে সরে গেলেন।

ডক্টর কয়াল তারপর বললেন, বুঝলে, স্প্রিং রিলিজ করলেই ক্যাপস্থলটা প্রজেক্টাইল হয়ে আকাশে উঠে যাবে এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পড়বে। এখানে কোথায় পড়বে সেটা নির্ধারণ করা হয় ছটো কণ্ট্রোল দিয়ে, একটা স্প্রিং-এর ওপর চাপ কমিয়ে বা বাড়িয়ে, দ্বিতীয় হচ্ছে সিলিণ্ডারের কোণ কমিয়ে বা বাড়িয়ে। এবার ক্যাপস্থলটা রিলিজ করব প্রজেক্টাইলের কোণ, মানে সিলিণ্ডারটাকে ৪৫° ডিগ্রি কোণে সেট করে।—রেডি। ডক্টর কয়াল বাইনোকুলার চোখে তুলে চারি দিকে তাকিয়ে নিলেন। সবাইকে বসে পড়তে সংকেত করলেন। একটা মোটর লঞ্চকে পিছিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। রিলিজ—ক্লাচে পা রাখলেন ডক্টর কয়াল। চোখ থেকে বাইনোকুলার নামিয়ে শক্ত করে একটা রড্ ধরে জোরে পা দিয়ে চেপে দিলেন ক্লাচটা। ভীষণ বেগে ক্যাপস্থলটা সিলিণ্ডারের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল। পাটাতনের ওপরটা প্রচণ্ড বেগে ছলে উঠল। সেকস্‌টান্‌ট্‌টা হাত থেকে পড়ে গেল। ওদিকে হলধরের কাঠের বাক্সটা হয়ত উল্টে গেল, তার শব্দ হল জোর। হারু বাম্প করে একজনের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। ডক্টর কয়ালের কোন দিকে খেয়াল নেই। তিনি উড়ন্ত ক্যাপস্থলটা বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখছেন। সকলে সাময়িক ধাক্কা সামলে ক্যাপস্থলটার দিকে তাকিয়ে দেখল। অনেক উঁচুতে উঠে গেল ক্যাপস্থলটা। তারপর পড়তে আরম্ভ করল। মাইকে শোনা গেল। লঞ্চের সারেঙকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পড়ন্ত ক্যাপস্থলটার পথ অনুসরণ করে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে যেন তুলে নিয়ে আসে। জেলে-বোটগুলো যে স্থানে ক্যাপস্থলটা পড়ে ডুবে গেল ঠিক সেই স্থানটা ঘিরে ফেলল এবং ক্যাপস্থলটা উঠতেই তুলে নিল। জাহাজে ক্যাপস্থলটা তুলে আনতে সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল হলধরের হাল জানবার জন্য।—বেঁচে আছে অতবড় ধাক্কা খেয়ে?

ডক্টর কয়াল বললেন, রঞ্জন তুমি ডালাটা খোল।

রঞ্জন ইতস্তত করে ক্যাপস্থলের বোতাম টিপল। দরজা খুলতেই

হলধর জোড়া হাত করে নেমে এসে ডান হাত বাড়িয়ে দিল। ডক্টর কয়ালের মুখ চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হল। তিনি হলধরকে আদর করলেন। একজন ফিজিশিয়ান উপস্থিত ছিলেন, ওর প্রেসার, হার্টবিট্ সব পরীক্ষা করলেন। সব ঠিক আছে। ডক্টর কয়াল সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন। হারু, তোমার অনুমতি পত্র রেডি আছে। সব ঠিক আছে, কিন্তু রঞ্জন ওর অভিভাবকের সই করতে দেরী করেছে, তাই এবার তুমিই রেডি হও। এ যাত্রা রঞ্জনকে আর কাজে লাগাতে পারছি না। কিন্তু মামা আমি তো সই করে দিয়েছি। আপনি এবার মানুষ তুলবেন না বলেছিলেন, তাই আমি আর জোর করিনি, আমি লিখে দিতে প্রস্তুত যে আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নন। আমাকে একটা—। রঞ্জনকে আশ্বস্ত করে ডক্টর কয়াল বললেন—ঠিক আছে, এটাই তো শেষ নয়। হারু রেডি হও, আজকেই একটা এসপার ওসপার করে দেখছি। হারু প্রস্তুত। রঞ্জনকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

—এবার আমরা চা খেয়ে নিই। ডক্টর কয়াল বললেন।

চা খাবার পর ডক্টর কয়াল বললেন, হারু রেডি? ডাক্তারবাবু—ওর ওয়েট, প্রেসার-ট্রেসার সব চেক করে রেকর্ড করে রাখুন।

* * * হারু অক্ষত দেহে ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে হাসিমুখে এসে দাঁড়াল। রঞ্জন ছুটে গিয়ে হারুকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যেন ও হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে এইমাত্র খুঁজে পেয়েছ।

ডক্টর কয়াল হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন—দাহুরীযানের প্রথম মানুষ যাত্রী হারুণ অল্ রসিদ। আমার কাজ এক বছর তুমি এগিয়ে দিলে।—চল সব।—লাঞ্চ ব্রেক। খেয়ে নেওয়া যাক্।

লাঞ্চ খেতে খেতে ডক্টর কয়াল বললেন, আর একজনকে দাহুরীযানে তুলতে পারলে আমি নির্ভয়ে এটাকে প্রকাশ করতে পারি পরবর্তী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।—তাক লাগিয়ে দিতে পারি পশ্চিমী দেশগুলোকে।

হঠাৎ রঞ্জন আবেগপূর্ণ গলায় বলে উঠল, মামা আমায় তুলুন। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন! হারু আর আমি একসঙ্গে থাকি। আলাদা করে দেবেন না।

—তোমার অভিভাবকদের অনুমতি না পেলে বা কাগজপত্র ঠিকঠাক না করে—।

—ক্যাপস্থলে ওঠা নাগর দোলায় চড়ার মত দেখছি—মা ওরা যদি জানতেন নিশ্চয় অনুমতি দিতেন। ওরা মানা তো করেন নি। বলেছেন, যদি ভাল বোঝ যা হয় করবে। মামাবাবু যখন রয়েছেন।

লাঞ্চের পর ডক্টর কয়াল বললেন, আণ্ডারটেকিং দাও তা'হলে। মামার উপরে রিস্ক ছেড়ে দিলেই তো হয় না। ডাক্তার বাবুকে দিয়ে চেক আপ করিয়ে নাও। রেডি হও। আকাশে মেঘ দেখছি। একটা রিস্ক নিয়েই ফেলি দেশের স্বার্থে। পৃথিবীর কোথায় কে কি করে ফেলে ঠিক কি!

ডক্টর কয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। রঞ্জন ক্যাপস্থলে ঢুকে গেল। আলো জ্বলে উঠল। হাওয়াটা ধীরে ধীরে জোর হচ্ছে। ডক্টর কয়াল বললেন, ফ্লাইট বন্ধ করে দেব নাকি! ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে!

একজন বলল, ক্যাপস্থলকে এ ঝড় কি কাবু করতে পারবে! ডক্টর কয়াল বললেন, সাংঘাতিক ঝড় জাহাজকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তা এটা তো অল্প ওজনের দাহুরীযান!

—তাড়াতাড়ি প্রেস করুন, ক্যাপস্থলটাকে এক্ষুনি সুট করতে হবে। ঝড় যদি আসে তার আগে কাজ সেরে ফেলি। ডক্টর কয়ালের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। পাটা ক্লাচ বটমের ওপর রাখা রয়েছে। মেঘটা যেন আরও এগিয়ে আসছে। পিস্টনটা ক্যাপস্থলকে চেপে দিয়ে বেরিয়ে এল। ডক্টর কয়াল বললেন মিজাইলের কোণ ৫০° ডিগ্রি করে দাও। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা দমকা হাওয়ায় জাহাজটাকে যেন দুলে উঠল। ক্যাপ-স্থল ছিটকে বেরিয়ে যাবার আওয়াজে হাওয়ার ধমক ঠিক কানে বাজল না। একটা ড্রাম গড়িয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপস্থল ছোটার প্রতিক্রিয়ায় আর হাওয়ার ঝাপটায় টাল সামলাতে না পেরে ডক্টর কয়াল পড়ে গেলেন। ক্যাপস্থল কালো মেঘের পাশ কেটে কোন দিকে কোথায় গিয়ে পড়ল বুঝতে পারা গেল না। ডক্টর কয়াল চিৎকার করে উঠলেন, আমার বাইনোকুলারটা তুলে দাও। একটা জলস্তম্ভ দৃষ্টি গোচরে এল, যেখানটায় ক্যাপস্থলটা পড়েছে মনে হল। স্থানটা নৌকোগুলো সঙ্গে সঙ্গেই ঘিরে ধরল, মোটর লঞ্চটা ছুটে গেল। পাঁচ মিনিট হয়ে গেল তবু ক্যাপস্থল ভেসে উঠল না। দমকা হাওয়ায় ব্যস্ত করে তুলছে জেলে নৌকোগুলোকে। পর পর ডুবুরীরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নেভাল ডকের এক অফিসার মাইক্রোফোনে হুকুম দিলেন আধ মাইল টাক জায়গা চক্রাকারে ঘিরে চারপাশে জাল নামিয়ে দিতে।

জোর হাওয়ায় নদীর জল ফুলছে দুলছে। ডক্টর কয়াল দূরবীন লাগিয়ে চারিদিকে পাতি পাতি করে দেখে যাচ্ছেন।

—কি হল? একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল ওঁর মুখ দিয়ে। হারুর বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। কিছু বুঝতে পারছে না। ফ্যাল ফ্যাল করে ডক্টর কয়ালের দিকে এক একবার তাকিয়ে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করছে। এক সময় শুনল কলকাতায় জরুরী বার্তা পাঠানো হচ্ছে, ক্যালকাটা পোর্টের রেস্‌কিউ ডিভিশন যাতে এসে যায়। ডুবুরীদের ওঠা নামার শব্দ হচ্ছে। হারুর কানের কাছে রঞ্জনের মার কথা কে যেন বলে উঠল—কোন ভয় নেই তো হারু, তোমরা যে যাচ্ছ! এক সঙ্গে ফিরো। এক সঙ্গে!

চারদিকে সার্চ লাইট ফেলে অনুসন্ধানের কাজ চলছে। নদী এখন শান্ত, যেন কিছুই জানে না। মেঘ কেটে গেছে। হাওয়ার দাপট অনেক কম। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—অন্ধকার দূরে সরে সরে আবার এগিয়ে আসছে। রাত বারটা! আর সামান্য কয়েক ঘণ্টা অক্সিজেন থাকবে ক্যাপসুলে, তারপর দম বন্ধ হয়ে সব শেষ হয়ে যাবে। একটা কাঠের বাক্‌সে এসে বসে পড়ল হারু। ডক্টর কয়াল মোটর বোটে উঠে দূরে চলে গেছেন। একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে ওরা তল্লাসি চালিয়ে এগিয়ে আসছে। বহু লোকের ওঠা নামার শব্দ হচ্ছে। জলের তলায় ধ্বনি পাঠিয়ে তার তফাৎ অনুধাবন করে ডুবুরীরা ডুব দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল হারু, হঠাৎ কাছাকাছি জুতোর শব্দ এবং কথা কানে যেতে তাকিয়ে দেখল মোটর বোটে ডক্টর কয়াল দাঁড়িয়ে ডাক্তারকে কি বলছে।—পাওয়া গেছে!— —না।

ডাক্তারের কথা হারুর কানে এল।—এতক্ষণ বন্দী অবস্থায় থাকলে মেণ্টাল ব্যালান্স হারাতে পারে সেইটাই ভাবনা। নরম্যাল অবস্থায় থাকলে আরও কষ্টকর—অসহ্য হয়ে উঠবে। দেখা যাক—।

ডক্টর কয়াল ঘড়ি দেখলেন।—আর মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় আছে। তারপর সব অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে—। তাহলে—হারু চমকে উঠল। ডুবুরীরা খুঁজতে খুঁজতে বেড় ছোট করতে করতে এগিয়ে আসছে। ওরা যত এগোচ্ছে, তত আশা ক্ষীণ হয়ে আসছে। হারু কোন্ দিকে তাকিয়ে কি দেখছে বুঝতে পারছে না—মনে হচ্ছে জলের ওপর আলো নেচে নেচে ওকে ঠাট্টা করে ঘুরছে। কিসের শব্দ! ওরা নাকি ম্যাগনেটিক বল ফেলছে তার শব্দ। শব্দ-তরঙ্গ ধরছে। হারুর মনে হল রঞ্জন নেই।

যন্ত্রে আবদ্ধ রঞ্জন নদীর তলা দিয়ে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে কে জানে! না—রঞ্জনকে না নিয়ে ও বাড়ি ফিরতে পারবে না। অসম্ভব। ওর মাকে—।

একটা চিৎকার উঠল। শব্দ-তরঙ্গ ধরা পড়তে ডুবুরীরা ডুব দিয়েছিল। ওরা জানাচ্ছে, একটা মাছ ধরা ডুবো নৌকোর নিচে ক্যাপস্থলটা আটকে আছে। ডক্টর কয়াল চিৎকার করলেন, জলদি তোলো, আর কয়েক মিনিট মাত্র সময় আছে। জলদি—। চারিদিকে 'জলদি' শব্দটা যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

এক মিনিট·····তিরিশ সেকেণ্ড। ক্যাপস্থল ওপরে উঠতে সবাই উৎকণ্ঠায় এগিয়ে গেল। হারু অন্য দিকে মুখ করে দূরে সরে রইল কি জানি কি হয়!

দরজা খুলতেই দুজন লোক রঞ্জনকে ধরে বাইরে এনে শুইয়ে দিল। ডাক্তারবাবু নাড়ি দেখে মুখে একটু একটু করে একটা তরল পদার্থ ঢেলে দিতে থাকলেন। এক সময় হারু দুজনের মধ্যে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। রঞ্জন চোখ খুলেছে! রঞ্জন তাকিয়ে দেখছে! আনন্দে হারু কেঁদে ফেলল। ডক্টর কয়াল হারুর মাথায় হাত বুলিয়ে একটু হাসলেন।

তারপর গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। মৃদু স্বরে যেন আপনমনেই বিড় বিড় করতে করতে বললেন—তোমাদের মত ছেলেদের যখন পেয়েছি ভাবনা আমার কিছু নেই। স্থল আর জলে স্বয়ংক্রিয় উল্লম্ফন পদ্ধতিতে সহজ চলাচলের দিক থেকে আমার এই দাদুরীযান এখনও পরিণতি লাভ করে নি। গোলমাল একটা রয়ে গেছে কোথাও। তবে তা সামান্যই। বৈজ্ঞানিক অহঙ্কার আর আবিষ্কারের ফলাফল দ্রুত প্রদর্শনের মত্ততায় আমি খানিকটা অপরাধও করে ফেলেছিলাম। রঞ্জনের অভিভাবকদের অনুমোদন ঠিকঠাক না নিয়ে এভাবে আমার রিস্ক নেওয়া ঠিক হয়নি। যাক্—জয় হারু আর রঞ্জনের। অবশ্য হলধরেরও জয়ধ্বনি প্রাপ্য বটে! আমরা তাক লাগিয়ে দিচ্ছি কিছুদিনের মধ্যেই। পরবর্তী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আগেই আমি কাজ শেষ করে ফেলছি। স্বয়ংক্রিয় দাদুরীযানের প্রথম মানুষ-যাত্রী হিসেবে তোমাদের নাম দুটো রেকর্ড করা থাকবে নিশ্চিত। এবার ফেরা যাক্।

